অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

আলীবাবার গুহা





অনুবাদ

আলীবাবার গুহা

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত

'আলীবাবার গুহা'য় আপনাদেরকে স্বাগতম, পাঠক!
এ গুহা বিশ্বসাহিত্যের নামজাদা লেখকদের দুর্লভ রত্নরাজিসম সব লেখক দিয়ে সাজানো। জীবনধর্মী মর্মস্পর্শী নানান গল্পের পাশাপাশি রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা-অ্যাডভেঞ্চার ইত্যাদি কাহিনির কোনই কমতি নেই এখানে। এই মণি-মাণিক্যগুলো আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে গুহার গোলকধাঁধায় কখন হারিয়ে যাবেন টেরই পাবেন না। এবং একটা সময় উপলব্ধি করবেন *আলীবাবার গুহা* থেকে বেরুতেই মন চাইছে না!



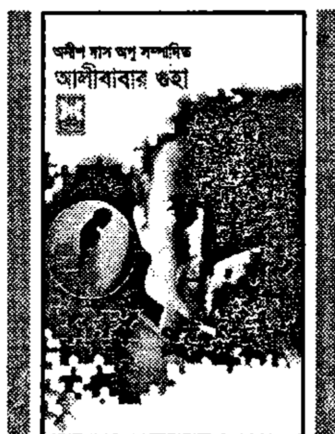
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনুবাদ

আলীবাবার গুহা

অনীশ দাস অপু সম্পাদিত





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-3251-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৪

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

ALIBABAR GUHA
A Collection of short stories
Edited by: Anish Das Apu



নব্বই টাকা

সূচী

ভূমিকা

গত বছরের ফেব্রুয়ারি বইমেলায় আমার সম্পাদিত তৃতীয় অনুবাদ সংকলন *অতল পৃথিবী* বেরুবার পরে নানান কারণে সকল প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের আরেকটি সংকলন সেবা প্রকাশনীতে জমা দিতে পারিনি। তারপর তো শুরু হয়ে গেল দেশজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, হানাহানি, অবরোধ, হরতাল। আর সবার মতই আমারও বেশ মন খারাপ করা কয়েকটা মাস কেটেছে। লেখালেখির প্রতি উৎসাহই হারিয়ে ফেলেছিলাম, সম্পাদিত গ্রন্থ করা দূরে থাক। তবে এ উৎসাহটি আমার মধ্যে নবরূপে জাগ্রত করলেন আমার সুবন্ধু কাজী শাহনূর হোসেন। তিনি জানতেন একটি অনুবাদ সংকলনের জন্য বেশ কিছু গল্প আমি রেডি করে রেখেছি, শুধু গ্রন্থনাটুকু বাকি। এবারের বইমেলার মাঝামাঝি সময় তিনি গ্রন্থিত পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কাছে জমা দিতে বললেন আমি তাঁর উৎসাহে নতুন করে কাজে নেমে পড়লাম। তারই ফলশ্রুতি *আলীবাবার গুহা*।

কাজী শাহনূর হোসেনকে বইয়ের নাম নির্বাচন করার জন্য মোট পাঁচটি গল্পের নাম দিয়েছিলাম। তিনি পছন্দ করলেন *আলীবাবার গুহা*। আরেকটি নামও তাঁর পছন্দ হয়েছে, তবে সেটি দিয়ে তিনি আরেকটি অনুবাদ সংকলন করতে বলেছেন। গল্পটির নাম *মৃতের হাসি*। এ নামে আরেকটি অনুবাদ গল্প সংকলন অচিরেই সেবা থেকে বেরুবে।

শুনেছি, আমার আগের তিনটি অনুবাদ সংকলন (*স্বর্ণকীট*, *হিচ-হাইকার* ও *অতল পৃথিবী*) নাকি পাঠক খুব পছন্দ করেছেন। তাঁদের পছন্দের দিকে খেয়াল রেখে এবারের বইটিতেও বিশ্বখ্যাত লেখকদের সেরা সব গল্প গ্রন্থিত করেছি আমি। বরাবরের মত হৃদয়ছোঁয়া গল্প তো আছেই, তবে এবারে রহস্য-গোয়েন্দা ও সায়েন্স ফিকশনের প্রতি আমার ঝোঁক একটু বেশিই ছিল। আমি নিশ্চিত, পাঠক রোল্ড ডাহ্ল-এর *বাজি*, পড়ে যেমন রোমাঞ্চিত হবেন, তেমনি গর্ডন আর. ডিকসন-এর *ছিনতাই*, লরেন্স এম. জেনিফার-এর *গুপ্তচর* কিংবা আর্থার সি. ক্লার্ক-এর *লাইকা* তাঁদেরকে শিহরিত করে তুলবে। সাইমন ব্রেট-এর *তোমার মা কেমন আছেন?* কিংবা আইজাক বাশেভিস সিঙ্গার-এর *বোকার স্বর্গ* পড়ে আমি যেমন মুগ্ধ হয়েছি, একই মুগ্ধতায় তাঁদেরকে ধরে রাখবে জেমস হোল্ডিং-এর রহস্য গল্প *ধরা!* জ্যাক লণ্ডন-এর দারুণ গল্প *কুষ্ঠরোগী কুলাউ* কিংবা যশপাল-এর আশ্চর্য জীবনধর্মী গল্প *সাদাত*। পাঠকের খুবই ভাল লাগবে টাইটেল গল্পটি, রস ম্যাকডোনাল্ড-এর *জিনির জন্যে* এবং গী দ্য মোপাঁসা-র *বিচ্ছেদ*। ও'হেনরী-র *এক হলদে কুকুরের কিছু স্মৃতি* পড়ে তাঁরা বেশ মজা পাবেন, চোখ অশ্রুসজল করে দেবে বলবন্ত গার্গি-র *দৌড়*, বেশ

চমকিত হবেন *সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ* পড়ে। এ ছাড়াও বাদবাকি সবগুলো গল্পই তাঁদের ভাল লাগবে, সম্পাদক হিসেবে এটুকু নিশ্চয়তা আমি দিতেই পারি।

আলীবাবার গুহা'তে সেবার পেশাদার লেখকদের পাশাপাশি কয়েকজন নবীন অনুবাদকের অনুবাদও আমি ছেপেছি। পেশাদাররা সবসময়ই ভাল লেখেন, কাজেই তাঁদের সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে নবীনরাও যে চমৎকার অনুবাদ করেন এর প্রমাণ আমি আমার সম্পাদিত আগের বইগুলোতেও পেয়েছি। রহস্যপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পরম শ্রদ্ধেয় কাজী আনোয়ার হোসেন-এর কাছে আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ তিনি অনেক প্রতিভাবান লেখক এবং অনুবাদক সৃষ্টি করেছেন তাঁর এই বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় পত্রিকাটির মাধ্যমে। আমি রহস্যপত্রিকায় লিখছি প্রায় দুই যুগ ধরে। লক্ষ করেছি, এ পত্রিকায় ছাপা হওয়া আনকোরা অনুবাদকদের অনুবাদের মান বাংলাবাজারের তথাকথিত কিছু অনুবাদকের চেয়ে অনেক ভাল। অনুবাদের চৌকশ মানটি রহস্যপত্রিকায় ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র এর সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদকদের দুর্দান্ত সম্পাদনার কারণে। পাঠক মনে করবেন না যেন আমি ধান ভানতে শিবের গীত গাইতে বসেছি। ভবিষ্যতে সেবা থেকে আমি আরও বেশ কিছু অনুবাদ সংকলন বের করার ইচ্ছা রাখি। আর সেসব গল্পের বেশির ভাগই বাছাই করা হবে রহস্যপত্রিকায় ছাপা হওয়া গল্প থেকে। কাজেই আপনাদের মধ্যে যাঁরা ভাল অনুবাদ করতে পারেন বলে আত্মবিশ্বাসী তাঁরা বিশ্বখ্যাত লেখকদের সেরা গল্পগুলোর প্রাঞ্জল অনুবাদ করে রহস্যপত্রিকায় পাঠিয়ে দিন। কে জানে, হয়তো আপনিই একদিন হয়ে উঠবেন খ্যাতনামা একজন অনুবাদক বা লেখক!

আমি আমার আগের সম্পাদিত অনুবাদ সংকলনগুলোতে বলেছিলাম ডেনিস হুইটলি-র বই অনুবাদের কাজ শুরু করে দিয়েছি। বিশ্বখ্যাত অ্যাডভেঞ্চার ও হরর এ-লেখকের বেস্ট সেলার উপন্যাস *দ্য ফেবুলাস ভ্যালি*'র কাজ প্রায় শেষের দিকে। এরপরে অনুবাদ করব হুইটলির সবচেয়ে সাড়া জাগানো হরর উপন্যাস *দ্য ডেভিলস রাইড আউট*। আমি নিশ্চিত, এই বই দুটি পড়ার পরে পাঠক ডেনিস হুইটলির দারুণ ভক্ত হয়ে যাবেন! কথা দিচ্ছি, এবারে আর বেশিদিন আপনাদেরকে অপেক্ষায় রাখব না! আর হ্যাঁ, আপনাদের বহুল প্রতীক্ষিত '*ভ্যাম্পায়ার স্টোরিজ*' আগামী বইমেলাতেই আসছে। দুটি দুর্দান্ত ভ্যাম্পায়ার উপন্যাস নিয়ে রচিত এ বই আপনাদেরকে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখাবে তাতে আমি নিশ্চিত। কাজেই বইটি যারা পড়বেন নিজের দায়িত্বে দয়া করে পড়বেন। ভয় পেলে পরে আমাকে দুষতে পারবেন না!

অনীশ দাস অপু

কুষ্ঠরোগী কুলাউ

'যেহেতু আমরা অসুস্থ তারা কেড়ে নিয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। আমরা আইন মেনেছি। আমরা কোনও অন্যায় করিনি। তবু তারা আমাদের বন্দি করে রেখেছে। মোলোকাই আসলে একটা কারাগার। তোমাদের সেটা ভাল করেই জানা আছে। তার বোন, নিউলিকে মোলোকাই পাঠানো হয়েছে সাত বছর আগে। তারপর থেকে বোনের সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি। দেখা এ-জীবনে আর হবেও না। মৃত্যু এসে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত মেয়েটি সেখানেই বন্দি থেকে যাবে। এটা তার ইচ্ছেয় ঘটেনি। এরকম কোনও ইচ্ছে নিউলির ছিল না। এই ইচ্ছে সাদা চামড়ার মানুষের যারা শাসন করেছে এই দেশ। আর, কারা এই সাদা চামড়ার মানুষ?

'আমরা জানি। জেনেছি আমাদের বাপদাদার কাছ থেকে। এসেছে তারা ভেড়ার মত, কথা বলেছে নরম সুরে। তখন নরম সুরেই কথা বলতে হয়েছে তাদের, কারণ, আমরা যেমন ছিলাম শক্তিশালী তেমনই সংখ্যায়ও তাদের চেয়ে অনেক বেশি, আর সবগুলো দ্বীপই ছিল আমাদের। আগেই বলেছি, কথা বলত তারা নরম সুরে। তারা ছিল দুই জাতের। একটা আমাদের অনুমতি প্রার্থনা করত, সদয় অনুমতি, যেন আমাদের মাঝে তারা প্রচার করতে পারে ঈশ্বরের বাণী। আরেকটা প্রার্থনা করেছে আমাদের অনুমতি, সদয় অনুমতি, যেন ব্যবসা করতে পারে আমাদের সঙ্গে। সে-ই ছিল শুরু। আজ সবগুলো দ্বীপ তাদের, পুরো দেশ, সমস্ত গবাদিপশু–যাবতীয় কিছু তাদের দখলে। যে-দল প্রচার

করত ঈশ্বরের বাণী আর যে-দল করত ব্যবসা, কীভাবে হঠাৎ করে যেন মিলিত হলো তারা আর তারপর হলো বড় বড় সব দলপতি। অনেক কক্ষবিশিষ্ট বাড়িতে বাস করতে লাগল তারা রাজার মত, তাদের সেবা-যত্নে নিয়োজিত হলো অসংখ্য ভৃত্য। একদিন যাদের কিছুই ছিল না, আজ তারাই পেয়ে গেছে সব, আর যদি তুমি, বা আমি, কিংবা আমাদের যে-কেউ অনাহারে থাকে, তারা দাঁত খিঁচিয়ে বলে, 'তোমরা কোনও কাজ করো না কেন? ওই তো রয়েছে কত আবাদী জমি।'

কুলাউ একটু থামল। একটা হাত তুলল সে, তারপর গাঁটঅলা কুঁকড়ে যাওয়া আঙুলে ওপরে তুলে ধরল তার মাথার কালো চুলে প্যাঁচানো হিবিসকাসের ঝলমলে মালা। চারপাশ ভেসে যাচ্ছে জোছনার রূপালি বন্যায়। এই রাত এক শান্তির রাত, যদিও তাকে ঘিরে যারা কথা শুনছিল তাদের সবাই যেন যুদ্ধবিধ্বস্ত। মুখ তাদের সিংহের মত। কারও মুখে বিরাট এক গর্ত যেখানে নাক ছিল একদা, আবার কারও কেবল বাহুটাই আছে, পচে খসে পড়েছে হাত। বসে আছে জনা তিরিশেক পুরুষ আর মহিলা, ফ্যাকাসের চেয়েও অনেক বেশি ফ্যাকাসে, তাদের মানুষসুলভ চেহারায় এখন ফুটে উঠেছে জান্তব ছাপ।

বসে রইল তারা ফুলের মালা পরে, উজ্জ্বল, সুগন্ধীভরা রাতে, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল তাদের অদ্ভুত সব শব্দ, কুলাউ-এর বক্তব্যে সমর্থন জোগাল খসখসে গলা। একদা তারা ছিল নারী আর পুরুষ। কিন্তু এখন তারা আর নারীও নয় পুরুষও নয়। এখন তারা দানব–চেহারা আর আকার মিলিয়ে মানুষের এক ভয়াবহ রসিকতা। বীভৎস ধরনের অঙ্গহানি তাদের চেহারায় এনে দিয়েছে এমন বিকৃতি যেন তারা নরকভোগ করেছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। তাদের হাতগুলো হয়েছে এখন নখরের মত। মুখের দিকে তাকালে মনে হবে, জীবন যেন তাদের নিয়ে খেলেছে ভয়াবহ এক খেলা। এক মহিলার তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে

আতঙ্ক-জাগানো দুই গর্ত দিয়ে, যেখানে একদা ছিল তার সুন্দর একজোড়া চোখ। কেউ কেউ ভোগ করছে ব্যথা, গোঙানি বেরিয়ে আসছে তাদের বুকের গভীর থেকে। কেউ কেউ কাশছে, মাংসপেশির কোষ ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ তুলে। দু'জন আবার এমন হয়ে গেছে যেন মানুষ নয় তারা, বিশালাকৃতির দুই বানর, সোনালি ফুলের মালা মাথায় জড়িয়ে তারা দুর্বোধ্য সব শব্দ করছে। একজনের কানের লতি কাঁধের ওপর ঝুঁলে পড়ে পাখার মত দুলছে একপাশ থেকে আরেক পাশে।

আর এখানে কুলাউ হলো রাজা। এটাই তার রাজ্য—ফুলে-ঠাসা এক গিরিসঙ্কট, যেটাকে ঘিরে উঠে গেছে আরোহণের প্রায় অসাধ্য সটান খাড়া পাথুরে ঢাল যার আনাচ-কানাচ থেকে মাঝেসাঝেই ভেসে আসে বুনো ছাগলের ডাক। তিন পাশ ঘেরা এই পাথুরে ঢালের ফাঁকেফোকরে রয়েছে গুহা যার ভেতরে বাস করে কুলাউ-এর প্রজারা। চতুর্থ পাশটা যেন নেমে গেছে অতল এক গর্তে যেখানে দেখা যায় অপেক্ষাকৃত নিচু সব পাহাড়ের চূড়া আর ঢাল, যার পাদদেশে গুমগুম শব্দে আছড়ে পড়ে ফেনা সৃষ্টি করছে প্রশান্ত মহাসাগর। ভাল আবহাওয়ায় নৌকা ভিড়তে পারে কালালাউ উপত্যকার প্রবেশমুখের এই পাথুরে সৈকতে, তবে আবহাওয়া থাকতে হবে খুবই ভাল। ঠাণ্ডা মাথার কোনও পর্বতারোহী সৈকত থেকে উঠে আসতে পারে কুলাউ-এর এই রাজ্যে; কিন্তু সেই পর্বতারোহীর মাথা থাকতে হবে খুব ঠাণ্ডা, আর বুনো ছাগলদের যাতায়াতের পথ অবশ্যই তার নখদর্পণে থাকতে হবে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, কুলাউ-এর ভাঙাচোরা, বিকৃত চেহারার প্রজারা বুনো ছাগলের পথ ধরে প্রায় অনায়াসেই উঠে আসতে পারে চূড়ান্ত দুর্গম এই রাজ্যে।

'ভাইসব,' বলতে শুরু করল কুলাউ।

কিন্তু এই সময় বানরাকৃতি সেই মানুষদের একজন ছাড়ল উন্মাদসুলভ এক তীক্ষ্ণ চিৎকার, আর কুলাউ অপেক্ষা করে রইল

যতক্ষণ না চিৎকারটা পাথুরে দেয়ালগুলোতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে হতে মিলিয়ে যায় নিস্পন্দ রাতের গহ্বরে।

‘ভাইসব, ব্যাপারটা কি অদ্ভুত নয়? এই দেশ ছিল আমাদের, অথচ এখন এই দেশ আর আমাদের নেই। ঈশ্বরের বাণী প্রচারকারী আর সেই ব্যবসায়ীরা দেশের পরিবর্তে আমাদের কী দিয়েছে? তোমাদের কেউই কি এই দেশের পরিবর্তে এক ডলার, মাত্র একটা ডলারও পেয়েছ? তবু এই দেশ তাদের, আর তার পরিবর্তে তারা বলতে পারে যে আমরা চাইলে খেতে কাজ করতে পারি, তাদের খেতে, এবং হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরেও আমরা সেখানে যা-ই ফলাই না কেন সেই ফসল হবে তাদের। ভেবে দেখো সেই পুরানো দিনগুলোর কথা, তখন আমাদের কোনও কাজ করতে হত না। আমরা যখন রুগ্ন হয়ে পড়লাম, তারা কেড়ে নিল আমাদের স্বাধীনতা।’

‘এই রোগ এখানে কে আনল, কুলাউ?’ জানতে চাইল কিলোলিয়ানা, হালকা-পাতলা একজন মানুষ যার মুখে এমনই এক হরিণশাবকের মত হাসি যে কেউ এটাও আশা করতে পারে, তার পায়ের দিকে তাকালে দেখা যাবে চেরা খুর। হ্যাঁ, পা চেরা তার ঠিকই, কিন্তু তা খুরের কারণে নয়, সে-চেরার সৃষ্টি হয়েছে ক্ষত পচে গিয়ে। তবু এটাই কিলোলিয়ানা, দলের সবচেয়ে দুঃসাহসী পর্বতারোহী, বুনো ছাগলের যাতায়াতের প্রত্যেকটা পথ যার নখদর্পণে, কুলাউ আর তার বিকৃত চেহারার অনুসারীদের পথ দেখিয়ে যে অনায়াসে নিয়ে যেতে পারে কালালাউয়ের যে-কোনও খাঁজে।

‘ভাল প্রশ্ন করেছ,’ জবাব দিল কুলাউ। ‘কারণ, আমরা কাজ করব না মাইল মাইলব্যাপী আখ খেতগুলোতে যেখানে একদা শান্তিতে চরে বেড়িয়েছে আমাদের ঘোড়া, আর তা টের পেয়েই সাগরপার থেকে এনেছে তারা চীনা ক্রীতদাস। এবং চীনা সেই ক্রীতদাসদের সঙ্গেই এখানে এসেছে বিশ্রী এই চীনা রোগ—যে-

রোগে ভুগছি আমরা আর যে-রোগের কারণে তারা আমাদের বন্দি করতে চায় মোলোকাই-এ। জন্মেছি আমরা কাউয়াই-এ। অন্য দ্বীপগুলোতেও ছিলাম আমরা, কেউ এখানে কেউ সেখানে, ওয়াহুতে, মাউই-এ, হাওয়াই-এ, হনলুলুতে। কিন্তু যেখানেই থাকি না কেন বারবার আমরা ফিরে এসেছি কাউয়াই-এ। কেন ফিরে এসেছি আমরা? নিশ্চয় তার পেছনে একটা কারণ রয়েছে। কারণটা হলো, কাউয়াইকে আমরা ভালবাসি। 'এখানেই জন্মেছি আমরা। বাস করেছি এখানে। গায়ে মেখেছি এখানকার আলো-বাতাস। আর তাই, এখানেই আমরা মরব—যদি না—যদি না—আমাদের মাঝে থাকে দুর্বল মনের কেউ। এসব ভীতুদের আমরা চাই না। তারা মোলোকাই কারাগারেরই উপযুক্ত। আর আমাদের মাঝে যদি সত্যিই ভীতু থাকে, আমাদের সঙ্গে তাদের না থাকাই ভাল। আগামীকাল সেনারা নামবে সৈকতে। ভীতুরা পাহাড় থেকে নেমে চলে যাক তাদের কাছে। সেনারা দ্রুত তাদের পাঠিয়ে দেবে মোলোকাই-এ। আমরা এখানে থাকব, এবং লড়াই করব। কিন্তু আমরা মরব না, জানি। আমাদের আছে রাইফেল। তোমরা জানো, এখানকার দুর্গম পথ এতই সরু যে সেখানে পাশাপাশি দু'জন মানুষ আসার কোনও উপায় নেই, আসতে হবে একজনের পেছনে আরেকজন, হামাগুড়ি দিয়ে, আর আমি কুলাউ, একদা যে ছিল নিহাউ-এর এক রাখাল, সরু সেই পথে একাই মোকাবিলা করতে পারি একহাজার সেনাকে। আর এই যে কাপাহেই, একদা যে ছিল বিচারক, আজ তাকে খোঁজা হচ্ছে ইঁদুরের মত, ঠিক যেমন খোঁজা হচ্ছে আমাকে আর তোমাদের। সবাই শোনো তার কথা। সে জ্ঞানী মানুষ।'

কাপাহেই উঠে দাঁড়াল। একদা সে ছিল বিচারক। পড়াশোনা করেছে পুনাহুর কলেজে। পাশাপাশি বসে পানাহার করেছে ধর্মপ্রচারক আর ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষাকারী জমিদার, দলপতি আর বিদেশি শক্তির উচ্চ ক্ষমতাসীন প্রতিনিধিদের সঙ্গে। হ্যাঁ,

এমনই ছিল কাপাহেই। কিন্তু আজ সে যেন সত্যিই শিকারীর তাড়া খাওয়া এক ইঁদুর, মানবিক আতঙ্কের পঙ্কিল গর্তে এতটাই নিমজ্জিত যে একইসঙ্গে সে এখন উঠে গেছে আইনের ঊর্ধ্বে এবং তলিয়ে গেছে আইনের নিম্নে। মুখ জুড়ে পচনে সৃষ্ট ছোট ছোট গর্ত ও ভ্রূ এবং পাতাবিহীন চোখের গনগনে দৃষ্টি ছাড়া তার চেহারা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

'আমাদের ঝামেলা না করাই ভাল,' শুরু করল সে। 'আমরা একা একা থাকতে চেয়েছি। কিন্তু যদি তারা আমাদের একা থাকতে না দেয়, তা হলে ঝামেলা সৃষ্টির দায় নিয়ে তাদের ভোগ করতে হবে শাস্তি। তোমরা দেখেছ, আঙুল আর নেই আমার।' সবাইকে দেখাবার জন্যে ওপরে তুলল সে তার আঙুলবিহীন হাতটা। 'তবু এখনও রয়ে গেছে আমার বুড়ো আঙুলের একটা গাঁট যা পুরানো দিনের মত আজও টানতে পারে রাইফেলের ট্রিগার। আমরা কাউয়াইকে ভালবাসি। এখানেই আমরা বরং বাস করব, আর এখানেই মরব, কিন্তু নিজেদেরকে বন্দি হতে দেব না মোলোকাই-এ। এই রোগ আমাদের নয়। আমরা কোনও পাপ করিনি। ঈশ্বরের বাণী প্রচারক আর ব্যবসায়ীরা এনেছে এই রোগ, তাদের কুলি ক্রীতদাসগুলোর মাধ্যমে। আমি বিচারক ছিলাম। আইন আর বিচার আমার বেশ ভালভাবেই জানা আছে, আর তাই তোমাদের বলতে চাই যে একজন মানুষের দেশ চুরি করা, তাকে চীনা রোগে রোগগ্রস্ত করা, আর তারপর তাকে যাবজ্জীবন কারাগারে বন্দি করা অন্যায়।'

'ছোট্ট এই জীবন, আর দিনগুলো যন্ত্রণায় ভরা,' বলল কুলাউ। 'এসো সবাই পান করে আর নেচে যথাসাধ্য সুখী হবার চেষ্টা করি।'

পাথুরে একটা গুহা থেকে লাউয়ের খোলা বের করে দেয়া হলো সবাইকে। লাউয়ের খোলাগুলো ভরা টাই লতা (Ti) থেকে চোলাই করা তীব্র মদে। খানিক পর তরল সেই আগুন যখন

তাদের স্নায়ু বেয়ে পৌঁছে গেল মগজে, এখন যে তারা আর পুরুষও নয় নারীও নয় সে-কথা ভুলে আবার যেন তারা হয়ে গেল স্বাভাবিক পুরুষ আর নারী। যে-মহিলাটির শূন্য কোটর বেয়ে নামছিল তপ্ত অশ্রু, আবার তার ধমনিতে ধমনিতে সঞ্চারিত হলো উত্তেজক জীবন, একটা হাওয়াইয়ান গিটারের তারে ঝঙ্কার তুলে কণ্ঠ চিরে বের করল সে এমন এক বর্বর ভালবাসার সুর যেমনটা হয়তো একমাত্র শোনা যেত আদিম পৃথিবীর অরণ্য-গহীনে। সুর তার ভেসে বেড়াল বাতাসে ভর করে, মৃদু উদ্ধত সেই সুরে বিপথে যাবার প্রলোভন। একটা মাদুরের ওপর, মহিলার গানের তালে তালে নাচতে লাগল কিলোলিয়ানা। নাচে তার মনোভাবের সন্দেহাতীত প্রকাশ। তার নাচের প্রতিটি ছন্দে ছন্দ তুলেছে ভালবাসা, আর তার পাশেই মাদুরের ওপর নেচে চলেছে এক মহিলা যার ভারী নিতম্ব আর উদার স্তনে ফুটেছে রোগ-ক্ষয়িষ্ণু মুখের বিপরীত এক কাহিনি। এই নাচ জীবন্মৃতদের নাচ, কারণ, তাদের বিকৃত শরীরের গভীরে এখনও লালিত হচ্ছে জীবন ও আকুলতা। শূন্য কোটর থেকে তপ্ত অশ্রু ঝরানো মহিলা গেয়েই চলল তার ভালবাসার গান, উষ্ণ রাতে নর্তক-নর্তকীরা নেচেই চলল তাদের ভালবাসার নাচ, যতক্ষণ না লাউয়ের খোলা হাতবদল হতে হতে তাদের সবার মগজে হামাগুড়ি দিতে লাগল স্মৃতি আর কামনা। মাদুরের ওপর নাচতে থাকা মহিলার পাশাপাশি নাচল হালকা-পাতলা এক কুমারী, সুন্দর মুখ তার সম্পূর্ণ অবিকৃত, কিন্তু ওঠানামা করা বাহুতে রোগের ধ্বংসলীলা। আর দুর্বোধ্য শব্দ তোলা বানরাকৃতির দু'জন নাচল আলাদা আলাদা; অদ্ভুত, উদ্ভট সে-নাচে ভালবাসার হাস্যকর অনুকরণ।

কিন্তু মহিলার ভালবাসার গান থেমে গেল মাঝপথে, লাউয়ের খোলা নামাল পানকারীরা, বন্ধ হলো নাচ, সবার চোখ এখন নীচের সাগরের দিকে যেখানে এইমাত্র চন্দ্রালোকে গা ভাসিয়ে ওপরে উঠে গেছে একটা রকেটের নিস্তেজ আলো।

'সেনারা এসে গেছে,' বলল কুলাউ। 'আগামীকাল লড়াই হবে। আমাদের এখন ভালভাবে ঘুমিয়ে প্রস্তুতি নেয়া উচিত।'

কুষ্ঠরোগীরা তার আদেশ মেনে হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল তাদের নিজ নিজ আশ্রয়ে। জোছনায় বসে রইল কেবল নিশ্চল কুলাউ, হাঁটুর ওপরে তার আড়াআড়িভাবে রাখা রাইফেল, দৃষ্টি অনেক নীচের সৈকতে নোঙর করা নৌকাগুলোর ওপর।

আশ্রয় হিসেবে কালালাউ উপত্যকার শেষ প্রান্ত নির্বাচন করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। খাড়া পাথুরে দেয়ালের ওপর দিয়ে পেছনে যাবার পথটা একমাত্র কিলোলিয়ানার চেনা থাকার ফলে সে ছাড়া যে-কোনও মানুষ কুষ্ঠরোগীদের গিরিসঙ্কটে পৌঁছুতে চাইলে তার প্রায় ক্ষুরধার একটা শৈলশিরা ধরে আসা ছাড়া উপায় নেই। পথটা বড়জোর বারো ইঞ্চি চওড়া। দু'পাশেই মুখ ব্যাদান করে আছে অতল খাদ। একবার পা হড়কালেই, সোজা সে-মানুষ নেমে যাবে ডান বা বামপাশের মৃত্যুগহ্বরে। কিন্তু কোনওমতে পথটা পেরোলেই নিজেকে সে দেখতে পাবে পার্থিব এক স্বর্গে। পুরো জায়গাটা জুড়ে যেন এক গাছপালার সাগর; সবুজে মোড়া পাথুরে দেয়ালগুলো, ঝুলে আছে রাশি রাশি আঙুরলতা, খাঁজে খাঁজে উঁকি মারছে অজস্র জাতের ফার্ন। কুলাউ-এর শাসনকাল শুরু হবার পর মাসের পর মাস অনুসারীদের নিয়ে তাকে লড়াই করতে হয়েছে সবুজ এই সাগরের সঙ্গে। শ্বাসরোধী জঙ্গলকে বারবার পিছু হটিয়ে দিতে হয়েছে সেগুলোর কবল থেকে বুনো কলা, কমলা আর আমকে রক্ষা করার খাতিরে। কিছু কিছু ফাঁকা জায়গায় জন্মেছে বুনো অ্যারারুট, টারো আর তরমুজ; এসব ছাড়া যেখানেই প্রবেশ করতে পেরেছে সূর্যালোক সেখানেই সোনালি ফলভারে নুয়ে পড়ছে বুনো পেঁপের অসংখ্য গাছ।

কুলাউকে এই আশ্রয়ে তাড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে সৈকতের পাশের নিচু উপত্যকা থেকে। এখান থেকেও যদি বারবার তাড়া

খায় তা হলেও কোনও অসুবিধে নেই, জড়াজড়ি করে থাকা অসংখ্য পর্বতচুড়োর ফাঁকফোকরের গিরিসঙ্কটগুলো চেনা আছে তার, প্রজাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে শুরু করতে পারবে সে নতুন করে বসবাস। এখন রাইফেল পাশে নিয়ে বসে আছে সে, লতাপাতার ফাঁক দিয়ে লক্ষ করছে সৈকতের ওপর সেনাদের গতিবিধি। সঙ্গে করে কামান এনেছে তারা, আয়নার মত সেগুলোর গা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যালোক। ক্ষুরধার শৈলশিরাটা ঠিক তার সামনে। সেখানে পৌঁছাবার পথ ধরে এগিয়ে আসছে খুদে ক'জন মানুষ। সে জানে, ওই যে অনেক দূর থেকে এগিয়ে আসছে, তারা সেনা নয়, পুলিশ। তারা ব্যর্থ হলেই কেবল মাঠে নামবে সেনারা।

বাঁকা একটা হাত রাইফেলের নলের ওপর বোলাল সে আদরের ভঙ্গিতে, নিশ্চিত হয়ে নিল যে সাইট একদম পরিষ্কার আছে। নিহাউ থাকতেই গুলি করা শিখেছে সে, দ্বীপটার কেউই তার অব্যর্থ নিশানার কথা ভোলেনি। যতই এগোল, খুদে থেকে ধীরে-ধীরে বড় হতে লাগল মানুষগুলো। সে পাল্লা মাপল মনে মনে, বিবেচনা করল বয়ে যাওয়া তীব্র বাতাসের কথা, ভাবল লক্ষ্যবস্তু অনেকখানি নীচে থাকায় ওপর দিয়ে গুলি করার সম্ভাবনা নিয়ে। কিন্তু সে গুলি করল না। তারা পথটার মুখে না আসা পর্যন্ত সে জানতে দিল না তার উপস্থিতি, তারপর নিজেকে প্রকাশ না করেই কথা বলল ঝোপের ভেতর থেকে।

'তোমরা কী চাও?' জানতে চাইল সে।

'আমরা কুষ্ঠরোগী কুলাউকে চাই,' জবাব দিল স্থানীয় পুলিশদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা নীলচোখো এক আমেরিকান।

'এক্ষুনি ফিরে যাও,' বলল কুলাউ।

লোকটাকে সে চেনে, ডেপুটি শেরিফ, তার তাড়া খেয়েই নিহাউ থেকে এসেছে সে কালালাউ উপত্যকায়, তারপর উপত্যকা থেকে এই গিরিসঙ্কটে।

'তুমি কে?' জানতে চাইল শেরিফ।

'আমিই কুষ্ঠরোগী কুলাউ,' জবাব ভেসে এল।

'তা হলে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসো। আমরা তোমার সন্ধানেই এসেছি। জীবিত বা মৃত, তোমার মাথার মূল্য ধরা হয়েছে একহাজার ডলার। তুমি পালাতে পারবে না।'

ঝোপের ভেতর থেকে জোরে হেসে উঠল কুলাউ।

'বেরিয়ে এসো!' আদেশ দিল শেরিফ, কিন্তু সে আদেশের জবাব দিল না কেউ।

শেরিফকে পুলিশদের সঙ্গে পরামর্শ করতে দেখে কুলাউ বুঝতে পারল, তারা একযোগে তার দিকে ছুটে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'কুলাউ,' গলা চড়াল শেরিফ। 'কুলাউ, আমি তোমাকে ধরতে আসছি।'

'তা হলে আগে সূর্য, সাগর আর আকাশ ভালভাবে দেখে নাও, কারণ, ওগুলো দেখার সুযোগ তুমি আর পাবে না।'

'ঠিক আছে, কুলাউ,' বলল শেরিফ নরম সুরে। 'আমি জানি তোমার নিশানা অব্যর্থ। কিন্তু তুমি আমাকে গুলি করবে না। আমি কখনওই তোমার কাছে অন্যায় করিনি।'

ঝোপের মধ্যে ঘোঁত করে উঠল কুলাউ।

'বলছিলাম, আমি কখনওই তোমার কাছে অন্যায় করিনি, করেছি বলো?' শেরিফের স্বরে নাছোড়বান্দার ভাব।

'প্রথম অন্যায় করেছ তুমি আমাকে বন্দি করতে চেয়ে,' জবাব এল এবার। 'দ্বিতীয় অন্যায় করেছ আমার মাথার জন্যে ঘোষিত একহাজার ডলার বাগাবার চেষ্টা করে। যদি বাঁচতে চাও, যেখানে আছ সেখানেই থাকো।'

'তোমাকে ধরার জন্য আমাকে এগোতেই হবে। আমি দুঃখিত। এটা আমার কর্তব্য।'

'পা বাড়ানো মাত্র মারা যাবে তুমি।'

শেরিফ কাপুরুষ নয়। তবু সে সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। তাকাল সে দু'পাশের মুখ ব্যাদান করে থাকা অতল খাদের দিকে, ক্ষুরধার পথটার ওপরও তার দৃষ্টি ঘুরে এল একবার–ওই পথটা যে তাকে পেরোতেই হবে। তারপর সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

'কুলাউ,' হাঁক ছাড়ল সে।

কিন্তু নীরব হয়ে রইল ঝোপ।

'কুলাউ, গুলি কোরো না। আমি আসছি।'

পেছন ফিরে পুলিশদের কিছু আদেশ দিল শেরিফ, তারপর এগোতে লাগল সেই ভয়ঙ্কর পথ ধরে। গতি বাড়ানোর কোনও উপায় নেই। এটা যেন সার্কাসের দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা। ভর দেয়ার জন্যে এখানে রয়েছে শুধুই বাতাস। তার পায়ের নীচে মড়মড় করে উঠল লাভার পাথর, ভেঙে যাওয়া টুকরোগুলো নেমে গেল দু'পাশের খাদে। সূর্যের খাড়া তাপে তার মুখ থেকে দরদর করে ঝরতে লাগল ঘাম। তবু তিলতিল করে এগিয়ে এসে সে দাঁড়াল মাঝ বরাবর।

'থামো!' ঝোপ থেকে ভেসে এল কুলাউ-এর আদেশ। 'আর একটা ধাপ এগোবার সঙ্গে সঙ্গে আমি গুলি করব।'

থামল শেরিফ, দুলতে লাগল অত্যন্ত সরু সেই পথে ভারসাম্য রক্ষার খাতিরে। মুখ তার ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, তবে চোখজোড়ায় কঠিন সঙ্কল্পের চিহ্ন। কথা বলার আগে চেটে শুকনো ঠোঁট ভেজাল সে।

'কুলাউ, তুমি আমাকে গুলি করবে না। জানি, তুমি আমাকে গুলি করবে না।'

আবার এগোতে লাগল সে। সঙ্গে সঙ্গে কান ঘেঁষে ছুটে যাওয়া বুলেট ঘোরাল তাকে আধ পাক। মুখে ফুটে উঠল নালিশ-মেশানো একটা বিস্ময়। নিজেকে রক্ষার শেষ একটা চেষ্টা করল সে, পরক্ষণেই তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল মৃত্যু। এবার শূন্য ক্ষুরধার পথ ধরে তেড়ে এল পাঁচ পুলিশ। একইসঙ্গে

বাহিনীর বাকি পুলিশেরা গুলি ছুঁড়তে লাগল ঝোপ লক্ষ্য করে। পাঁচ বার ট্রিগার টানল কুলাউ, এত দ্রুত যে পাঁচটা গুলি তুলল সম্মিলিত একটা ঝনঝন শব্দ। চোখের পলকে বার বার স্থান পরিবর্তন করে ব্যর্থ করে দিল সে পুলিশদের প্রত্যেকটা গুলি। মাথার ওপর দিয়ে বেশকিছু বুলেট সাঁ সাঁ করে ছুটে যাবার পর উঁকি দিল সাবধানে। চারটে পুলিশ শেরিফকে অনুসরণ করে হারিয়ে গেছে অতল খাদে। পঞ্চম পুলিশটা পড়ে আছে ক্ষুরধার সরু পথটার উপর, এখনও জীবিত। ইতিমধ্যেই গুলি বন্ধ করে দিয়েছে পথের ওপাশের পুলিশেরা। আড়ালহীন এই পাথুরে অঞ্চলে তাদের এগোবার আর কোনও আশা নেই। তারা নেমে যাবার আগে কুলাউ অনায়াসেই খতম করে দিতে পারত পঞ্চম পুলিশটাকে। কিন্তু সে গুলি করল না, আর, নিজেদের মাঝে আলোচনা সেরে নিয়ে, একজন সাদা আণ্ডারশার্ট খুলে দোলাতে লাগল পতাকার মত, তারপর সারি বেঁধে গিয়ে দাঁড়াল তাদের আহত সঙ্গীর কাছে। কুলাউ কোনও জবাব দিল না, তবে তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের চলে যেতে দেখল নীচের উপত্যকার দিকে।

দু'ঘণ্টা পর, আরেক ঝোপের ভেতর থেকে কুলাউ লক্ষ করল, উপত্যকার উল্টো পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে পুলিশের আরেকটা বাহিনী। সে দেখল, যতই তারা ওপরে উঠল, তাদের সামনে দিয়ে ছুটে ছুটে পালিয়ে গেল বুনো ছাগলের দল। শেষমেশ নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, সে ডেকে পাঠাল কিলোলিয়ানাকে।

'না, এখানে আসার কোনও উপায় নেই,' বলল কিলোলিয়ানা, তার পাশে হামাগুড়ি দিয়ে।

'ছাগলগুলোর পথ ধরে?' জানতে চাইল কুলাউ।

'ওগুলো এসেছে পাশের উপত্যকা থেকে, কিন্তু এখানে আসতে পারবে না। কোনও পথও নেই। ওই লোকগুলো পাহাড়ি ছাগলের চেয়ে চালাক নয়। হয়তো তারা নিজেদের মৃত্যু ডেকে

আনবে। দেখা যাক।'

'তারা সাহসী লোক,' বলল কুলাউ। 'দেখা যাক।'

অত্যন্ত পরিশ্রম করে উঠে আসতে লাগল তারা ওপরে, ওপরে, আরও ওপরে, তারপর হঠাৎ করেই ঘটল ঘটনা। পা হড়কে গেল তিনজনের, গড়াতে গড়াতে একটা শৈলশিরার প্রান্তে ধাক্কা খেয়ে, সোজা নেমে গেল তারা একহাজার ফুট নীচে।

খিকখিক করে হাসল কিলোলিয়ানা।

'আমাদের আর ঝামেলা পোহাতে হবে না,' বলল সে।

'তাদের সঙ্গে কামান আছে,' জবাব দিল কুলাউ। 'সেনারা এখনও লড়াইয়ে যোগ দেয়নি।'

ঝিম ধরানো বিকেলে বেশিরভাগ কুষ্ঠরোগীই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রইল নিজ নিজ গুহায়। রাইফেলটা পরিষ্কার করে, হাঁটুর ওপর রেখে, আপন গুহার সামনে বসে ঢুলতে লাগল কুলাউ। এক ঝোপে শুয়ে বাহু-বেঁকে-যাওয়া কুমারীটা তীক্ষ্ণ চোখ রাখল ক্ষুরধার পথটার ওপর। হঠাৎ চমকে জেগে গেল কুলাউ সৈকতের ওপর থেকে ভেসে আসা বিস্ফোরণের শব্দে। আতঙ্ক-জাগানো সেই শব্দে যেন একদম ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল চারপাশের শান্ত পরিবেশ। ক্রমেই নিকটবর্তী হলো ভয়ঙ্কর শব্দ। শঙ্কিত চোখে, যেন বস্তুটাকে দেখার আশায়, ওপরদিকে তাকাল কুলাউ। অনেক ওপরের খাড়া এক পাহাড়ে বিস্ফোরিত হলো গোলাটা, পাক দিয়ে দিয়ে বেরোতে লাগল কালো ধোঁয়ার মেঘ। পাথর টুকরো টুকরো হয়ে ঝরে পড়ল নীচে।

হাত দিয়ে ভ্রূর ঘাম মুছল কুলাউ। ভীষণ ভয় পেয়েছে সে। গোলা সম্বন্ধে তার কোনও অভিজ্ঞতা নেই, আর বস্তুটা তার এ-যাবৎ ধারণার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।

'এক,' বলল কাপাহেই, যেন হঠাৎ তার ওপর এসে পড়েছে গোলা গোনার ভার।

দ্বিতীয় আর তৃতীয় গোলা ছুটে গেল মাথার অনেক ওপর

দিয়ে, বিস্ফোরিত হলো দৃষ্টির আড়ালে কোথাও। যান্ত্রিকভাবে গুনে চলল কাপাহেই। কুষ্ঠরোগীরা এসে জড়ো হলো গুহার সামনের ফাঁকা জায়গায়। প্রথমটায় তারা আতঙ্কিত হলো, কিন্তু একের পর এক গোলা মাথার অনেক ওপর দিয়ে ছুটে যাওয়ায় আশ্বস্ত হয়ে মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল দৃশ্যটা। একেকটা গোলা বাতাস চিরে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত চিৎকার ছাড়ল বানরাকৃতির দুই কুষ্ঠরোগী। আবার সাহস ফিরে এল কুলাউ-এর বুকে। কোনও ক্ষতি হয়নি কারও। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, অতদূর থেকে অত বড় গোলা দিয়ে তারা রাইফেলের মত নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারবে না।

কিন্তু শিগ্‌গিরই পাল্টে গেল পরিস্থিতি। গোলাগুলো আর ওপর দিয়ে ছুটে না গিয়ে এসে পড়তে লাগল কাছে। একটা বিস্ফোরিত হলো ক্ষুরধার পথটার নীচের এক ঝোপে। কুলাউ-এর মনে পড়ল ওখানে পাহারায় থাকা কুমারীটার কথা, তাই ছুটল ঝোপ অভিমুখে। হামাগুড়ি দিয়ে সে যখন ভেতরে ঢুকল, তখনও সেখান থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সামনের দৃশ্যটা তাকে স্তম্ভিত করে দিল। মেয়েটা যেখানে শুয়ে ছিল সেখানে এখন বিরাট এক গর্ত। ঝোপের ডালগুলোর মতই টুকরো টুকরো হয়ে গেছে সে। গোলাটা বিস্ফোরিত হয়েছে ঠিক তার ওপর।

একটা নজর বুলিয়ে কুলাউ শুধু নিশ্চিত হয়ে নিল যে সেনারা ওই সরু পথ ধরে এগোবার চেষ্টা করছে না, তারপরেই সে ফিরতে লাগল গুহার দিকে। গোঙানির শব্দ তুলে ছুটে যেতে লাগল গোলার পর গোলা, বিস্ফোরণে যেন কাঁপতে লাগল পুরো উপত্যকা। গুহা চোখে পড়তে কুলাউ দেখল, আঙুলবিহীন হাতে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছে বানরাকৃতির দুই কুষ্ঠরোগী। এবার কুলাউ কালো ধোঁয়ার মেঘ উড়ে উঠতে দেখল তাদের দু'জনের কাছ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তারা। একজন পড়ে রইল নিশ্চল হয়ে,

অন্যজন হাতের ওপর ভর দিয়ে দেহটাকে কোনওমতে টেনে নিয়ে চলল গুহার দিকে। তার পা দুটো অসহায়ভাবে নেতিয়ে আছে মাটির ওপর, সারা শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটেছে রক্ত। সে যেন গোসল করেছে রক্তে, এগোতে এগোতে কুঁইকুঁই করছে ছোট্ট একটা কুকুরের মত। কাপাহেই ছাড়া সব কুষ্ঠরোগী পালিয়ে গেছে গুহার আশ্রয়ে।

'সতেরো,' বলল কাপাহেই। 'আঠারো,' গুনল সে আবার।

শেষ গোলাটা সোজা ঢুকে পড়ল একটা গুহায়। এই বিস্ফোরণে সবাই আবার গুহা শূন্য করে বেরিয়ে এল বাইরে। কিন্তু ওই গুহা থেকে বেরোল না আর কেউই। কটুগন্ধী ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি মেরে এগোল কুলাউ। চারটে শরীর ছড়িয়ে আছে ছিন্নভিন্ন হয়ে। তাদের একজন দৃষ্টিহীন সেই মহিলা, শূন্য কোটর বেয়ে এখনও তার গড়িয়ে নামছে অশ্রু।

বাইরে আসতে কুলাউ দেখল, তার আতঙ্কিত প্রজারা বুনো ছাগলের পথ ধরে ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে গিরিসঙ্কট বেয়ে যা তাদের নিয়ে যাবে ওপাশের জঙ্গুলে পর্বতশ্রেণীতে। হাতে ভর দিয়ে তাদের অনুসরণের ব্যর্থ চেষ্টা করছে বানরাকৃতির কুষ্ঠরোগীটা।

'ওকে মেরে ফেলাই ভাল,' বলল কুলাউ, একই জায়গায় বসে থাকা কাপাহেইকে।

'বাইশ,' জবাব দিল কাপাহেই। 'হ্যাঁ, ওকে মেরে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তেইশ–চব্বিশ।'

রাইফেলের লক্ষ্য তার দিকে স্থির হতে দেখে কুষ্ঠরোগীটার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল কুকুরের আর্তনাদ। ইতস্তত করল কুলাউ, তারপর নামিয়ে নিল রাইফেল।

'কাজটা করা কঠিন,' বলল সে।

'তুমি একটা বোকা, ছাব্বিশ, সাতাশ,' বলল কাপাহেই। 'মোটেই কঠিন কাজ নয়। দাঁড়াও, আমি করে দেখাচ্ছি।'

পাথরের বিরাট একটা খণ্ড নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, এগোতে লাগল মারাত্মকভাবে আহত রোগীটার দিকে। আঘাত করার জন্যে যখন হাত তুলল সে ওপরে, একটা গোলা এসে বিস্ফোরিত হলো তার শরীরে; রেহাই পেল সে কাজটা করার হাত থেকে, একইসঙ্গে গোলা গোনার প্রয়োজনও ফুরাল তার।

গিরিসঙ্কটে কুলাউ এখন সম্পূর্ণ একা। তাকিয়ে তাকিয়ে তার শেষ প্রজাটিকেও অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল ওপারে। তারপর ঘুরে সে নেমে এল সেই ঝোপে যেখানে মারা গেছে কুমারীটা। এখনও বর্ষিত হচ্ছে গোলা, কিন্তু সে জায়গা ছেড়ে নড়ল না; তার চোখ পড়েছে অনেক নীচের সেনাদের ওপর, এবার উঠতে শুরু করেছে তারা পাহাড় বেয়ে। একটা গোলা বিস্ফোরিত হলো বিশ ফুট দূরে। একদম মাটির সমান্তরালে শুয়ে পড়ে সে অনুভব করল তার শরীরের ওপর ঝুরঝুর করে ঝরে পড়া পাথরের কণা। হাও ফুলের রাশি রাশি হলুদ পাপড়িও ঝরে পড়ল তার ওপর। মাথা সামান্য তুলে নীচের দিকে উঁকি মেরে, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। রাইফেলের বুলেট হলে সে একেবারেই ঘাবড়াত না, কিন্তু এই গোলা একটা জঘন্য জিনিস। প্রত্যেকবার গোলার শব্দ কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠে মাথা নামাল সে; তবে প্রত্যেকবারই মাথা তুলল সেনাদের গতিবিধি দেখতে।

অবশেষে বন্ধ হয়ে গেল গোলাবর্ষণ। এর কারণ হিসেবে তার মনে হলো, সেনারা নিশ্চয় অনেক কাছে এসে পড়েছে। গিরিপথ ধরে আসছে তারা লম্বা একটা সারিতে, গুনতে গুনতে একসময় সে আর গুনতে পারল না। অন্তত একশ'জন সেনা হবে–সবাই আসছে শুধু কুষ্ঠরোগী কুলাউকে ধরতে। বুকের গভীরে ঝিকিয়ে উঠল তার ক্ষণস্থায়ী এক গর্ব। কামান আর রাইফেল, পুলিশ আর সেনাসহ তারা এসেছে তাকে ধরতে–বিকৃত শরীরের একজন মাত্র মানুষ। তার জন্যে ঘোষণা

করেছে তারা একহাজার ডলারের পুরস্কার, জীবিত বা মৃত। সারাজীবনে সে একবারে দেখেনি অতগুলো টাকা। ভাবনাটা তেতো করে ফেলল তার মন। কাপাহেই ঠিকই বলেছে। সে, কুলাউ, কোনও অপরাধ করেনি। চুরি করা দেশে কাজ করানোর খাতিরে বিদেশি হারামজাদারা এনেছে চীনা কুলি, আর সেই কুলিদের সঙ্গে এই দেশে এসেছে বিশ্রী রোগটা। আর এখন, যেহেতু তাকে এই রোগে ধরেছে, তার মূল্য এখন একহাজার ডলার–কিন্তু সে-মূল্য তার জীবনের জন্যে নয়, গোলায় টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া তার রোগে পচা জান্তব মৃতদেহটার জন্যে।

সেনারা যখন এসে পৌঁছুল অত্যন্ত সরু ক্ষুরধার পথটার কাছে, সে তাদের সতর্ক করে দিতে চাইল। কিন্তু তার চোখ মৃত কুমারীটার ওপর গিয়ে পড়ায় চুপ করে রইল সে। ছ'জন সেনা ক্ষুরধার পথটার ওপর উঠে পড়তে গুলি শুরু করল কুলাউ। ক্ষুরধার পথটা সেনাশূন্য হয়ে যাওয়ার পরেও সে থামল না। বার বার খালি করে ফেলল সে রাইফেলের ম্যাগাজিন, নতুন করে বুলেট ভরল, খালি করে ফেলল আবার। মগজে তার আগুন জ্বালল সারাজীবনের সহা অন্যায়, ফলে প্রতিহিংসা ডানা মেলল দাউদাউ করে। বুনো ছাগল যাতায়াতের পুরো পথ জুড়ে গুলি চালাচ্ছে সেনারা, আশ্রয় নেয়ার বৃথা চেষ্টা করছে ঝোপঝাড়ের আড়ালে। তার চারপাশে শিস কাটল বুলেট, ভোঁতা শব্দ তুলল, মাঝেসাঝে কোথাও ধাক্কা খেয়ে বাতাস চিরে উল্টোদিকে ছুটল বোঁ বোঁ করে। একটা বুলেট চলে গেল তার খুলির চামড়া কেটে, দ্বিতীয় আরেকটা শোল্ডার-ব্লেড ভেদ করল কোনও হাড় না ভেঙে।

এটা একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড, তবে হত্যাকাণ্ডটা চালাল একজন মাত্র মানুষ। পিছু হটতে লাগল সেনারা, দলের আহতদের সহায়তা করতে করতে। তাদের ওপর গুলি চালাতে চালাতে কুলাউ সচেতন হয়ে উঠল পোড়া মাংসের গন্ধে।

প্রথমটায় তাকাল সে চারপাশে, তারপর আবিষ্কার করল যে গন্ধটা আসছে তার নিজেরই হাত থেকে। মাংস পুড়ছে রাইফেলের গরমে। তার হাতের বেশিরভাগ স্নায়ু নষ্ট হয়ে গেছে কুষ্ঠরোগে। তাই, যদিও তার মাংস পুড়ছে আর নাকে আসছে জঘন্য গন্ধ, অসাড় হাতে যন্ত্রণার লেশমাত্র বোধ নেই।

হাসিমুখে শুয়ে রইল সে ঝোপের মাঝে, যতক্ষণ না মনে পড়ল কামানগুলোর কথা। নিশ্চয় আবার কামান চালাবে তারা, এবং এবার সেই ঝোপ লক্ষ্য করে যেখান থেকে সে তাদের এতটা ক্ষতি করেছে। পাথুরে দেয়ালের গায়ে এমন একটা খাঁজ যেখানে একটা গোলাও আঘাত হানেনি, স্থান পরিবর্তন করে কুলাউ সেখানে যাওয়ামাত্র আবার শুরু হলো গোলাবর্ষণ। গুনতে লাগল সে। গিরিসঙ্কটে আরও ষাটটা গোলা এসে পড়ার পর বন্ধ হলো কামানগুলো। বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণে ছোট জায়গাটার এমন অবস্থা হলো যেন সেখানে কোনও প্রাণীর পক্ষেই বাঁচা সম্ভব নয়। এমনটাই ভাবল সেনারা, তাই বিকেলের কড়া রোদে আবার উঠতে লাগল গিরিপথ বেয়ে। আবার পৌঁছুল তারা ক্ষুরধার পথের ওপর, আর কুলাউ-এর গুলির তোড়ে পিছু হটে আবার নেমে গেল সৈকতে।

আরও দু'দিন কুলাউ রক্ষা করল ক্ষুরধার পথটা, সেনারা গোলা ছুঁড়েই তৃপ্ত রইল। তারপর কুষ্ঠরোগী এক ছেলে, পাহাউ, গিরিসঙ্কটের পেছনের এক পাথুরে দেয়ালের ওপর উঠে চিৎকার দিয়ে জানাল, তাদের সবার খাবার জন্যে বুনো ছাগল শিকার করতে গিয়ে পাহাড় থেকে খাদে পড়ে মারা গেছে কিলোলিয়ানা, আর তাই আতঙ্কিত মহিলারা বুঝতে পারছে না এখন কী করা উচিত। ছেলেটাকে কাছে ডেকে, তার হাতে একটা রাইফেল দিয়ে গিরিপথ পাহারা দিতে বলল কুলাউ। সে দেখল, তার প্রজারা হতাশ হয়ে পড়েছে। তাদের বেশিরভাগ এত অসহায় যে এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে নিজের খাবারটুকু

পর্যন্ত সংগ্রহ করে খেতে পারে না, ফলে তারা সবাই অনাহারে আছে। শরীরে রোগ এখনও জেঁকে বসেনি এমন দু'জন মহিলাকে সে গিরিসঙ্কটে পাঠাল খাবার আর মাদুর আনতে। বাকিদের সে জোগাল সাহস আর সান্ত্বনা, শেষমেশ সবচেয়ে দুর্বল মহিলাটিও হাত লাগাল আশ্রয় তৈরির কাজে।

কিন্তু যাদের খাবার আনতে পাঠাল, তারা আর না ফিরতে, পিছাতে লাগল কুলাউ গিরিসঙ্কট অভিমুখে। পাথুরে দেয়ালটার কেবল প্রান্তে এসেছে সে, গর্জে উঠল আধ ডজন রাইফেল। একটা বুলেট ফুটো করে দিল তার কাঁধের মাংস, দ্বিতীয় বুলেটের ঘায়ে ছিটকে আসা পাথরের টুকরোয় কেটে গেল গাল। একলাফে দেয়ালের নিরাপত্তায় সরে আসার মুহূর্তে সে দেখল, গিরিসঙ্কটটা প্রায় ভরে গেছে সেনাতে। তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তারই প্রজারা। গোলাবর্ষণের ভয়ঙ্করত্বের মুখোমুখি হবার চেয়ে তারা বরং চলে যেতে চায় মোলোকাই কারাগারে।

বুলেটের সবচেয়ে ভারী বেল্টগুলোর একটা খুলে ফেলল কুলাউ। নিশ্চল শুয়ে রইল পাথরের মাঝে, তারপর প্রথম সেনাটার মাথা আর কাঁধ পরিষ্কার ফুটে উঠতে, টেনে দিল ট্রিগার। দু'বার এরকম ঘটনা ঘটার পর, খানিক বিরতিতে, মাথা আর কাঁধের পরিবর্তে পাথুরে দেয়ালের পেছন থেকে ভেসে উঠল একটা সাদা পতাকা।

'তুমি কী চাও?' জানতে চাইল সে।

'আমি তোমাকে চাই, অবশ্য তুমি যদি কুষ্ঠরোগী কুলাউ হও,' জবাব এল।

কুলাউ ভুলে গেল তার অবস্থান, ভুলল সবকিছু, শুয়ে শুয়ে অবাক হয়ে সে ভাবতে লাগল এই বিদেশিগুলোর আজব জেদের কথা, আকাশ মাথার ওপর ভেঙে পড়লেও তারা সম্ভবত নিজেদের জেদ বজায় রাখবে। হ্যাঁ, মানুষ বা আর সবকিছুর

ওপর তারা তাদের ইচ্ছে চাপিয়ে দিতে চায়, এমনকী আপন মৃত্যুর বিনিময়েও। জীবনকেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়ার সেই ইচ্ছেশক্তির প্রশংসা সে না করে পারল না। এতই শক্তিধর সেই ইচ্ছে যা সবকিছুকে তাদের ইচ্ছের পথে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য করে। অসম এই লড়াইয়ে যে কোনও আশা নেই তা-ও সে অস্বীকার করতে পারল না। একহাজার বিদেশিকেও যদি হত্যা করে সে, তবু তারা মাথাচাড়া দেবে সাগরসৈকতের বালিরাশির মত। তারা জানে না তাদের পরাজয়। এটাই তাদের দোষ আর এটাই তাদের গুণ। তার আপন মানুষজনের মাঝে রয়েছে এই বস্তুটিরই অভাব। এখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, কীভাবে তাদের দেশ দখল করেছে মুষ্টিমেয় ধর্মপ্রচারক আর ব্যবসায়ী। কারণ–

'তুমি কী বলতে চাও? আসবে আমার সঙ্গে?'

কথাটা বলছে সাদা পতাকা তুলে ধরা অদৃশ্য মানুষটা। আর দশজন বিদেশিদের মতই একজন, যে এগিয়ে এসেছে মৃত্যুর ছায়া দেখেও।

'এসো, আমরা আলাপ করি,' বলল কুলাউ।

প্রথমে জেগে উঠল সেনাটার মাথা আর কাঁধ, তারপর পুরো শরীর। মসৃণ মুখের, নীলচোখো, বছর পঁচিশের এক যুবক, ছিপছিপে শরীরে চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে ক্যাপটেনের ফিটফাট পোশাকে। এগোতে এগোতে, থেমে, বসল সে গজ বারো দূরে:

'তুমি সাহসী মানুষ,' বলল কুলাউ অবাক স্বরে। 'এখন ইচ্ছে হলে আমি তোমাকে স্রেফ একটা মাছির মত খতম করে ফেলতে পারি।'

'না, সেই ইচ্ছে তোমার হবে না,' জবাব দিল যুবক।

'কেন?'

'কারণ, রোগে শরীর যতই বিকৃত হোক, তুমি একজন খাঁটি পুরুষ, কুলাউ। আমি তোমার অনেক গল্প জানি। কাপুরুষের মত

হত্যা করা তোমার পছন্দ নয়।'

ঘোঁত করে উঠল কুলাউ, তবে সুখের ছোঁয়া অনুভব করল মনের গহীনে।

'আমার লোকজনদের নিয়ে তুমি কী করেছ?' জানতে চাইল সে। 'ছেলেটা, দুই মহিলা, আর মানুষটা?'

'তারা আত্মসমর্পণ করেছে, আমি এসেছি তোমাকেও আত্মসমর্পণ করাতে।'

হাসল কুলাউ অবিশ্বাস ভরে।

'আমি একজন স্বাধীন মানুষ,' ঘোষণা করল সে। 'কোনও অপরাধ করিনি। আমাকে তোমরা একা থাকতে দাও, এটুকুই কেবল আমার দাবি। আমি স্বাধীনভাবে জন্ম নিয়েছি, স্বাধীনভাবে বসবাস করেছি, মরবও আমি স্বাধীনভাবেই। কখনওই আত্মসমর্পণ করব না।'

'তা হলে তোমার লোকেরা তোমার চেয়ে জ্ঞানী,' জবাব দিল যুবক ক্যাপটেন। 'ওই দেখো—ওরা আসছে।'

ঘুরে কুলাউ দেখল তার দলের অবশিষ্টদের মিছিল। গোঙাতে গোঙাতে এগিয়ে আসছে বীভৎস মানুষের এক সারি। এগোল তারা আরও, এগোল আর অপমানকর মন্তব্য ছুঁড়ল কুলাউ-এর উদ্দেশে। সবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে এল কুৎসিত এক বুড়ি, থেমে সামনে বাড়াল সে পাখির মত নখরঅলা একটা হাত, তারপর মূর্তিমান মৃত্যুস্বরূপ মাথাটা একপাশ থেকে আরেক পাশে দোলাতে দোলাতে অভিশাপ দিল কুলাউকে। একের পর এক পেরিয়ে গেল তারা পাথুরে দেয়ালের প্রান্ত, আর আত্মসমর্পণ করল আত্মগোপন করে থাকা সেনাদের কাছে।

'এবার তুমি যেতে পারো,' বলল কুলাউ ক্যাপটেনকে। 'আমি কখনওই আত্মসমর্পণ করব না। এটাই আমার শেষ কথা। বিদায়।'

শৈলশিরা পেরিয়ে ক্যাপটেন ফিরে এল তার সেনাদের

কাছে। পরমুহূর্তে কোনও পতাকা না দেখিয়ে সে তুলে ধরল একটা হ্যাট, এবং চোখের পলকে সেটাকে ফুটো করে দিল কুলাউ-এর বুলেট। সেই বিকেলে গোলাবর্ষণ করতে করতে তাড়িয়ে দেয়া হলো তাকে, পিছিয়ে এসে আশ্রয় নিল সে আরোহণের প্রায় অসাধ্য পর্বতমালার খাঁজে। তবু তাকে অনুসরণ করল সেনারা।

ছয় সপ্তাহ ধরে খোঁজা হলো তাকে এক খাঁজ থেকে আরেক খাঁজে, আগ্নেয়গিরির চূড়ায়, বুনো ছাগল যাতায়াতের পথে। যখন সে লুকাল ল্যাণ্টানার বনে, অনুসরণ করল বনতাড়ুয়ার দল, ল্যাণ্টানা বন থেকে পেয়ারা ঝোপের মাঝে মাঝে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো হলো তাকে ঠিক একটা খরগোশের মত। তবু সক্ষম হলো সে সবার চোখে ধুলো দিতে। সেনাদল কিছুতেই তাকে কোণঠাসা করতে পারল না। কেউ খুব কাছে চলে এলে, তার অব্যর্থ রাইফেল তাকে পৌঁছে দিল মৃত্যুর জগতে। ঝোপের মাঝে তার তামাটে শরীর পলকের জন্যে চোখে পড়ামাত্র গুলি চালাল সেনারা। একবার, পাঁচ সেনা তাকে দেখে ফেলল বুনো ছাগল যাতায়াতের পথে। মুহূর্তে তারা খালি করে ফেলল নিজ নিজ রাইফেল, তবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে গেল সে পর্বতের আরও উঁচু খাঁজে। মাটির ওপর রক্তের চিহ্ন দেখে তারা বুঝল, কুলাউ আহত হয়েছে। ছয় সপ্তাহ পর হাল ছেড়ে দিল সেনাদল। পুলিশ আর সেনাবাহিনী ফিরল হনলুলুতে, কালালাউ উপত্যকা বজায় রইল তার রাজ্য হিসেবে। অবশ্য একহাজার ডলারের লোভে মাঝে মাঝে তার পিছু নিল মুণ্ডশিকারীরা, কিন্তু সেই লোভ তাদের উপহার দিল মৃত্যু।

দু'বছর পর, শেষবারের মত হামাগুড়ি দিয়ে কুলাউ গিয়ে ঢুকল এক ঝোপে, শুয়ে পড়ল টাই-পাতা আর বুনো আদাফুলের মাঝে। স্বাধীনভাবে বসবাস করেছে সে, এবং মারাও যাচ্ছে স্বাধীনভাবেই। ঝুরঝুর করে পড়তে লাগল বৃষ্টির ফোঁটা, জীর্ণ

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢাকল সে জীর্ণ এক কম্বলে। শরীরে জড়ানো অয়েলস্কিনের কোট, বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা মাউজার রাইফেল। পরম স্নেহে মুছল সে নলের ওপরের ময়লা, কিন্তু যে-হাত দিয়ে মুছল এমন একটা আঙুলও তাতে আর অবশিষ্ট নেই যা দিয়ে টানা যাবে রাইফেলের ট্রিগার।

বন্ধ করল সে চোখজোড়া, কারণ, ভীষণ শারীরিক দুর্বলতা আর মগজের ভেতরের অস্পষ্ট এক আলোড়ন তাকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল, আর বেশি দূরে নেই শেষের সেই ক্ষণ। মরার সময় যেমন আড়াল খোঁজে বুনো পশু, ঠিক তেমনই যেন সে আজ আড়াল খুঁজে নিয়েছে ঘন এই ঝোপে। অর্ধ-সচেতন, লক্ষ্যহীন, ভবঘুরে, ফিরে গেছে সে আবার নিহাউ-এর শৈশবে। যতই অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে জীবন, আর কানে অস্পষ্ট হয়ে আসছে বৃষ্টির রিমঝিম, ততই যেন ঝলকাচ্ছে শৈশবের দৃশ্যাবলী। আবার যেন ব্যস্ত হয়ে ঘোড়া বশ মানাচ্ছে সে, ওদিকে প্রতিবাদে লাফাচ্ছে ঘোড়ার বাচ্চাগুলো। পরমুহূর্তেই, তেড়ে যাচ্ছে সে পার্বত্যাঞ্চলের তৃণভূমিতে চরা বুনো ষাঁড়ের দিকে, তারপর রশির ফাঁস ছুঁড়ে বশ মানিয়ে সেগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে নীচের উপত্যকায়।

টগবগিয়ে ছুটে বেড়াল সে তারুণ্যের তেজী রাজ্যে, অবশেষে নিদারুণ এক যন্ত্রণা তাকে ফিরিয়ে আনল বাস্তবে। বিকৃত হাতজোড়া ওপরে তুলে তাকিয়ে রইল সে অবাক হয়ে। কিন্তু কীভাবে? কেন? পূর্ণ সেই বুনো যৌবন কেন পরিবর্তিত হবে এই বীভৎসতায়? তারপর, একমুহূর্তের জন্যে, আবার তার মনে পড়ল যে সে হলো কুলাউ, কুৎসিত এক কুষ্ঠরোগী। ক্লান্তিতে কাঁপতে কাঁপতে বুজে গেল তার ভারী চোখের পাতা, কান আর শুনতে পেল না বৃষ্টিপাতের শব্দ। পুরো শরীরে শুরু হলো এক কাঁপুনি সেই কাঁপুনিও থামল একসময়। মাথাটা অর্ধেক তুলল সে মাটি থেকে, কিন্তু সেটা আবার গড়িয়ে পড়ল

পেছনে। তারপর খুলে গেল তার চোখজোড়া, আর বন্ধ হলো না। চেতনার সর্বশেষ বিন্দুতে তার ঝলকিত হলো মাউজারের কথা, আর তাই বেঁকে যাওয়া, আঙুলবিহীন হাতে রাইফেলটাকে সে বুকে চেপে ধরল গভীর মমতায়।

মূলঃ জ্যাক লণ্ডন
রূপান্তরঃ খসরু চৌধুরী

তোমার মা কেমন আছেন?

প্রতিদিনের মত জর্জ সাইকেলে করে রুটির দোকানে এল। ওদের শহরটা ছোট। প্রায় গ্রামের মতই। সবাই সবাইকে চেনে এখানে। জর্জ হেরাল্ড এখানে এসেছে প্রায় দু'বছর। শহরের এক কোণে ছোট্ট একটা বাড়ি কিনে উঠেছে সে। সে আর তার শয্যাশায়ী মা। জর্জের মা অবশ্য এতটাই অসুস্থ যে তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না। জর্জ হেরাল্ড স্থানীয় একটি কোম্পানির অ্যাকাউণ্ট সেকশনে কাজ করে।

জর্জের সাইকেলের ঘণ্টা শুনে বেরিয়ে এলেন দোকানের মালিক, হাতে গরম রুটি। রুটিগুলো জর্জের সাইকেলের বাস্কেটে তুলে দিলেন তিনি।

'চমৎকার দিন, তাই না, জর্জ?'

'হ্যাঁ। অবশ্যই। ধন্যবাদ, স্যর।'

'তো, তোমার মা কেমন আছেন?'

'আজ একটু ভাল।'

'আহারে, ভদ্রমহিলা বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন।' মাথা নাড়লেন দোকানি।

জর্জ ঘড়ি দেখল। তাড়া দেখা গেল তার মধ্যে। 'চলি, স্যর। মা বাসায় একা। তা ছাড়া, অফিসে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বিদায়। দেখা হবে।'

জর্জ বো করে সাইকেল ঘুরিয়ে চলে গেল। পেছন থেকে এসে দাঁড়ালেন দোকানির স্ত্রী। অ্যাপ্রনে হাত মুছতে মুছতে সমবেদনার

সুরে বললেন তিনি, 'আহারে! ছেলেটা কী কষ্টই না করছে। বিয়ে করেনি, একজন গার্লফ্রেণ্ড পর্যন্ত নেই। সারাদিন অসুস্থ বুড়ো মায়ের সাথে থাকা...'

দোকানি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'বড়ই ভাল ছেলে।'

জর্জ বাড়ি পৌঁছে দেখল দরজায় পোস্টম্যান দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে হাসল সে।

'সরি, মি. হেরাল্ড। আমি ভেবেছি আপনি বাসায়। আপনার মা বোধহয় বেল শুনতে পাননি।'

জর্জ লজ্জিত হেসে দরজা খুলতে লাগল। 'দুঃখিত। মা কানে ভাল শোনেন না। তা ছাড়া, ওনার হাঁটা-চলার ক্ষমতা নেই।'

পোস্টম্যানের চোখে সহানুভূতি ফুটল। 'সরি, স্যর। তা আজ উনি কেমন আছেন?'

'একই রকম।'

জর্জ বাড়িতে ঢুকেই চেঁচাল। 'আমি ফিরেছি, মা। এখুনি আসছি।'

এবার পোস্টম্যানের দিকে মনোযোগ দিল ও। 'তো আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

'আপনার একটা রেজিস্টার্ড চিঠি এসেছে। সাইন করতে হবে।'

পোস্টম্যানের খাতায় সই করে চিঠিটা নিল জর্জ। পোস্টম্যান চলে গেলে দরজা লাগিয়ে চিঠিটা পড়ল। চিঠি পড়া শেষে দোতলায় মায়ের ঘরের দরজায় দাঁড়াল সে। 'মা! আমি লটারি জিতেছি। ১০,০০০ পাউণ্ড। আমরা অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছি, মা!'

দু'দিন পর জর্জ অফিস শেষে বাড়ি যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে, হঠাৎ বসের রুমে ডাক পড়ল।

'মি. হেরাল্ড, আপনি একটু বসুন। আমি সাউথে লোক পাঠাব। আপনি যাবেন।'

জর্জের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'কিন্তু স্যর...

'কোনও সমস্যা?'

'আমার মা ভীষণ অসুস্থ, স্যর। শয্যাশায়ী। তাকে ফেলে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'একটা হোমে দিয়ে আসুন না। অথবা হাসপাতালে।'

'না, স্যর। মাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।'

'দুটো দিনেরই তো ব্যাপার...'

'দুঃখিত, স্যর।'

বস্ এবার বিরক্ত হলেন। জর্জ আস্তে করে বের হয়ে এসে অফিস ছাড়ার জন্য তৈরি হলো।

বাড়ি ফিরে জর্জ চমকে উঠল। দরজা ভাঙা! দ্রুত ভেতরে ঢুকল ও। রান্নাঘরে ভীষণ ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধ। প্রচণ্ড ভয় পেল জর্জ। দৌড়ে রান্নাঘরের দিকে যেতেই ওখান থেকে বেরিয়ে এল স্থানীয় পুলিশ সার্জেন্ট। তার চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। জর্জকে দেখে থমকে গেল সে। অস্বাভাবিক শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল। 'হ্যালো, জর্জ! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'মাত্র অফিস থেকে এলাম। কী হয়েছে, সার্জেন্ট?'

সার্জেন্ট শ্রাগ করল। 'তেমন কিছু না। তুমি পানির হিটার অফ করতে ভুলে গেছিলে। আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আগুন লেগেছে বুঝতে পেরে ভেতরে ঢুকলাম। কারণ সবাই জানে তোমার মা শয্যাশায়ী। অসহায় বৃদ্ধাটি হয়তো পুড়েই মরবেন। তেমন কিছু ক্ষতি অবশ্য হয়নি। হিটারটা আর কাবার্ডের একটা অংশ পুড়ে গেছে।'

জর্জ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট।'

সার্জেন্ট এক পা এগিয়ে এল। 'কিন্তু, জর্জ...তোমার মা কোথায়?'

জর্জ চমকে উঠল। 'মা-নে? ওই তো ওপরে, বেডরুমে।'

'আমি পুরো বাড়িটা দেখেছি, জর্জ। এমনকী ভাঁড়ারেও। তোমার মা কোথাও নেই। এমনকী একজন ভদ্রমহিলার ব্যবহার্য

কিছুই এ বাড়িতে নেই। তোমার মা-বাবা কিংবা আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব কারও ছবিও নেই।'

জর্জের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এক পা পিছিয়ে এল ও। সার্জেন্ট আরও সামনে বাড়ল।

'ঘটনা কী, জর্জ? তোমার মা কোথায়?'

'মা...মা...মা তো কিছুদিন আগে... মারা...গেছে।'

সার্জেন্ট দ্রুত এগিয়ে এসে জর্জের কাঁধ ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। 'শান্ত হয়ে বসো, জর্জ। কী হয়েছিল, বলো।'

'মা...মা...মারা গেছেন।'

'কবে?'

'দু'দিন আগে...না...তিনদিন বোধহয়।'

'কীভাবে?'

'হঠাৎ করে। ঘুমের মধ্যে।'

'তুমি তাঁর শেষকৃত্য করোনি?'

'না। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে মা নেই।'

'কাউকে বলোনি?'

'বলব কী, আমি নিজেই তো বুঝতে পারছিলাম না।'

'লাশ কী করেছ?'

'বাগানে...বাগানে...'

সার্জেন্ট কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'দুঃখিত, জর্জ। আমি জানি না, তুমি সত্যি কী করেছ। কিন্তু তুমি সম্ভবত মার্ডার কেসে পড়তে যাচ্ছ।'

পরদিন সকল স্থানীয় ও দৈনিক পত্রিকায় খবরটি এল। রুটির দোকানি আর তাঁর স্ত্রী মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলেন খবরটি। 'রহস্যময় মাতৃহত্যা। ১০,০০০ পাউণ্ড লটারি বিজয়ী আটক।' দোকানির স্ত্রী খুবই দুঃখের সাথে মাথা নাড়লেন। 'বিশ্বাসই হয় না এমন একটা ছেলে...' দোকানি পেপারটা দেখালেন। 'এখানে লিখেছে জর্জ আসলে পিতৃপরিচয়হীন। ওর মা ক্যাবারে ড্যান্সার

ছিল। জন্মের পরই ওকে চার্চে ফেলে যায় মহিলা। তার খোঁজ চলছে। তা হলেই বোঝা যাবে ওই মহিলাই খুন হয়েছে, নাকি অন্য কেউ।'

পুলিশ জর্জের পুরো বাগান তুলে ফেলল। কিন্তু কোনও লাশ পেল না। জিজ্ঞাসাবাদ হলো আবার। জর্জ শান্ত গলায় বলল, 'আমার মা কে আমি তা জানি না। চার্চে বড় হয়েছি আমি। অনাথ হিসেবে লেখাপড়া করেছি। অবশেষে একটা চাকরি নিয়ে আলাদা জীবন শুরু করলাম। কিন্তু অন্য উপদ্রব শুরু হলো। সবাই পরিচিত হতে চায়, বন্ধু হতে চায়, পার্টিতে নিয়ে যেতে চায়...এমনি যন্ত্রণা। আমি একাকী জীবন চাই। তাই বার বার চাকরি বদলালাম। শহর পরিবর্তন করলাম। তারপর বের করলাম এই বুদ্ধি। মা বানালাম একটা, তাকে ভীষণ অসুস্থ বানালাম। লোকের সঙ্গ এড়াতে এই মায়ের জুড়ি নেই। মায়ের কথা বললেই কেউ আর আমাকে বিরক্ত করে না। শেষে এমন হলো, আমি নিজেই তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা শুরু করলাম। মনে হলো মা আছে। সত্যি আছে।'

খবরের কাগজের হেডিং বদলে গেল। জর্জ রাতারাতি খুনী থেকে এক নিঃসঙ্গ অসহায় যুবকে পরিণত হলো। এক রিপোর্টার খুঁজে বার করল জর্জের আসল মাকে। নিউ টাউনের এক বারের মহিলা দালাল সে এখন। বুড়ি জানাল পঁচিশ বছর আগে এই ছেলেকেই সে চার্চে ফেলে গিয়েছিল। জনগণের চোখে সমবেদনার প্রতীক হয়ে উঠল জর্জ। পেপারে হেডিং এল—'নিঃসঙ্গ জীবনের অদৃশ্য মা।'

পেপারটা নিয়ে সার্জেন্ট অফিসে ঢুকল। জর্জকে আজ ছেড়ে দেয়া হবে। এ ক'দিনেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে ছেলেটি। 'যাও, জর্জ। বাড়ি যাও,' বলল সার্জেন্ট।

জর্জ করুণ চোখে তাকাল সার্জেন্টের দিকে।

ওর জন্যে প্রগাঢ় মমতা বোধ করল সার্জেন্ট। 'কী হলো?

...আচ্ছা, তুমি না অস্ট্রেলিয়া যাবে বলেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'লটারির টাকা তুলবে কবে?'

জর্জ অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

সার্জেন্ট ওর হাত ধরল। 'চলো, আমিও যাচ্ছি।'

এক সপ্তাহ পরের ঘটনা। জর্জের প্যাকিং শেষ। একটু আগে পাড়া-পড়শীরা দেখা করে গেছে। সবাই সহানুভূতি দেখাল। জর্জ কালই যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার পথে।

রান্নাঘরে কফি খাচ্ছিল জর্জ, হঠাৎ বেল বাজল। ও নিশ্চিত, পড়শীদের কেউ। বিদায় জানাতে এসেছে। ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে দরজা খুলল ও। অবাক হলো। একজন বৃদ্ধা মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে চড়া মেকআপ এবং সস্তা দামের এমন জামা কাপড় পরে আছে যেগুলো সাধারণত টিন-এজাররা পরে। জর্জ মহিলাকে চিনতে পারল না।

অথচ মহিলা একগাল হাসল ওকে দেখে। 'হ্যালো, জর্জ।'

জর্জ জবাব দিল না।

'ঢুকতে দেবে না নাকি? আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।' মহিলা জর্জকে আলতো করে সরিয়ে ঢুকে পড়ল হিলের খট্ খট্ শব্দ তুলে।

এবার কথা বলল জর্জ। 'সরি, ম্যাম। আপনাকে আমি চিনতে পারিনি।'

'আশ্চর্য! আমি তোমার মা, জর্জ!'

জর্জ মুহূর্তে শক্ত হয়ে গেল। হঠাৎ ওর চোখে পড়েছে মহিলার চুল সোনালি এবং কার্লি, চোখ নীল এবং ঠোঁট পাতলা—ঠিক ওর মতই।

মহিলা বলে যাচ্ছে। 'আমি তোমাকে ফেলে গেছি, কারণ আমার কোনও উপায় ছিল না। তা ছাড়া আমি জানতাম না তোমার বাবা কে। এখন আমি তোমার খোঁজ পেয়েছি। তুমি

এখন ধনী। তোমার উচিত এখন এই বৃদ্ধা দরিদ্র মাকে দেখাশোনা করা।'

মহিলা বলেই যাচ্ছে। জর্জের শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হতে শুরু করল। মুঠো শক্ত করে ও মহিলার দিকে এগোল। লাল হয়ে উঠেছে মুখ।

মহিলা এদিকে বলেই চলেছে। 'দেখাশোনা তেমন দরকার নেই। তুমি আমাকে নগদ টাকা দিতে পারো। ইচ্ছে করলে মাসে মাসে দিতে পারো...।'

জর্জ সামনে এগোল আরও। হঠাৎ মহিলা বুঝে ওঠার আগেই তার গলা চেপে ধরল ও। আর চাপা গলায় বলতে লাগল। 'আমার জীবনটা শেষ করে তুই টাকা নিতে এসেছিস!'

জর্জের যখন হুঁশ ফিরল তখন মহিলার লাশ মেঝেতে লুটিয়ে আছে। জর্জ ঘাবড়ে গেল। কী করবে এখন? এক মুহূর্ত চিন্তা করে লাশটা বাগানে মাটিচাপা দিল ও। তারপর গাড়ি নিয়ে সোজা চলে এল পুলিশ স্টেশনে।

ওর কথা শুনে হাই তুলল সার্জেন্ট। 'তুমি বলতে চাচ্ছ তোমার মাকে তুমি খুন করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'গলা টিপে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর? মাটিচাপা দিয়েছ বাগানে?'

জর্জ এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। 'হ্যাঁ। হ্যাঁ। সার্জেন্ট। আমাকে গ্রেফতার করুন।'

সার্জেন্ট ঘুম ঘুম চোখে ওর দিকে তাকাল। 'তোমার ফ্লাইট কখন, জর্জ?'

'কাল সকালে।'

'তা হলে বাসায় গিয়ে একটা কড়া ঘুম দাও। নইলে সকাল সকাল উঠতে পারবে না। প্যাকিং শেষ?'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন আমি চলে যাব?'

'অবশ্যই যাবে. এবং এয়ারপোর্টে পৌঁছে আমাকে ফোন করে জানাবে যে নিরাপদে পৌঁছেছ।'

জর্জ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'আমি সত্যি চলে যাব?'

ওর চেয়েও বেশি অবাক গলায় সার্জেন্ট বলল, 'তা না হলে কী করবে?'

'মায়ের লাশটা...' ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিল সার্জেন্ট। 'ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। বাড়ি যাও।'

'কিন্তু...'

'জর্জ! এখন রাত ১২.১০ বাজে। আমি এত রাতে আর বিরক্ত হতে চাই না। তুমি যাও। শুভ রাত্রি।'

জর্জ পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল। পরিষ্কার আকাশ। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। জর্জ আকাশ ভরা তারার দিকে চেয়ে হালকা গলায় বলল, 'তা হলে কাল আমরা অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছি, মা।'

মূল: সাইমন ব্রেট
রূপান্তর: সাবরিনা খান ছন্দা

বোকার স্বর্গ

কোনও এক সময়, কোনও একখানে, কাদিশ নামে এক লোক বাস করত। অ্যাটজেল নামে তার এক ছেলে ছিল, একমাত্র সন্তান। কাদিশের বাসায় দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়, আকসাহ নামে এক এতিম মেয়েও থাকত। অ্যাটজেল লম্বা চেহারার ছেলে। কালো চুল তার, কালো চোখের মণি। আর আকসাহ নীলনয়না এবং সোনালি চুলের অধিকারিণী। দু'জনে ওরা সমবয়সী। ছেলেবেলায় একসাথে খেলা করত, একসাথে পড়াশোনা করত, খেত। সবাই একরকম ধরেই নিয়েছিল, বড় হলে বিয়ে হবে ওদের।

কিন্তু ওরা বড় হওয়ার পরপরই অ্যাটজেল হয়ে পড়ল অসুস্থ। এ ধরনের অসুস্থতার কথা কেউ কোনওদিন শোনেনি: অ্যাটজেল নিজেকে মৃত কল্পনা করতে শুরু করল।

হঠাৎ করে এরকম চিন্তা ওর মাথায় ঢুকল কী করে? সবাই ধারণা করল, এজন্যে দায়ী ওর ছেলেবেলার আয়া। সে ওকে অনর্গল স্বর্গের গল্প শোনাত। সে বলত, স্বর্গে কাজ কিংবা পড়াশোনা কোনও কিছুই করার দরকার পড়ে না। স্বর্গে গেলে মানুষ বুনো ষাঁড়ের ও তিমির মাংস খায়; পান করে প্রিয় বান্দাদের জন্যে খোদার আলাদা করে তুলে রাখা শরাবন তহুরা। ওখানে যত খুশি খাও আর ঘুমাও, কেউ কিছু বলতে আসবে না—কোনও কাজ তো নেই।

অ্যাটজেল স্বভাবে অলস। সাতসকালে উঠে পড়তে বসা তার ধাতে সয় না। একদিন বাবার ব্যবসার দায়িত্ব ওকেই বুঝে নিতে হবে, জানে, এবং এজন্যে সে রীতিমত চিন্তিত।

স্বর্গে যেতে হলে মরা ছাড়া যেহেতু গতি নেই, ও কাজটাই ঝটপট সেরে ফেলবে, সিদ্ধান্ত নিল সে। চিন্তাটা এমনভাবেই জড়িয়ে গেল ওর মগজে; শীঘ্রিই নিজেকে মৃত কল্পনা করতে শুরু করে দিল সে।

ওর বাবা-মা পড়ে গেল মহা ফাঁপরে। চিন্তায়-চিন্তায় ঘুম হারাম তাদের। ওদিকে গোপনে কান্নাকাটি করে আকসাহ। সবাই মিলে কত চেষ্টাই না করল, কিন্তু বান্দা মানতে নারাজ সে জীবিত। তার কেবল এক কথা, 'আমাকে তোমরা কবর দিচ্ছ না কেন? দেখতে পাচ্ছ না আমি মরে গেছি? এই তোমাদের জন্যেই আমার স্বর্গে যাওয়া হচ্ছে না।'

রাজ্যের ডাক্তার ডাকা হলো ছেলের চিকিৎসার জন্যে। তারা কতভাবেই না বোঝাল সে বেঁচে আছে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল, ও কথা বলছে, নিয়মিত পেট পুরে খাচ্ছে। কিন্তু ক'দিন পর থেকে দেখা গেল খাওয়া-দাওয়া একরকম ছেড়ে দিয়েছে অ্যাটজেল, কথাও প্রায় বন্ধ। ছেলেটা বাঁচবে না, ভয় পেল ওর পরিবার।

শোকে মুহ্যমান কাদিশ মস্ত এক বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হলো। ভদ্রলোকের নাম ড. ইয়োয়েত্‌জ। রোগীর সমস্যার কথা শুনে, কাদিশকে বললেন তিনি, 'আটদিনের মধ্যে আপনার ছেলেকে সারিয়ে তুলব আমি, কিন্তু একটা শর্ত আছে। আমি যা বলব সব মানতে হবে আপনাদের—আমার কথা শুনতে যত অদ্ভুতই লাগুক না কেন।'

কাদিশ রাজি হলো এবং ডাক্তার কথা দিলেন সেদিনই আসবেন। কাদিশ বাড়ি ফিরে সবাইকে ডাক্তারের নির্দেশের কথা জানাল।

ডাক্তার এলে, তাঁকে সোজা অ্যাটজেলের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ছেলেটি বিছানায় শোয়া, অনাহারে ফ্যাকাসে আর লিকলিকে হয়ে পড়েছে।

ডাক্তার ওকে একনজর দেখার পরই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বাসায় লাশ ফেলে রেখেছেন কেন আপনারা? কবর দেয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না কেন?'

ডাক্তারের গর্জন শুনে বাবা-মার মুখ শুকিয়ে আমসি, কিন্তু অ্যাটজেলের চোখজোড়া ঝিক করে জ্বলে উঠল। মুখে ফুটল হাসি। 'কী, বলেছিলাম না?' বলে উঠল ও।

ডাক্তারের কথা শুনে হকচকিয়ে গেলেও, প্রতিশ্রুতির কথা ঠিকই খেয়াল আছে বাবা-মার। কাজেই, তখুনি শেষকৃত্যের আয়োজন করতে শুরু করল তারা।

ডাক্তার অনুরোধ করেছেন একখানা ঘর সাজাতে হবে স্বর্গের অনুকরণে। ফলে, দেয়ালে ঝোলানো হলো সাদা সাটিন। সব ক'টা জানালা শক্ত করে এঁটে, পর্দা লাগিয়ে দেয়া হলো। দিন-রাত ওখানে জ্বলবে শুধু মোমবাতি। ঠিক হলো কাজের লোকেরা পিঠে ডানা বেঁধে, সাদা পোশাকে দেবদূতের অভিনয় করবে।

খোলা এক কফিনে শোয়ানো হলো অ্যাটজেলকে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হলো তার। খুশি ধরে না অ্যাটজেলের, পুরোটা সময় ঘুমিয়ে কাবার করল সে। ঘুম যখন ভাঙল, অচেনা এক কামরায় নিজেকে আবিষ্কার করল। 'আমি কোথায়?' প্রশ্ন করল ও।

'স্বর্গে, হুজুর,' জবাব দিল এক ডানাধারী ভৃত্য।

'ভীষণ খিদে পেয়েছে,' বলল অ্যাটজেল। 'তিমির মাংস আর শরাবন তহুরা পেলে মন্দ হত না।'

খাস ভৃত্য হাততালি দিতেই, ছুটে এল পরী আর দেবদূতের দল। সোনালি ট্রেতে করে ডালিম, মাংস, মাছ, খেজুর, আনারস আর পিচ ফল নিয়ে এসেছে। দীর্ঘদেহী এক ভৃত্য পানপাত্র ভরে

এনেছে শরাবন তহুরা।

গোগ্রাসে গিলল অ্যাটজেল। খাওয়া সেরে ঘোষণা করল এখন সে বিশ্রাম নেবে। দু'জন দেবদূত কাপড় ছাড়তে সাহায্য করল ওকে এবং গোসল করিয়ে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শোয়াল। যে-সে বিছানা নয়, সিল্কের চাদর মোড়া আর ওপরে লাল মখমলের শামিয়ানা টাঙানো। শীঘ্রি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল অ্যাটজেল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল। কিন্তু ঘরের ভেতর তেমনি অন্ধকার। খড়খড়ি নামানো এবং মোমবাতি জ্বলছে। ওর ঘুম ভাঙতে দেখে, কাজের লোকেরা গতকালকের মত সেই একই খাবার নিয়ে এল।

অ্যাটজেল জবাব চাইল, 'দুধ, কফি, তাজা রোল আর মাখন নেই তোমাদের কাছে?'

'জী না, হুজুর। স্বর্গে এলে সবসময় একই খাবার খেতে হয়,' বলল ভৃত্য।

'এখন কি দিন নাকি রাত?'

'স্বর্গে, হুজুর, দিন-রাত নেই।'

একই খাবার আজও খেতে হলো অ্যাটজেলকে। বলা বাহুল্য, গতকালের মত খুশি হতে পারল না সে। খেয়েদেয়ে জানতে চাইল ও, 'ক'টা বাজে?'

'স্বর্গে সময়ের হিসাব রাখা হয় না,' জবাব দিল ভৃত্য।

'আমি এখন কী করব?' অ্যাটজেল জবাব চাইল।

'স্বর্গে কেউ কিছু করে না, হুজুর।'

'অন্য সব সাধু-সন্তরা কোথায়?'

'এখানে সব পরিবার আলাদা-আলাদা থাকে,' জবাব এল।

'এখানে বেড়াতে যাওয়া যায় না?'

'স্বর্গে একেকটা জায়গা অনেক দূরে দূরে। একখান থেকে আরেকখানে যেতে কয়েক হাজার বছর লেগে যায়।'

'আমার পরিবারের লোকজন কবে আসবে?'

‘আপনার বাবার আয়ু এখনও বিশ বছর, আর আপনার মার ত্রিশ। পৃথিবীর মায়া কাটাবেন, তারপর তো আসবেন।’

‘আর আকসাহ?’

‘তার আরও পঞ্চাশ বছর দেরি আছে।’

‘আমাকে কি ততদিন একা থাকতে হবে নাকি?’

‘জী, হুজুর।’

মুহূর্তের জন্যে চিন্তামগ্ন হলো অ্যাটজেল, মাথা নাড়ল। তারপর প্রশ্ন করল, ‘আচ্ছা, আকসাহ এখন কী করবে?’

‘আপাতত আপনার জন্যে শোক করছে। তবে শীঘ্রিই আপনাকে সে ভুলে যাবে। অন্য কোনও সুদর্শন তরুণের সাথে পরিচয়-টরিচয় হবে, শেষে বিয়েও হয়ে যাবে। জ্যান্ত মানুষদের তো এই-ই নিয়ম।’

অ্যাটজেল সটান উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করল। অনেক বছর বাদে ওর কিছু একটা কথার সাধ জাগল মনে, কিন্তু স্বর্গে তো হাত-পা বাঁধা। বাবাকে বড্ড মনে পড়ছে, প্রাণ কাঁদছে মার জন্যে; বুক ভেঙে যেতে চাইছে আকসাহর কথা ভাবতেই। আহা, পড়ার কিছু একটা এখন পেত যদি—ঘুরে বেড়াতে, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে, ওর প্রিয় ঘোড়াটা দাবড়াতে মনটা আকুলিবিকুলি করে উঠল।

একটা সময় এল, বিষণ্নতা চাপা দেয়া আর সম্ভব হলো না। জনৈক ভৃত্যের উদ্দেশে মন্তব্য করল ও, ‘বেঁচে থাকা দেখতে পাচ্ছি যতটা মনে করেছিলাম ততখানি খারাপ না।’

‘বেঁচে থাকা বড় কষ্টের, হুজুর। পড়াশোনা করতে হয়, কাজ করতে হয়, টাকা রোজগার করতে হয়। অথচ এখানে তো ওসব ঝামেলা নেই।’

‘এখানে হাঁ করে বসে থাকার চাইতে বরং কাঠ কাটা আর পাথর বওয়াও ভাল। এরকম কদ্দিন চলবে?’

‘চিরদিন।’

'চিরদিন এখানে পচে মরতে হবে নাকি আমাকে?' মনের দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল অ্যাটজেল। 'তারচেয়ে আমার মরণও ভাল।'

'আপনি তো মরেই আছেন, আবার মরবেন কীভাবে?'

স্বর্গবাসের অষ্টম দিনে, অ্যাটজেল যখন অতিষ্ঠ, এক ভৃত্য ওর কাছে এসে শেখানো বুলি আওড়াল, 'হুজুর, মস্ত ভুল হয়ে গেছে। আপনি মারা যাননি। আপনাকে এখন স্বর্গ ছাড়তে হবে।'

'আমি বেঁচে আছি?'

'জী, আপনাকে আমি পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।'

অ্যাটজেলের তো খুশিতে বাকবাকুম দশা। কাজের লোকটা ওর চোখ বেঁধে, বাড়ির দীর্ঘ করিডর ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, ওর পরিবার যেখানটায় অপেক্ষা করছে সেখানটায় নিয়ে এল। এবার খুলে দেয়া হলো ওর চোখের বাঁধন।

ঝলমলে রোদ ছিল সেদিন। খোলা জানালা গলে সূর্যকিরণ এসে ঘরে পড়েছে। বাগান থেকে ভেসে আসছে পাখিদের কলতান আর ভ্রমরের গুঞ্জন। খুশির চোটে বাবা-মাকে, আকসাহকে একে-একে জড়িয়ে ধরল অ্যাটজেল, চুমু খেল।

'তুমি কি আমাকে এখনও ভালবাসো?' আকসাহকে প্রশ্ন করল ও।

'নিশ্চয়ই, অ্যাটজেল। তোমাকে কি আমি ভুলতে পারি?'

'তা হলে আর দেরি না করে আমাদের বিয়েটা সেরে ফেলা উচিত।'

শীঘ্রিই বিয়ের আয়োজন করা হলো। বিশেষ অতিথি হলেন ড. ইয়োয়েত্জ। বাজনদাররা বাজনা বাজাল, দূর-দূরান্ত থেকে এল মেহমান। সাতদিন-সাতরাত ধরে চলল অনুষ্ঠান।

সুখের সংসার হলো ওদের। স্বামী-স্ত্রী বহু বছর বাঁচল। ও ঘটনার পর কোথায় পালাল অ্যাটজেলের আলসেমি! গোটা দেশে ওর মত করিৎকর্মা ব্যবসায়ী আর দুটো ছিল না।

বিয়ের পর জানতে পারে অ্যাটজেল, ড. ইয়োয়েত্‌জ কীভাবে তার ভূত ছাড়ান এবং ও যে বোকার স্বর্গে বাস করে এসেছে সে কথা। ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনীদের কাছে ড. ইয়োয়েত্‌জের আজব চিকিৎসার গল্প ফলাও করে প্রায়ই বলত ওরা স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু শেষ করত এই বলে, 'তবে স্বর্গ আসলে কেমন জায়গা কেউ বলতে পারে না।'

মূলঃ আইজাক বাশেভিস সিঙ্গার
রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন

বাজি

প্রায় ছ'টা বাজে। একটা বিয়ার কিনে সুইমিংপুলের ধারে বসে সূর্যাস্ত উপভোগ করলে মন্দ হয় না।

বার-এ গিয়ে একটা বিয়ার কিনলাম আমি। বাগান পার হয়ে পা বাড়ালাম সুইমিংপুলের দিকে।

বাগানটি খুব সুন্দর। লম্বা লন, অ্যাজালিয়াসের ঝাড় আর নারকেল বীথির সমন্বয়ে চমৎকার লাগছে দেখতে। জোরাল হাওয়ায় দুলছে নারকেল গাছের পাতা, আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে সবুজ ডাব।

সুইমিংপুলের চারপাশে কয়েকখানা ডেক-চেয়ার, বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো। সাদা টেবিল, ওপরে ঝলমলে ছাতা। তার নীচে বেদিং সুট পরে বসে আছে নারী-পুরুষের দল। পুলে একটা রাবার বল নিয়ে খেলা করছে তিন-চারটে মেয়ে আর জনা বারো ছেলের একটা দল। খেলা মানে বল নিয়ে লোফালুফি।

পুলের ধারে দাঁড়িয়ে ওদেরকে দেখছিলাম। মেয়েগুলো ইংরেজ। এ হোটেলেই থাকে। ছেলেগুলোকে চিনতে পারলাম না। তবে উচ্চারণ শুনে মনে হলো আমেরিকান। নেভাল ক্যাডেট হতে পারে। আজ সকালেই আমেরিকান একটা ট্রেনিং শিপ নোঙর ফেলেছে বন্দরে।

একটা হলুদ ছাতার নীচে গিয়ে বসলাম। চারটে খালি চেয়ার। অন্য কেউ নেই। বিয়ারের ক্যানে চুমুক দিতে দিতে একটা সিগারেট ধরালাম।

বিয়ার খেতে খেতে, সিগারেট হাতে সুইমিংপুলের ধারে বসার মজাই আলাদা। সবুজ পানিতে তরুণ-তরুণীদের উচ্ছ্বসিত দাপাদাপি দেখেও বেশ আনন্দ পাচ্ছি।

আমেরিকান ক্যাডেটগুলো ইংরেজ মেয়ে-গুলোর সঙ্গে জমিয়েছে ভালই। ডাইভ দিয়ে পড়ছে পানিতে, একজন আরেকজনের পা ধরে ডিগবাজি খাওয়াচ্ছে। সেই সাথে চলছে হাহা হিহি।

হঠাৎ লোকটাকে চোখে পড়ল আমার। ছোটখাট, বুড়ো মানুষ। বেশ দ্রুত হেঁটে আসছে পুলের পাশ দিয়ে। সাদা, নিভাঁজ সুট পরনে তার, হাঁটছে না যেন ছোট ছোট লাফ দিচ্ছে। মাথায় ক্রীম কালারের বড় পানামা হ্যাট। পুলের লোকজন দেখতে দেখতে আসছে সে।

আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। হাসল। বেরিয়ে পড়ল অমসৃণ, ইঁদুরে দাঁত। প্রত্যুত্তরে আমিও হাসলাম।

'মাফ করবেন, বসিটে পারি?'

'অবশ্যই,' বললাম আমি। 'বসুন না।'

চেয়ারের পেছনটা দেখল সে সতর্ক দৃষ্টিতে, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসল পা জোড়া আড়াআড়ি ভাবে রেখে। তার সাদা হরিণের চামড়ার জুতোর সব জায়গায় ছোট ছোট ছিদ্র। বাতাস ঢোকার জন্যে।

'ভারি সুন্দর সন্ধ্যা,' বলল সে। 'জ্যামাইকাতে অবশ্য সব সন্ধ্যাই সুন্দর।' লোকটার উচ্চারণ শুনে ঠিক বুঝতে পারলাম না সে কোন্ দেশের। স্প্যানিশ বা ইটালিয়ান হতে পারে। তবে দক্ষিণ আমেরিকার যে হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। লোকটার বয়স সত্তুরের কাছাকাছি হবে।

'হ্যাঁ,' সায় দিলাম আমি। 'এখানকার সবগুলো সন্ধ্যাই সুন্দর।'

'কিণ্টু এরা কারা?' পুলের সাঁতারুদের দিকে ইঙ্গিত করল

সে। 'ডেখে টো মনে হচ্ছে না হোটেলের বাসিণ্ডা।'

'ওরা আমেরিকান সেইলর,' জানালাম আমি। 'মানে নাবিক হবার ট্রেনিং নিচ্ছে।'

'আমেরিকানডের ডেখেই বোঝা যায়। ওরা ছাড়া এটো হল্লা আর কে করবে? আপনি নিশ্চই আমেরিকান নন, টাই না?'

'না,' বললাম আমি। 'আমি আমেরিকান নই।'

হঠাৎ আমেরিকান ক্যাডেটদের একজন পুল ছেড়ে চলে এল আমাদের টেবিলের সামনে। গা বেয়ে পানি ঝরছে। তার সঙ্গে একটি ইংরেজ মেয়েও এসেছে।

'এ চেয়ারগুলো কি দখল হয়ে গেছে?' জানতে চাইল আমেরিকান তরুণ।

'না,' জবাব দিলাম আমি।

'বসা যাবে?'

'যাবে।'

'ধন্যবাদ,' বলল সে। ছেলেটির হাতে একটি তোয়ালে। চেয়ারে বসে তোয়ালের ভাঁজ খুলে সিগারেটের প্যাকেট এবং লাইটার বের করল। মেয়েটিকে সিগারেট দিল। নিল না মেয়েটি। খাবে না। আমাকে অফার করল একটা। নিলাম। বুড়োকেও দিতে যাচ্ছিল। সে বলল, 'ঢন্যবাদ। আমার কাছে সিগার আছে।' কুমিরের চামড়ার একটা কেস খুলে সে একটা সিগার বের করল, তারপর কাঁচির মত একটা ছুরি দিয়ে সিগারের গোড়াটা কেটে ফেলল।

'আসুন, ধরিয়ে দিই,' লাইটার এগিয়ে দিল তরুণ।

'এমন বাটাসে আগুন ধরাটে পারবে না,' বলল বুড়ো।

'অবশ্যই পারব। জোর বাতাসেও আমার লাইটার ধরানো যায়। সবসময় যায়।'

মুখ থেকে সিগার সরাল লোকটা, মাথাটা একদিকে কাত করে তাকাল আমেরিকানের দিকে।

‘সবসময় যায়?’ ধীর গলায় প্রশ্নটা করল সে।

‘অবশ্যই। কখনওই ব্যর্থ হইনি আমি।’

এখনও একপাশে মাথা কাত করে ছেলেটিকে দেখছে বুড়ো। ‘বেশ। বেশ। টুমি বলছ এই বিখ্যাত লাইটার কখনও আগুন ঢরাতে ব্যর্ট হয় না। টাই টো বলটে চাইছ টুমি?’

‘অবশ্যই,’ বলল আমেরিকান। ‘তাই বলতে চাইছি আমি।’ ছেলেটির বয়স বড়জোর কুড়ি হবে। সারা মুখে ফুটকি, নাকটা পাখির ঠোঁটের মত। ধারাল। বুকেও ফুটকির চিহ্ন, সামান্য লালচে পশমও রয়েছে। ডান মুঠিতে ধরে আছে লাইটার, হুইল বা চাকা ঘোরানোর জন্যে প্রস্তুত। ‘আমার লাইটার কখনও ব্যর্থ হয় না।’ হাসছে সে, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। ‘গ্যারান্টি দিয়ে বলছি।’

‘এক মিনিট, পিলিজ,’ সিগার ধরা হাতটা ট্রাফিক সিগনাল দেয়ার ভঙ্গিতে ওপরে উঠে গেল। ‘এক মিনিট।’ নরম, ভাবলেশশূন্য গলায় বলল বুড়ো, একদৃষ্টিতে লক্ষ করছে ছেলেটিকে। ‘এ ব্যাপারে একটা বাজি ধরলে কেমন হয়?’ হাসল সে।

‘তোমার লাইটার সত্যি জ্বলে কি না তা নিয়ে একটা বাজি ঢরতে পারি না?’

‘অবশ্যই পারি,’ বলল ছেলেটি। ‘কেন নয়?’

‘বাজি ঢরবে?’

‘অবশ্যই। অবশ্যই ধরব।’

বুড়ো সিগারের দিকে চোখ নামাল। ভাবছে কী যেন। সত্যি বলতে কী, লোকটার হাবভাব ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না আমার। মনে হচ্ছিল এসব করে ছেলেটিকে সে বিব্রতকর কোনও পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে চাইছে। একই সাথে মনে হচ্ছিল লোকটার মধ্যে রহস্যময় কিছু একটা আছে, কোনও কিছু গোপন করছে সে।

বুড়ো আবার তাকাল ছেলেটির দিকে। ধীর গলায় বলল, ‘বাজি ঢরতে আমিও পছন্দ করি। এ নিয়ে এক ডান ভাল বাজি

হয়ে যাক না। মোটা অঙ্কের বাজি?'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' বলে উঠল ছেলেটি। 'মোটা অঙ্কের বাজি ধরতে পারব না আমি। বড়জোর এক ডলার বাজি ধরতে পারি।'

লোকটা ট্রাফিক পুলিশের মত আবার হাত নাড়াল। 'শোনো। আমরা একটা মজা করব। আর এই মজায় একটা বাজি ঢরব। টারপর আমার রুমে যাব। ওখানে কোনও বাটাস নাই। আমি বাজি ঢরে বলটে পারি ওখানে টুমি টোমার বিখ্যাত লাইটার পরপর ডশবার জ্বালাটে পারবে না।'

'অবশ্যই পারব,' বলল ছেলেটি।

'বেশ। টা হলে বাজি ঢরা যাক।'

'যাক। আমি এক ডলার বাজি ধরছি।'

'না। না। আমি খুব ভাল বাজি ধরব। আমি খুব ঢনী মানুষ। আর খেলুড়ে মানুষ টো বটেই। শোনো। হোটেলের বাইরে আমার গাড়ি আছে। খুব সুন্দর, ডামী গাড়ি। আমেরিকান গাড়ি। টোমাদের ডেশের ক্যাডিল্যাক–'

'আরে, দাঁড়ান। দাঁড়ান।' ছেলেটা হেসে উঠে হেলান দিল ডেক চেয়ারে। 'অত বড় বাজি ধরার ক্ষমতা আমার নেই। এ তো স্রেফ পাগলামি।'

'এটা কোনও পাগলামি নয়। টুমি পরপর ডশবার টোমার লাইটার জ্বালাটে পারলেই গাড়িটি টোমার হয়ে যাবে। টোমার ক্যাডিল্যাকের মালিক হটে ইচ্ছা করে না?'

'অবশ্যই করে,' ছেলেটা হাসছে এখনও।

'বেশ। বেশ। টা হলে বাজি ঢরা যাক। আমি আমার ক্যাডিল্যাক বাজি ঢরছি।'

'আর আমি কী বাজি ধরব?'

লোকটা গভীর মনোযোগে ছেলেটার লাইটারের লাল রঙের ব্যাণ্ডটাকে দেখছিল। বলল, 'বোনঢু, টোমাকে এমন কোনও বাজি আমি ঢরটে বলব না যা টোমার পক্ষে ডেয়া সম্ভব নয়। বুঝটে

পেরেছ?'

'তা হলে আপনিই বলে দিন কী বাজি ধরতে পারি?'

'ছোটটো একটি জিনিস টোমাকে বাজি ঢরতে হবে। বাজি হারলে ওটা ডিটে আপট্টি করবে না টো?'

'জিনিসটা কী?'

'ঢরো, টোমার বাম হাটের কড়ে আঙুল।'

'আমার কী?' হাসি মুছে গেল ছেলেটির মুখ থেকে।

'সহজ কটা। বাজি জিটলে টুমি গাড়ি নিবে। হারলে আমি টোমার আঙুল নিব।'

'বুঝলাম না। আঙুল নেবেন মানে?'

'আমি ওটা কেটে নিব।'

'বলে কী এই লোক! এ তো পাগলামি। না। না। এসব বাজির মধ্যে আমি নেই। আমি বড়জোর এক ডলার বাজি ধরতে পারি।'

বুড়ো শরীর এলিয়ে দিল চেয়ারে, শ্রাগ করল। 'বেশ। বেশ। বেশ। টুমি টা হলে বাজি ঢরটে চাও না। টা হলে ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া যাক। কেমন?'

আমেরিকান ক্যাডেট কোনও জবাব দিল না। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পুলের দিকে। হঠাৎ মনে পড়ল এখনও সিগারেট জ্বালানো হয়নি। দুই ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট গুঁজল সে, দু'হাতের চেটো দিয়ে লাইটারটাকে আড়াল করে চাকা ঘোরাল। জ্বলে উঠল পলতে, স্থির হয়ে জ্বলতে লাগল হলদে, ছোট্ট শিখা। এমনভাবে লাইটারটাকে ধরে রেখেছে সে, বাতাস লাগলই না ওটার গায়ে।

'আমার সিগারেটটা জ্বালাতে পারি?' বললাম আমি।

'সরি। ভুলেই গেছিলাম।'

লাইটারের জন্যে হাত বাড়ালাম, কিন্তু উঠে দাঁড়াল ছেলেটি। এগিয়ে এল আমার কাছে। ধরিয়ে দিল সিগারেট।

‘ধন্যবাদ,’ বললাম আমি। ফিরে গেল সে নিজের জায়গায়।

‘কেমন কাটছে সময়?’ জিজ্ঞেস করলাম।

‘ভালই,’ জবাব দিল সে। ‘খুব সুন্দর জায়গা।’

কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা নেমে এল। তবে বুঝতে পারছিলাম বুড়োর প্রস্তাব ভাবিয়ে তুলেছে ছেলেটিকে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে সে চেয়ারে, বোঝাই যাচ্ছে টেনশন করছে। একটু পরে গা মোচড়ামুচড়ি শুরু করল। বুক চুলকাচ্ছে, ঘাড়ের কাছটা ঘষছে, শেষে আঙুল দিয়ে হাঁটুতে তবলা বাজাতে শুরু করল।

‘আপনার বাজি নিয়ে আরেকটু কথা বলতে চাই,’ অবশেষে বলল সে। ‘আপনি বলেছেন আপনার ঘরে গিয়ে যদি এই লাইটার পরপর দশবার জ্বালাতে পারি তা হলে আপনার ক্যাডিল্যাকটা আমাকে দিয়ে দেবেন। আর বাজি হারলে আমার বাঁ হাতের আঙুলটা আপনাকে কেটে দিতে হবে। এই তো?’

‘ঠিক টাই। ওটাই বাজির শর্ট। টবে আমার মনে হচ্ছে টুমি ভয় পেয়েছ।’

‘আমি হেরে গেলে কী করতে হবে? যাতে আঙুল কেটে নিতে পারেন সেজন্যে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে?’

‘না। না। টাটে কোনও লাভ হবে না। আঙুল কাটার সময় টুমি হাট সরিয়ে নিটে পারো। খেলা শুরু হবার আগে টোমার একটা হাট আমি টেবিলের সঙ্গে বেঁধে রাখব। বাজিটে হারলেই টোমার একটা আঙুল কেটে নেব।’

‘আপনার ক্যাডিল্যাকটা কোন্ সালের?’

‘বুঝটে পারলাম না!’

‘কোন্ সালের—মানে কত হয়েছে ক্যাডিল্যাকের বয়স?’

‘বয়স? আরে। ওটা আমি নটুন কিনেছি। গট বছরে। একডম নিউ কার। টবে টুমি বাজি ঢরবে বলে ভরসা পাচ্ছি না। আমেরিকানরা খুব ভীটু হয়!’

এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল ছেলেটা, ইংরেজ মেয়েটার দিকে

তাকাল, তারপর আমার দিকে। 'রাজি,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল সে। 'আপনার সঙ্গে আমি বাজি ধরতে রাজি।'

'গুড!' হাততালি দিয়ে উঠল বুড়ো। 'এখনই বাজিটা ঢরব আমরা। আর আপনি, স্যর,' আমার দিকে ফিরল সে, 'আপনি আমাদের হয়ে হবেন, কী বলে—রেফারী।'

'কিন্তু এরকম উদ্ভট বাজিতে রেফারী হবার কোনও ইচ্ছে আমার নেই,' বললাম আমি। 'খেলাটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'আমারও,' এই প্রথম কথা বলল ইংরেজ মেয়েটি। 'এটা হাস্যকর, বোকার মত একটা বাজি ধরা হয়েছে।'

'এ ছেলে হেরে গেলে আপনি সত্যি ওর আঙুল কেটে নেবেন?' জানতে চাইলাম আমি।

'অবশ্যই। আর জিটলে সে ক্যাডিল্যাক পাবে। চলো। আমার ঘরে যাই।'

উঠে দাঁড়াল ছেলেটি।

'এ বেশেই যাবে?' জিজ্ঞেস করল বুড়ো। 'কাপড় পরে নিলে হটো না?'

'না,' বলল ছেলেটি। 'এভাবেই যাব আমি।' আমার দিকে ঘুরল সে। 'স্যর, আপনি যদি দয়া করে রেফারীর দায়িত্বটা নিতেন—'

'ঠিক আছে,' বললাম আমি। 'এত করে বলছ যখন সবাই, নেব আমি রেফারীর দায়িত্ব। তবে আবারও বলছি তোমাদের বাজির ধরন পছন্দ হয়নি আমার।'

'তুমিও চলো না,' ছেলেটি বলল মেয়েটিকে। 'তুমি দর্শকের ভূমিকায় থাকবে।'

কী ভেবে রাজি হয়ে গেল মেয়েটি। লোকটা আমাদের ছোট দলটাকে নিয়ে বাগানের মাঝ দিয়ে হোটেলের উদ্দেশে পা বাড়াল। বুড়োকে এখন বেশ উত্তেজিত লাগছে, হাঁটার গতি বেড়ে গেছে, রীতিমত ঘোড়ার মত লাফাচ্ছে।

'আমি ওই দিকে থাকি,' হাত তুলে দেখাল বুড়ো। 'আগে আমার গাড়িটা দেখবেন? আছে এখানেই।'

হোটেলের সামনের ড্রাইভওয়েতে নিয়ে গেল সে আমাদেরকে। দাঁড়িয়ে পড়ল। পার্ক করা চকচকে, ম্লান-সবুজ রঙের একটি ক্যাডিল্যাকের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল।

'ওই যে আমার গাড়ি। সবুজ রঙের। পছন্দ হয়?'

'সুন্দর গাড়ি,' মন্তব্য করল ছেলেটি।

'তা হলে এবার আমার রুমে চলো। দেখা যাক গাড়িটাকে জিতটে পারো কি না।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম ওপরে। দরজা খুলল বুড়ো। ডাবল একটা বেডরুমে ঢুকে পড়লাম সবাই। বিছানার এক কোণে মহিলাদের একটা ড্রেসিং গাউন ঝুলতে দেখলাম।

'প্রথমে,' বলল সে। 'আমরা সবাই মার্টিনি পান করব।'

ঘরের দূর প্রান্তে ছোট একটা টেবিল, তাতে ড্রিংকস সাজানো। শেকার, বরফ, গ্লাস সবই আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। মার্টিনি বানাতে শুরু করল বুড়ো, একটু পরে বেল টিপে দিল। দরজায় নক্ করে ভেতরে ঢুকল এক কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা। জিনের বোতল নামিয়ে রেখে পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল লোকটা, এক পাউণ্ডের একটা নোট বাড়িয়ে দিল মহিলার দিকে। 'এটা টুমি রাখো। আমরা এখানে একটা খেলা খেলব। সেজন্যে কিছু জিনিস ডরকার। টিনটা জিনিস—কয়েকটা পেরেক, একটা হাটুড়ি, আর মাংস কাটার একটা ছুরি, কসাইরা যা ডিয়ে মাংস কাটে সেরকম একটা চাপাটি। আনটে পারবে?'

'চাপাতি!' ঢোক গিলল মহিলা। 'মাংস কাটার চাপাতি?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওটাই আমার ডরকার। আনটে পারবে কি না বলো।'

'পারব, স্যর।' বলে চলে গেল বিস্মিত মহিলা।

সবার হাতে একটা করে মার্টিনির গ্লাস ধরিয়ে দিল বুড়ো।

আমরা দাঁড়িয়েই মার্টিনির গ্লাসে চুমুক দিতে লাগলাম। লক্ষ করলাম সুন্দরী ইংরেজ মেয়েটা গ্লাসের ওপর থেকে বার বার তাকাচ্ছে ছেলেটির দিকে। আর বুড়ো নীল বেদিং সুট পরা মেয়েটিকে দেখছে। বুড়োর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বাজির ব্যাপারে সে খুবই সিরিয়াস। ছেলেটি যদি বাজিতে হেরে যায় তা হলে কী ঘটবে ভেবে শিউরে উঠলাম আমি। লোকটা সত্যি ওর আঙুল কেটে ফেলবে? তা হলে বুড়োর ক্যাডিল্যাকে করেই ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

'বাজির ব্যাপারটা তোমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে না?' ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না। বরং মজার বাজি মনে হচ্ছে,' জবাব দিল সে। ইতিমধ্যে বড়সড় একটা মার্টিনি গিলেছে।

'আমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে,' বলল মেয়েটি। 'তুমি হেরে গেলে কী হবে?'

'কিছুই হবে না। বাম হাতের কড়ে আঙুল মানুষের কোনও কাজে লাগে নাকি?' হাত বাড়িয়ে দেখাল ছেলেটি। 'এই যে আমার কড়ে আঙুল। আজ পর্যন্ত এটা কোনও কাজে লেগেছে? লাগেনি। কাজেই এটাকে নিয়ে বাজি ধরতে ক্ষতি কী? বরং মজাই লাগছে।'

হাসল বুড়ো। শেকার এনে আবার ভরে দিল সবার গ্লাস।

'খেলা শুরুর আগে,' বলল সে, 'আমি রেফারীকে গাড়ির চাবি ডিয়ে ডিচ্ছি।' সে পকেট থেকে একটা চাবি বের করে আমাকে দিল। 'আর কাগজপত্র, মানে গাড়ির কাগজপত্র এবং ইনসিওরেন্স পেপার্স গাড়ির পকেটে আছে।'

সেই কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা আবার ঢুকল ঘরে। তার এক হাতে ছোট এক চাপাতি, কসাইরা মাংস কাটতে এ ধরনের চাপাতি ব্যবহার করে, অন্য হাতে একটা হাতুড়ি এবং কয়েকটা পেরেক। 'গুড! সব জোগাড় করেছ ডেখছি। ঢন্যবাড। ঢন্যবাড। এখন টুমি যেটে

পারো।' মহিলা দরজা বন্ধ করে যাওয়া পর্যন্ত সে সবুর করল, তারপর জিনিসপত্রগুলো রাখল বিছানার এক কোণে। বলল, 'এবার প্রস্টুট হওয়া যাক, কী বলেন?' ফিরল ছেলেটির দিকে। 'একটু সাহায্য করো, পিলিজ। এই টেবিলটাকে একটু সরাটে হবে।'

টেবিল মানে হোটেলের রাইটিং ডেস্ক, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে চার ফুট বাই তিন ফুট। তাতে ব্লটিং প্যাড, কালি, কলম, কাগজ ইত্যাদি রয়েছে। দেয়ালের কাছ থেকে টেবিলটা সরিয়ে নিল ওরা, লেখার সরঞ্জাম রাখল আরেক জায়গায়।

'এবার,' বলল বুড়ো। 'একটা চেয়ার।' একটা চেয়ার রাখল টেবিলের পাশে। চটপটে আছে বুড়ো। বাচ্চাদের মত মহা উৎসাহে কাজ করছে। 'এখন পেরেকগুলো নিয়ে এসো। টেবিলে পেরেক মারতে হবে।' ছেলেটি পেরেক নিয়ে এল। টেবিলে ঠকাঠক হাতুড়ি মেরে পেরেক বসিয়ে ফেলল বুড়ো।

মার্টিনির গ্লাস হাতে বুড়োর কাণ্ড দেখছি আমরা। ছয় ইঞ্চি ব্যবধানে পাশাপাশি দুটো পেরেক ঠুকেছে সে টেবিলে। পরীক্ষা করে দেখল শক্ত ভাবে পেরেক বসানো হয়েছে কি না।

বুড়োর গতি দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে এ কাজ সে আগেও বহুবার করেছে। তার কাজে কোথাও কোনও ছন্দপতন নেই।

'এখন ডরকার কিছু রশি,' বলল সে। রশি খুঁজেও আনল। 'বেশ। এটক্ষণে প্রস্টুটি সম্পন্ন হলো। ডয়া করে টেবিলের এঢারে বসবে?' বলল সে ছেলেটিকে।

গ্লাস রেখে টেবিলের পাশের চেয়ারে বসল আমেরিকান ক্যাডেট।

'এখন ডুই পেরেকের মাঝখানে টোমার বাম হাতখানা রাখো। পেরেক পুঁটেছি ওগুলোর সাটে টোমার হাত রশি ডিয়ে বাঁঢব বলে। যাটে তুমি হাত নড়াচড়া করটে না পারো।'

ছেলেটির কব্জিতে রশি পেঁচাল বুড়ো, তারপর শক্ত করে পেরেকের সঙ্গে বাঁধল রশি। এতই শক্ত করে বাঁধল যে ছেলেটি কোনও ভাবেই তার হাত নাড়াতে পারবে না। তবে আঙুল নাড়াতে পারছিল।

'বেশ। এবার হাত মুঠো করো, কড়ে আঙুলটি বাডে। কড়ে আঙুলটি খোলা ঠাকবে, পড়ে ঠাকরে টেবিলের ওপর। বেশ! বেশ! এবার আমরা রেডি। টোমার ডান হাটে ডিয়ে এবার লাইটার জ্বালাবে। টবে এক মিনিট, পিলিজ।'

লাফ মেরে বিছানায় উঠল বুড়ো, নিয়ে এল চাপাতি। চাপাতি হাতে দাঁড়াল টেবিলের পাশে।

'আমরা সবাই রেডি?' বলল সে। 'মি. রেফারী, আপনি বললেই খেলা শুরু হয়ে যাবে।'

ইংরেজ মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটির চেয়ারের পেছনে। মুখে কোনও কথা নেই। ছেলেটি ডান হাতে লাইটার নিয়ে বসে আছে নিশ্চুপ, দৃষ্টি চাপাতির দিকে। আর বুড়ো তাকাচ্ছে আমার দিকে।

'তুমি রেডি?' জিজ্ঞেস করলাম ছেলেটিকে।

'রেডি।'

'আর আপনি?' বুড়োকে প্রশ্ন করল।

'পুরো রেডি,' বলে চাপাতি শূন্যে তুলল সে, নামিয়ে আনল ছেলেটির হাতের ঠিক দু'ফুট ওপরে, কোপ মারার জন্যে প্রস্তুত। ছেলেটি তাকাল ওদিকে। তবে চেহারায় কোনও ভাব ফুটল না। শুধু ভুরু কুঁচকে রাখল।

'বেশ,' বললাম আমি। 'শুরু করা যাক।'

ছেলেটি বলল, 'আমি লাইটার জ্বালানোর সময় আপনি জোরে জোরে গুনবেন।'

'আচ্ছা,' বললাম আমি। 'গুনব।'

বুড়ো আঙুল দিয়ে লাইটারের ঢাকনি খুলল সে, চাকায় জোরে

মোচড় দিল। ঝিক করে উঠল চকমকি পাথর, আগুন ধরে গেল সলতেতে, জ্বলে উঠল ছোট্ট হলুদ শিখা। 'এক!' ঘোষণা করলাম আমি।

আগুন নেভাল না ছেলেটি, ঢাকনি নামিয়ে রাখল। পাঁচ সেকেণ্ড পরে আবার জ্বালল লাইটার।

'দুই!'

কেউ কিছু বলছে না। লাইটারের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে ছেলেটি। হাতে চাপাতি নিয়ে বুড়োও তাকিয়ে রয়েছে ওদিকে।

'তিন!'

'চার!'

'পাঁচ!'

'ছয়!'

'সাত!' বোঝাই যাচ্ছে এটি খুব ভাল লাইটার। ঝিক করে ওঠে চকমকি পাথর, সলতে ছোট শিখা নিয়ে স্থির ভাবে জ্বলতে থাকে। আমি শুধু দেখছি ছেলেটির বুড়ো আঙুলের কারসাজি। বুড়ো আঙুল দিয়ে সে লাইটার জ্বালাচ্ছে, নেভাচ্ছে। দম নিলাম আমি, আট বলার জন্যে প্রস্তুত। বুড়ো আঙুলে ঘুরল চাকা। ঝিকিয়ে উঠল চকমকি পাথর। জ্বলে উঠল ছোট্ট শিখা।

'আট!' মাত্র বলেছি আমি, তক্ষুনি ঝড়াং করে খুলে গেল দরজা। সবাই ঘুরে তাকালাম। দোরগোড়ায় হাজির হয়েছে এক মহিলা। মাথা ভর্তি কালো চুল। দু'সেকেণ্ড ওখানে দাঁড়িয়ে রইল সে, তারপর 'কার্লোস! কার্লোস!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ভেতরে ঢুকল। কব্জি চেপে ধরল সে বুড়োর, ছিনিয়ে নিল চাপাতি, ছুঁড়ে ফেলল বিছানার ওপর, তারপর লোকটার কোটের ল্যাপেল ধরে ভয়ানক ঝাঁকাতে শুরু করল। সেই সাথে ঝড়ের বেগে তুবড়ি ছুটল মুখে। বকছে সে বুড়োকে। ভাষাটা সম্ভবত স্প্যানিশ। এত জোরে বুড়োকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে যে চেহারাটাই চেনা যাচ্ছিল না।

আস্তে আস্তে কমে এল ঝাঁকির বেগ, বুড়োকে এক ধাক্কা মেরে বিছানার ওপর পাঠিয়ে দিল মহিলা। বিছানার কোণে বসে চোখ মিটমিট করতে লাগল বুড়ো, মাথা হাতড়ে দেখছে ঘাড়ের ওপর ওটা ঠিকঠাক মত আছে কি না।

'দুঃখিত,' বলল মহিলা,, 'এরকম একটা ঘটনার জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত।' প্রায় নিখুঁত ইংরেজিতে কথাগুলো বলল সে। 'দোষ আমারই। চুল ধুতে দশ মিনিটের জন্যে বাইরে গেছি, অমনি সেই কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে কার্লোস।' মহিলার চেহারা করুণ আর বিমর্ষ দেখাল।

ছেলেটি দড়ির বাঁধন খুলছে। আমি আর ইংরেজ মেয়েটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

'কার্লোসের আসলে মাথার ঠিক নেই,' বলে চলল মহিলা।

'আমরা আগে যেখানে থাকতাম সেখানে সে বাজি ধরে বিভিন্ন লোকের হাত কেটে সাতচল্লিশটা আঙুল জোগাড় করেছে। আর বাজিতে হেরে হারিয়েছে এগারোটা গাড়ি। শেষে সবাই হুমকি দিল ওকে নিয়ে পাড়া ছাড়তে হবে। এরপর ওকে নিয়ে এখানে চলে আসি আমি।'

'আমরা টো ছোট্ট একটা বাজি ধরেছিলাম মাত্র,' বিছানার ওপর বসা বুড়ো মিনমিন করে বলল।

'তোমার সঙ্গেও নিশ্চয়ই বাজি ধরেছিল?' জিজ্ঞেস করল মহিলা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ছেলেটি। 'একটা ক্যাডিল্যাক।'

'ওর কোনও গাড়ি নেই। ওটা আমার।' জানাল মহিলা। 'ওর বাজি ধরার মত কিছু নেই তবু বাজি ধরে। যা ঘটেছে তার জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত,' মহিলাকে খুবই লজ্জিত দেখাচ্ছে।

'এই নিন আপনার গাড়ির চাবি,' টেবিলের ওপর চাবিটা রাখলাম আমি।

'আমরা টো ছোট্ট একটা বাজি ধরেছিলাম মাত্র,' আবার

বিড়বিড় করল লোকটা।

'কার্লোসের বাজি ধরার মত কিছু নেই,' বলল মহিলা। 'এ পৃথিবীতে ওর কিছু নেই। কিচ্ছু নেই। ওর যা ছিল অনেক আগেই আমি তার মালিক হয়েছি। তবে এতে প্রচুর সময় লেগেছে আমার, অনেক কষ্টও করতে হয়েছে। শেষে পেয়েছি সব কিছুই।'

ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হাসল সে। করুণ, ম্লান হাসি। এগিয়ে এল টেবিলের সামনে, হাত বাড়াল গাড়ির চাবিটি নেয়ার জন্যে।

তখন আমি দেখতে পেলাম মহিলার হাতে বুড়ো আঙুল ছাড়া আর কোনও আঙুলই নেই। সবগুলো আঙুল কাটা।

মূলঃ রোল্ড ডাহ্ল
রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

ধরা!

বাচ্চাদের একেবারেই সহ্য হয় না আমার! পাঠক, ভ্রূ কুঁচকালেন? পছন্দ হলো না কথাটা? তা না হোক, জানবাজি রেখে বলতে পারি, আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও এমনটা ভাবতে বাধ্য হতেন। এখন হয়তো বুঝছেন না–কারণ আমার মত আপনাকে তো আর গায়ে কয়েদীর ডোরাকাটা পোশাক চড়াতে হয়নি!

অবাক হচ্ছেন?

ধাঁধা লাগছে?

তা হলে ভাঙি বরং!

এমন না যে জ্ঞান হবার পর থেকেই পিচ্চি-পাচ্চাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলাম আমি। কিন্তু সে রাতে লেফটেন্যান্ট র‍্যানডেলের সাথে সাক্ষাতের পর থেকেই শিশুদের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি পাল্টে গেল।

ট্যাসোর বারে বসেছিলাম সেদিন। সাথে স্যালি অ্যান। আমার সর্বশেষ অঙ্কশায়িনী। মার্টিনির স্বাদ নিচ্ছিলাম দু'জনেই–এমন সময়ই লোকটার উপস্থিতি ধরা পড়ল আমার চোখের কোণে।

অবশ্যই আগে থেকে চেনাজানা ছিল না আমাদের। পরনে গাঢ় নীল রঙের সুট, স্ট্রাইপড্ টাই; ভেতরে সাদা শার্ট। চেহারায় ভাল মানুষের ছাপ সুস্পষ্ট। দয়ালু, বুঝদার; কার বাপের সাধ্যি, দেখে বলবে ব্যাটা পুলিশের লোক!

সোজা আঁমাদের টেবিলের সামনে হাজির হলো সে। চোখে চোখ পড়া মাত্র একেবারে আমার নাম ধরে জিজ্ঞেস করল, 'মি. অ্যান্ড্রু কারমাইকেল, ঠিক বলিনি?'

নিঃসন্দেহে বিনয়ী কণ্ঠস্বর। এরই মাঝে পকেট থেকে নিজের পুলিশি পরিচয়পত্র বের করে আমার চোখের সামনে মেলে ধরল সে।

কিছু না ভেবেই উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ।'

ভদ্রভাবে নড্ করল লোকটা। তার হলদে রঙের চোখজোড়ায় রাজ্যের ভালমানুষী।

'ভালই হলো, আপনাকে পেয়ে গেলাম এখানে,' বলল সে। 'যদি আপনাকে অনুরোধ করি, আমার সাথে একটু বাইরে যাবার জন্যে–জরুরি কিছু আলাপ ছিল–আপনি মাইণ্ড করবেন?'

মাইণ্ড করব না? তা-ও এই পরিস্থিতিতে? যেখানে হাতের মার্টিনির অর্ধেকও শেষ হয়নি, আমার অন্য হাতটা তখনও টেবিলের নীচে স্যালি অ্যানের নধর উরুতে আয়েশে আকুলিবিকুলি করছিল–এহেন অবস্থায় আহাম্মকটা জিজ্ঞেস করে, মাইণ্ড করব কি না।

'এখনই?' প্রশ্নটা করতে গিয়ে নিজের কণ্ঠ নিজের কানেই বেসুরো ঠেকল। একটু কেশে গলার ভেতরটা সাইজ করে নিলাম।

'এখন গেলেই ভাল হয়।' স্যালি অ্যানের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'ম্যাডাম, নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না?'

মেয়েটা নড়েচড়ে বসল। ওর উরুর ওপর থেকে খসে পড়ল আমার হাতটা। 'মনে করাকরির কী আছে?' নির্লিপ্ত সুরে বলল সে। 'যদি কোনও অপকর্ম সে করেই থাকে...তবে আমি কিন্তু কোনওরকম সাতে-পাঁচে নেই। মাত্র পনেরো মিনিটের পরিচয় আমাদের। উনি ড্রিঙ্ক অফার করলেন, আমিও না করলাম না–এই-ই আরকী!'

মুখটা চোঙা হয়ে গেল আমার। শালী ঘোড়ামুখী! বারোভাতারি! তোর শরীরের কোন্ চিপায় কয়টা দাগ আছে সব মুখস্থ ঝেড়ে দিতে পারি...এতসব দাগ আবিষ্কার করতেও তো কম ডলার খসেনি আমার পকেট থেকে, আর এখন মাগীর দেমাক দেখ! পনেরো মিনিটের পরিচয়! হাহ্...একেই বলে কপাল–পুলিশের ছায়া দেখলে রোমান্সও ড্রাই-আইস হয়ে পড়ে!

র‍্যানডেল বলল, 'ইচ্ছে করলে হাতের ড্রিঙ্কটা শেষ করতে পারেন আপনি।'

আর ড্রিঙ্ক! কোনওমতে উঠে দাঁড়ালাম আমি। বললাম, 'তার আর দরকার নেই, আমি প্রস্তুত। কিন্তু কী নিয়ে কথা বলবেন সে সম্পর্কে একটু ধারণা দেবেন?'

হাসল র‍্যানডেল। স্বর্গীয়, দেবসুলভ হাসি; যদিও তা হলুদ চোখজোড়া ছুঁলো না। আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে এল সে। 'কিছুই গোপন করব না,' বলেই হাঁটা দিল, অগত্যা পাশাপাশি আমিও। বাইরেই পার্ক করা ছিল পুলিশের ভ্যানটা। র‍্যানডেল স্বয়ং পিছনের দরজা খুলে মেলে ধরল। পাশাপাশি বসলাম দু'জনে। দরজা বন্ধ করে নীরব ইশারায় ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়তে নির্দেশ দিল সে।

গাড়ি এগোতেই হঠাৎ সে বলে বসল, 'আপনার সাথে জাল টাকার ব্যাপার নিয়ে দুটো কথা বলতে চাই, মি. কারমাইকেল।'

'জাল টাকা! মানে কী এর? আর এ নিয়ে আমার সাথে আলাপের কী আছে? আমি এর কী-বা বুঝি?'

তা সে যাই হোক, স্বস্তির ভাবটুকু কিন্তু ঠিকই আমার শরীরময় বয়ে গেল। ব্যাপার যাই হোক না কেন, আমার জন্য ভয়াবহ কিছুই নয়–এখন আমি নিশ্চিত। র‍্যানডেলকে গোপন করে স্বস্তির নিঃশ্বাসটা ফেললাম আমি। আর যাই হোক, টাকা জাল করার অপরাধে সে আমাকে ফাঁসাতে পারবে না। ব্যাপার-

স্যাপার কিছু থাকলেও তা অন্য কোথাও। জীবনে একটা জাল টাকাও তৈরি করিনি–আর করবই বা কী, জাল লিখতে 'অন্তস্থ য' না 'বর্গীয় জ' লাগে তাই তো ছাই জানি না! এমনই টনটনে আমার সাধারণ জ্ঞান!

তা হলে কেন কেঁপে উঠেছিল আমার চোরের মন? নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে আপনাদের? অধৈর্য হবেন না, এক্ষুণি ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

যদি লেফটেনেন্ট বলত, 'সশস্ত্র ডাকাতি'–তা হলে খবর হয়ে গিয়েছিল আমার। আঁতকে উঠলেন? এখনও তো শেষ করিনি। ডাকাতি–তা-ও বাসাবাড়িতে নয়, একেবারে ব্যাংক-ডাকাতি! হ্যাঁ, সশস্ত্র ব্যাংক-ডাকাতি। তা-ও একটা দুটো নয়–এ পর্যন্ত কম করেও আঠারোবার এই কীর্তি করেছি আমি। এবং এখনও অক্ষতই রয়ে গেছি। ধরা তো পড়িইনি, এমনকী সন্দেহের নিঃশ্বাসটুকুও ঘাড়ের ওপর ফেলতে দিইনি। এমনই কারিশমেটিক আমি!

আমার শতভাগ সাফল্য নিয়ে আমি গর্বিত। ব্যাংক-ডাকাতি তো আর ছেলের হাতের মোয়া না যে গেলাম আর মাল হাতে নিয়ে বের হয়ে এলাম। এজন্য প্রয়োজন যত্নশীল পরিকল্পনা, সাহস, নিপুণ বুদ্ধিমত্তা, সময়জ্ঞান–সব মিলিয়েই নিখুঁত এক সিস্টেম আমাকে তৈরি করে নিতে হয়েছে। শুনতে সহজ মনে হলেও বাস্তবে মোটেও তা অত সহজ নয়–বিশেষ করে বিষয়টা যখন সশস্ত্র ব্যাংক-ডাকাতি। আপনাকে তখন নিরাপত্তা, লুকানো অ্যালার্ম, ক্যামেরা–এসবই কঠিনভাবে বিবেচনায় আনতে হবে। আরও আছে। ঠিক কখন, কোন্ সময়ে হানা দিতে হবে, অসংখ্য কর্মচারীর মাঝ থেকে কাকে টার্গেট করব, আর সবচেয়ে বড় যে বিষয়–কী পরিমাণ টাকা আমি সরাব?

হ্যাঁ, এটা খুবই জরুরি, অন্তত আমার সিস্টেমে। অতি লোভে তাঁতী নষ্ট বলে কথা আছে না! তাই কোনও

অ্যাসাইনমেন্টেই বড়সড় দাঁও মারতে যাই না আমি। একজন নিঃসঙ্গ ব্যাংক-কর্মচারীর দেরাজে যতটুকু থাকে–ব্যস, এটুকুই। নট্ এ সিঙ্গেল পেনি মোর! কাজও সারি দ্রুত এবং ঝটপট। ব্যাংক-কর্তৃপক্ষ কিংবা ইনসুরেন্স কোম্পানিগুলোও ব্যাপারটা চেপে যায়। কত টাকা হারিয়েছে? কয়েকশো ডলার? হাজার? দুই হাজার? চেপে যাও, চার্লি! কেবল সন্ধ্যায় বাসায় যাবার আগে ভালভাবে খেয়াল রেখ–মোটা টাকা ভরা ভল্টের দরজাটা টাইটমত আটকেছ কি না...

কী বুঝলেন?

কিছুই না!

আরে ভাই, শান্ত পুকুরে ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়ুন, হালকা একটা কম্পন তৈরি হবে মাত্র। কিন্তু একটা দুই টনী বোল্ডার ছুঁড়েই দেখুন না, মাথার ওপর নরক ভেঙে পড়বে একেবারে।

তো এভাবেই আড়ে আড়ে কাজ সারি আমি। দারুণ, তাই না? অন্তত আমি তো তাই-ই ভাবি। এ জন্যেই গত দু'বছর ধরে পত্রিকার লোকেরা আমাকে 'ছায়াশত্রু' নামে ডেকে আসছে। আমাকে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে বলে সমানে পুলিশের চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করে আসছে তারা। কিন্তু বিধি বাম, আমি যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। ওই যে, গুণীজনেরা বলেন–অতি লোভ কোরো না। তাই এখনও অক্ষত এই আমি। সামান্য যা আয় হয়, তা দিয়েই মার্টিনি আর স্যালি অ্যানদের নিয়ে দিব্যিই আছি বলব।

এখন তো বুঝলেন, র‍্যানডেল 'জাল টাকা' বলাতে কেন এত ফুরফুরে লাগছে নিজেকে? তাই নিশ্চিন্ত মনেই পুলিশ হেডকোয়ার্টারে এসে র‍্যানডেলের পিছু নিয়ে তার অফিসে প্রবেশ করলাম। আমার বিবেক তো অল ক্লিয়ার, তবে ভাবনা কীসের? একটা চেয়ার টেনে আয়েশে হেলান দিয়ে বসলাম তাতে। অপেক্ষা করছি–কখন জনাব সেন্টার কিক করেন।

আমাকে সিগারেট সাধল সে, আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করায় নিজেই ধরাল। ফুঁ দিয়ে কাঠিটা নিভিয়ে পাশের ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিল র‍্যানডেল। এরপর নিজেও চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে হেলান দিয়ে বসল।

'সহযোগিতা করার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল সে। 'বিশ্বাস করুন, আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। 'আমি আপনাকে সহযোগিতা করছি নাকি আপনি আমাকে গ্রেফতার করে এনেছেন? ঠিক করে বলুন তো, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী, লেফটেনেণ্ট?'

লোকটা নির্ভেজাল শক্ খেল যেন। 'গ্রেফতার? অভিযোগ? তা হলে সত্যি সত্যিই দেখছি আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন...'

'আপনি বলেছিলেন, জাল টাকা না কী নিয়ে আমার সাথে আলাপ করবেন?'

'নিশ্চয়ই।' নাকে-মুখে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল সে। 'তাই করব আমি।' একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সে। 'আজ সন্ধ্যায় ট্যাসোর বার থেকে কল আসে একটা। ওরা অভিযোগ করে যে, ওদের ক্যাশের ভেতরে একটা জাল টাকার নোট পাওয়া গেছে। সম্ভবত কোনও খদ্দের বিল মেটানোর ফাঁকে ওটা গছিয়ে দিয়েছে। তদন্তের খাতিরে আমিও ছুটে যাই সেখানে। তো এই হলো কাহিনি।'

'এর সাথে আমার কী সম্পর্ক?' শিয়ালের বাচ্চাটার কথা শুনতে শুনতে মেজাজ খিঁচড়ে উঠেছে এতক্ষণে।

'আপনি ছিলেন ওখানে, তাই না?' যেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে এমনি তার ভাবসাব। 'বান্ধবীকে নিয়ে বারটেণ্ডারের খুব কাছাকাছি বসেছিলেন।'

'হ্যাঁ, তো? আমার সময় নষ্ট করার এটাই কি একমাত্র কারণ?'

'আমি আপনার সময় নষ্ট করছি না!' হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল

লেফটেনেন্টের কণ্ঠ, পরক্ষণেই শান্ত সুরে আরম্ভ করল, 'আমি আপনাকে অনুরোধ করেছি...ভদ্রভাবে...যদি কিছু মনে না করেন তো চলুন আমার সঙ্গে—আর আপনিও সহযোগিতা করার মন-মানসিকতা নিয়ে চলে এলেন...কী বলবেন এটাকে? আমি বল প্রয়োগ করেছি? নাকি এটা আপনার স্বেচ্ছা সহযোগিতা?'

সাক্ষাৎ শয়তান! এর বেশি আর কী ভাবব? এর কাছে কি আর মনের কথা ভাগাভাগি করা যায়? হাল ছেড়ে বললাম, 'ঠিক আছে, না হয় সহযোগিতাই করছি...তবে সময়ক্ষেপণও বটে!'

'আপনি আমার মত ভাবছেন এতেই আমি খুশি, না হয় হলোই একটু সময়ক্ষেপণ,' র‍্যানডেল বলল। 'যাক গে, যেটা বলছিলাম...ট্যাসোর বারটেণ্ডার খুব জোর দিয়েই আপনার দিকে আঙুল তুলেছে। বলেছে, আপনিই সেই ব্যক্তি যে কি না ওই জাল নোটটা দিয়ে বিল পরিশোধ করেছেন।'

এবার আমার হতভম্ব হবার পালা। একই সাথে উদ্বেগও অনুভব করছি। স্যালি অ্যানের সাথে সন্ধ্যায় বারে কাটানো মুহূর্তগুলো মনে করার চেষ্টা করলাম এবার। পানীয়ের দাম বাবদ পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট ঠিকই দিয়েছিলাম বারটেণ্ডারকে। বহুল ব্যবহৃত নোংরা একটা নোট। কিন্তু তাই বলে জাল!...

'আমার কথা বলেছে সে?'

র‍্যানডেল মাথা ঝাঁকাল। 'তার বক্তব্য অনুসারে পঞ্চাশ ডলারের একটা নোটই আজ সন্ধ্যায় ক্যাশে জমা পড়েছে—জাল নোট।'

দ্রুত ভাবছি। বারটেণ্ডারের বক্তব্য সঠিক হলে নিঃসন্দেহে ওটা আমারই দেয়া। কী বলব এখন? স্বীকার যাব? বলব যে জানি না ওটা কীভাবে আমার হাতে এসেছিল...হয়তো জুয়ায়

জিতেছিলাম কিংবা অন্য কোনওভাবে...

এসবের কোনওটাই বললাম না, উল্টো ওভারস্মার্ট সাজতে গিয়ে ওভার মিসটেক করে বসলাম একটা। 'বারটেণ্ডারের ভুল হয়েছে, লেফটেনেণ্ট। আপনি আমার ব্যাকগ্রাউণ্ড চেক করে দেখুন। ম্যাগডোনাল্ড রেস্টুরেণ্টের মাঝারি আয়ের বাবুর্চি আমি। আর আমি খরচ করব পঞ্চাশ ডলার? আমার পেশার একজন লোক এতগুলো টাকা ফালতু খরচ করে বেড়াতে পারে? এরকম ক'জনকে চেনেন আপনি?'

'তা সত্যিই চিনি না,' ব্যাটা বিড়বিড় করল। 'কিন্তু লোকটা খুব নিশ্চিত হয়েই আপনার কথা বলেছে।'

'ব্যাটার মরা দাদা কবর থেকে উঠে এসে টাকাটা দিলেও তা সে মনে রাখতে পারত না—অন্তত আজ সন্ধ্যায়। কী রকম ভিড় ছিল সেখানে সে তো আপনি নিজ চোখেই দেখে এসেছেন। অর্ডার সামলানোর ফুরসৎ মেলে না, সে কীভাবে মনে করে বলবে কে কোন্ নোটটা দিয়ে দাম চুকিয়েছিল? বিষয়টা উদ্ভট নয় কি?'

র‍্যানডেল শ্রাগ করল। এমনি মুখের ভাব, যেন আমার দেয়া কুইনাইন বহু কষ্টে হজম করতে হচ্ছে তাকে। 'হতে পারে,' বলল সে। 'এ জন্যেই তো আপনাকে এখানে আসার জন্য অনুরোধ করেছিলাম।'

এবার আমার বিনয়ী সাজবার পালা। 'নিশ্চয়ই, লেফটেনেণ্ট। একেবারে ঠিক কাজটাই করেছেন আপনি। আমার মন খারাপ করার কিছু নেই। আপনি তদন্ত করে দেখতে পারেন। দু'দফা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়েছিলাম আমি। বিল হয়েছিল দশ ডলারের কাছাকাছি। ভাঙতিটা আর ফেরত নেইনি, বখশিশ দিয়েছিলাম!'

মনের সুখে চাপা মেরে গেলাম। পারলে ব্যাটা তদন্ত করে দেখুক! স্যালি অ্যানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনও ফায়দা হবে না। আমি কত টাকা পরিশোধ করেছি না করেছি এসবে লক্ষ

রাখার সময় কোথায় তার? আর এমনিতেও পেটে মাল পড়লে দুনিয়াদারির খবর থাকে না ওর—কেবল বারের দেয়ালে সাঁটা আয়নায় নিজের বিকট প্রতিবিম্বের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছাড়া!

বারকয়েক চোখ পিটপিট করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল র‍্যানডেল। বলল, 'বুঝলাম নোটটা তা হলে আপনি দেননি...এরপরেও কি একটা অনুরোধ রাখবেন, মি. কারমাইকেল?'

'অবশ্যই চেষ্টা করব।'

'আজ সন্ধ্যায় যারা ট্যাসোতে উপস্থিত ছিল, এদের ভেতরে আপনার যদি কেউ পরিচিত থেকে থাকে তার বা তাদের নাম ঠিকানা আমাকে দেবেন, প্লিজ। সেক্ষেত্রে নতুন করে তদন্ত আরম্ভ করতে সুবিধা হবে আমার।'

আশাভরা দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। আমি মাথা নাড়লাম। 'কেবল স্যালি অ্যানের কথাই বলতে পারি আমি, যদিও তার নামের শেষাংশটুকুও সে আমাকে জানায়নি। বোঝেনই তো কীভাবে এগোয় এসব? বারের এক কোনাতে একা বসে থাকে, কেউ এগিয়ে এসে ড্রিঙ্ক অফার করলে না করে না। প্রস্তাবটা মাটিতে পড়ার আগেই ঘ্যাট করে একেবারে কোলে চড়ে বসবে। আকণ্ঠ মদ গিলবে, সঙ্গ দেবে...আপনি বরং বারটেণ্ডারের সাথে নতুন করে কথা বলে দেখতে পারেন।'

ব্যাটা কি দীর্ঘশ্বাস ফেলার রোগে আক্রান্ত হলো নাকি?-ফোঁস শব্দে বাতাস ছেড়ে বলল, 'আমিও সেরকমই ভাবছিলাম।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। 'এবার তা হলে আমি যেতে পারি?'

সে হাত নেড়ে বলল, 'আমিই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। অন্তত এটুকু আমাকে আপনার জন্য করতে দিন।' ঘড়ি

দেখল সে। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফ্রি হব আমি, এ সময়টুকু একটু অপেক্ষা করুন।'

আর একটা মুহূর্তও আমি অপেক্ষা করতে চাই না এই নরকে, চাইছি এক্ষুণি ডেস্কের ওপারে বসা লোকটার সামনে থেকে লেজ তুলে ভোঁ দৌড় দিই। পালাতে চাই তার কপট ভদ্রতার অত্যাচার থেকে। এবং অবশ্যই ওই অপয়া বারেও আর ফিরতে চাই না আমি। বললাম, 'ধন্যবাদ, তার আর দরকার হবে না, আমি বরং একটা ট্যাক্সি ধরি...'

'প্লিজ, বসুন,' বাধা দিল সে। একটু যেন বদলে গেছে কণ্ঠস্বর। 'কী জানেন, মি. কারমাইকেল, আমি বোধহয় একটু বেশিই মাথা ঘামাচ্ছি ওই পঞ্চাশ ডলারের নোটটা নিয়ে...কেন যেন মনে হচ্ছে ওটা এমন একটা ভাইটাল সূত্র, যার ওপর নির্ভর করতে পারি...'

'নির্ভর করতে পারেন,' বাধা দেয়ার ব্যাপারে আমিও কম গেলাম না। 'কী ব্যাপারে?'

র‍্যানডেল নাটকীয় ঢঙে জবাব দিল, 'ছায়াশত্রুকে ধরার ব্যাপারে!'

বুঝছেনই তো, এবার আমার ভিরমি খাবার পালা। খেলামও। নিমেষে জমে গেলাম গোটা শরীরময়। আর সে-ও এমন জমাই জমলাম, যে ভয় হলো একটু নড়লেই বুঝি চিড় ধরবে কোনও হাড়ে। কোনওমতে বলতে পারলাম, 'ছায়াশত্রু! ওই ব্যাংক-ডাকাতটার কথা বলছেন? প্রায়ই পত্রিকায় খবর হয়?'

'ঠিক ধরেছেন।' আবার স্বাভাবিক কণ্ঠ। 'ধুরন্ধর এক লোক, যে কি না কম করেও আঠারোবার সাফল্যের সাথে নিজের ধান্দায় সক্ষম হয়েছে।'

সামলাচ্ছি নিজেকে। মুখের ভাব যথাসম্ভব সহজ করে হেলান দিয়ে বসলাম। কণ্ঠে কৌতূহল টেনে জিজ্ঞেস করলাম,

'বুঝলাম না, লেফটেনেন্ট...একটা জাল নোট কীভাবে আপনাকে ওই লোক পর্যন্ত পৌঁছে দেবে? অতি কল্পনা হয়ে যাচ্ছে না?'

সাথে সাথে কোনও জবাব এল না। এসব ক্ষেত্রে নাটকীয় বিরতি বিশাল ভূমিকা পালন করে আর র‍্যানডেলও ঠিক তাই করছে এখন। আধবোজা চোখে তাকিয়ে আছে সিলিঙের দিকে—জিভ বের করে ঠোঁট জোড়া চাটল একবার। আমিও ধৈর্যের প্রতিমূর্তি, সতর্কও বটে! কিছুতেই মনের অস্থিরতা যেন চোখে-মুখে উপচে না পড়ে!

অবশেষে মুখ খুলল সে, 'শিশুতোষ এক স্কিম—হ্যাঁ, যথার্থই শিশুতোষ! ভয় হচ্ছিল কাজ হবে কি না...কেন ভয় হবে না, বলুন? এ তো কোনও পুলিশের মাথা থেকে বের হয়নি, এক অ্যামেচারের আইডিয়া। সেই তো ব্যাংক-প্রেসিডেন্টকে চিঠি লিখে উপায়টা বাতলে দিয়েছে।'

আপাত ঠাণ্ডা আমি এখনও, যদিও মন্থর হয়ে আসছে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি।

'উদ্ভট আইডিয়াই বলব,' র‍্যানডেল বলে চলছে। 'প্রথম দিকে তো পাত্তা দিতেই মন চাইছিল না। কিন্তু কী করার ছিল, বলুন? পত্রিকাগুলো যেভাবে পুলিশের পেছনে লেগে রয়েছে...ভাবলাম দেখাই যাক না, কী হয়? আপনার আগ্রহ থাকলে ভেঙে বলতে পারি।'

'আমি আগ্রহী।' আর কীই বা বলি? তবে বলছিই যখন আরেকটু না হয় যোগ করা যাক। 'কেবল আমি কেন, শহরের কে তার ব্যাপারে আগ্রহী নয়, বলুন?'

'তা কি আর জানি না...সত্যি বলতে কী, ট্যাসোর বারে যে জাল টাকাটা আজ পাওয়া গেছে, আসলে ওটা ছিল ফাঁদ। ছায়াশত্রু ওই পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে মাত্র।'

আমার মেরুদণ্ড বেয়ে হিমবাহ বয়ে গেল।

'ফাঁদ!'

র‍্যানডেল মাথা ঝাঁকাল। 'আগে আপনাকে লোকটার কাজের ধরন বুঝতে হবে, পুলিশেরও সেটা বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল।'

'কী রকম?' উচিত ভেবেই রাখলাম প্রশ্নটা।

'তার একান্ত নিজস্ব কর্মপদ্ধতি, আরকী! উদাহরণ দিচ্ছি। প্রতিটি হোল্ড-আপের সময় গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে আনে সে। প্রায় ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে কথা বলে। একাকী কাজ সারে, কোনও সাথী রাখে না। প্রতিবারই ভিন্ন ভিন্ন ছদ্মবেশের আশ্রয় নেয়। বেশি দাঁও মারে না। প্রতিটি ডাকাতির সময় কেবল একটা মাত্র ড্রয়ারে থাবা দেয় সে। সচরাচর শহরের অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি এলাকার কোনও ব্যাংককে টার্গেট করে সে। হানা দেয় সন্তর্পণে–তা-ও ঠিক দুপুর বেলায়। ভেঙে ভেঙে পাওয়া এসব সূত্র জোড়া লাগিয়ে পুলিশ তার কাজের প্যাটার্ন সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে নেয়। লোকটার এ নাগাদ হানা দেয়া ব্যাংকগুলোর লোকেশন পর্যবেক্ষণ করে তার সম্ভাব্য পরবর্তী হামলার লক্ষ্যগুলোও চিহ্নিত করে পুলিশ।'

'আচ্ছা!' কখন যে আক্ষরিক অর্থেই কৌতূহলী হয়ে পড়েছিলাম, জানি না। মন্ত্রমুগ্ধের মত গিলছিলাম তার কথাগুলো। 'কিন্তু জাল নোটের ব্যাপারটা?'

'আসছি সে প্রসঙ্গে, একটু ধৈর্য ধরুন। যা বলছিলাম, তার কাজের রেগুলার ধরনটা যখন একবার আমরা আন্দাজ করতে পারলাম, আমাদের পরবর্তী করণীয় বেশ সহজ হয়ে এল–বলতে পারেন তার থেকে এক ধাপ এগিয়ে গেলাম আমরা। আন্দাজ করে নিলাম এরপরে কোন্ কোন্ ব্যাংকে হিট করতে পারে সে। সবগুলোতে ঢুঁ মারলাম। চিহ্নিত করার চেষ্টা করলাম কোন্ মহিলা স্টাফকে টার্গেট করতে পারে সে–যাকে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে ড্রয়ার খুলে টাকা হাতিয়ে নেবে।'

'ছেলেমানুষি শোনাচ্ছে,' আমি মন্তব্য করলাম।

'হয়তো, তবে এসবই তার কাজের ধারা। সবসময়ই মহিলা স্টাফদেরকে সে টার্গেট করে–পুরুষদের নয়। তবে পছন্দ আছে বটে তার! সবচেয়ে সুন্দরী কর্মচারীকে বেছে নিতে ভুল করে না সে। স্বভাবতই এরা একটু বেশিমাত্রায় দুর্বলচিত্তের হয় কি না...'

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছি আমি। ফরফর করে আমার গোপন কথাগুলো বলে যাচ্ছে সে, যেন ওগুলো আমার নয়, ওই বানচোতটার মাথা থেকেই গজিয়েছিল।

একটু মুচকি হেসে র‍্যানডেল আরম্ভ করল আবার, 'ছায়াশত্রু বা যা-ই হোক না কেন তার নাম, লোকটা সম্ভবত একটা সাইকো। ভীত সন্ত্রস্ত সুন্দরী কর্মচারী–যে কি না তার কলিগদের থেকে একটু তফাতেই বসে–পিস্তল দেখিয়ে তার ড্রয়ার খালি করে দেয় সে। তাকে ধরার জন্য তার এই বিশেষ গুণটাকেই আমরা ভিত্তি হিসাবে নিই। ফাঁদ পাতি জাল টাকা দিয়ে।'

'কী রকম?'

'ওই যে বললাম, তার পরবর্তী সম্ভাব্য হামলার ব্যাংকগুলোর একটা তালিকা তৈরি করি আমরা। এগুলোর সবচেয়ে আকর্ষণীয়া স্টাফকে টোপ হিসেবে কাজে লাগাই। ওই নির্দিষ্ট তরুণীদের প্রত্যেকের ডেস্কের দেরাজে আসল টাকার সাথে জাল টাকা ভরে দিই। সবই পঞ্চাশ ডলারের নোট। মেয়েগুলোকে সতর্ক করে দেয়া হয়, যেন কোনওভাবেই ওই জাল নোটগুলো ক্লায়েন্টদের হাতে না পড়ে–কেবল ছায়া শত্রু ছাড়া। যদি কোন নির্জন দুপুরে পেছনের জানালায় দেখা দেয় সে, অস্ত্র বাগিয়ে নির্দেশ দেয় ড্রয়ার খালি করার জন্য–আসল-নকল সব নোটই যেন তার হাতে গছিয়ে দেয় ওরা, কোনওরকম দ্বিধা না করে...কিছু বুঝলেন, মি. কারমাইকেল?'

'বুঝেছি,' গলা শুকিয়ে বললাম আমি। 'এরপর প্রতিটি বারে, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর কিংবা শপিং মলে জাল নোটগুলোর নম্বর

পাঠিয়ে দিলেন। একই সাথে নির্দেশ দিয়ে রাখলেন ওইসব নম্বরের কোনও নোট হাতে এলে ওরা যেন সরবরাহকারীকে শনাক্ত করে রাখে এবং তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশে খবর দেয়। ঠিক বলিনি?'

'একদম ঠিক।'

আমি কোনওরকম হাসি হাসি মুখে বললাম, 'আর তাই ট্যাসোর বারটেণ্ডার ওরকম একটা জাল নোট পাওয়া মাত্র আপনাদের খবর দিল।'

'জী। খবরটা পেয়েই বুঝলাম ছায়াশত্রুকে হাতের মুঠোতে ভরা এখন কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র। বারটেণ্ডারের দেয়া নোটের নম্বরটা মিলিয়ে দেখেছি আমরা। ন্যাশনাল ব্যাংকের সাউথ ইস্ট শাখাতে প্ল্যান্ট' করা হয়েছিল ওটা...ইনফ্যাক্ট, জাল নোট ছিল মোট দুটো। তার একটা বারটেণ্ডারের মাধ্যমে আমাদের হাতে ফেরত এসেছে।'

আমার গা গুলোচ্ছে, বমি পাচ্ছে...পঞ্চাশ ডলারের দুটো জাল নোট! একটা যদি বারটেণ্ডারকে দিয়ে থাকি তা হলে অন্যটা এ মুহূর্তে কোথায়? আমার পার্সের ভেতরে, নাকি আমার রুমের আলমারিতে? ভাগা দরকার! এক্ষুণি কেটে পড়া উচিত এখান থেকে। পার্সটা চেক করতে হবে, না পেলে রুমে গিয়ে আলমারি ঘাঁটব। মোটকথা, যত জলদি সম্ভব খুঁজে বের করতে হবে আপদটাকে। পুড়িয়ে ফ্যাল্! ধূলিসাৎ কর্ ওটাকে! মস্তিষ্ক ক্রমাগত নির্দেশ পাঠাচ্ছে আমাকে। এরপর লেজ তুলে পালা এই পোড়ার শহর থেকে...

র‍্যানডেলের টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কিছুক্ষণ অন্যপ্রান্তের কথা শুনে গেল সে, নিজের মুখ আর ফুটাল না—কেবল বারকয়েক মাথা দোলাল। কথা শেষে রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে দিয়েই বলে উঠল সে, 'আপনি কট, মি. কারমাইকেল! ধরা খেয়েছেন শেষ পর্যন্ত।'

'কী খেয়েছি?' আকস্মিক আক্রমণে অবশিষ্ট আক্কেলটুকুও গুঁড়িয়ে গেল আমার, প্রশ্নটা নিজের অজান্তেই করে বসলাম।

লোকটার কপটতার কি শেষ নেই? সুন্দর ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল, 'আমার লোকেরা ইতোমধ্যেই আপনার রুমে তল্লাশি চালিয়েছে। ট্যাসোর বারটেণ্ডার যে সঠিক লোকটার দিকেই আঙুল তুলেছে, এ ব্যাপারে এখন আমরা নিশ্চিত।'

ঈশ্বর, মা মেরি, যিশু...কে কোথায় আছ, বাঁচাও! আমি আর বাইতে পারি না...

'আমার রুমে সার্চ করেছে ওরা!' রীতিমত আর্তনাদ করে উঠলাম এবার।

'সবই নিয়ম ধরে,' র‍্যানডেল বলল। 'সাথে সার্চ ওয়ারেণ্ট ছিল। আসলে এক মাস আগেই ওটা তৈরি করে রাখি আমরা–বাকি ছিল কেবল ফাঁকা জায়গায় আপনার নামটা বসানো!' কেশে গলাটা আবার পরিষ্কার করে নিল সে। 'বারটেণ্ডার আপনাকে নামে চেনে–কারণ প্রায়ই যাতায়াত ছিল আপনার ওখানে। তার মুখ থেকে নামটা শোনামাত্র দেরি না করে সার্চ ওয়ারেণ্টের ফাঁকা জায়গাটাতে সুন্দর করে বসিয়ে দিলাম আমি স্বয়ং। আপনার ডেরার ঠিকানা পেতে সাকুল্যে পাঁচ মিনিটও লাগেনি, তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ পাঠিয়ে দিলাম সেখানে। আর নিজে রওনা হলাম ট্যাসোর উদ্দেশে।'

আমি প্রলাপ বকা আরম্ভ করলাম, 'আপনি বলেছেন আমাকে অ্যারেস্ট করা হয়নি! কোনওরকম অভিযোগও নেই আমার বিরুদ্ধে...'

'তখন ছিল না, এখন আছে। এ মুহূর্তে আপনাকে গ্রেফতার করা হলো, মি. কারমাইকেল।'

প্রায় মরিয়া হয়ে বললাম, 'আপনি মিথ্যে বলে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন, লেফটেনেণ্ট। আমার উকিলের সাথেও পরামর্শ করার সুযোগ দেননি। তার অনুপস্থিতিতেই আমাকে

জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, ক্ষুণ্ন করেছেন আমার আইনগত অধিকার...'

র‍্যানডেল আবারও চোখ বুজল।

'আমার মনে পড়ছে না এরকম কিছু আমি করেছি কি না।' চোখ মেলে তাকাল সে।

'হ্যাঁ, করেছেন। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন আপনি। অভিযুক্ত করেছেন। সুচতুরভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন—আমার মুখ থেকে যাতে স্বীকারোক্তি বের হয়।'

'ছি ছি, কী বলছেন এসব!' একটানে ডেস্কের ড্রয়ার খুলে ভেতর থেকে একটা মিনি টেপরেকর্ডার বের করল সে। বলল, 'এটা অন্তত নিশ্চিত করবে যে অধিকাংশ প্রশ্নই আপনার মুখ থেকে বেরিয়েছে—আমি কেবল উত্তর দিয়ে গেছি। অর্থাৎ স্বীকারোক্তি যদি কেউ দিয়ে থাকে, সেটা আমিই দিয়েছি। আপনি নন। বিশেষত ছায়াশত্রুকে ফাঁদে ফেলার পর্বটুকু যে কেউ শুনলে এই ধারণাই করবে।'

এবার অন্য পথ ধরলাম আমি। 'আপনি কৌশলে আমাকে এখানে এনেছেন, আর সেই ফাঁকে আপনার লোকেরা আমার রুম সার্চ করেছে...'

'এটা স্বীকার করছি,' বলল বিনয়ের অবতার। 'আর আপনার কি জানতে ইচ্ছে করে না, আপনার ঘরে ওরা কীসব মূল্যবান সামগ্রী আবিষ্কার করেছে?' জবাবে চুপ করে রইলাম, কাজেই সে বলে চলল, 'বলছি, শুনুন। আইটেম এক: জাল পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট যার নম্বর আমরা আগেই টুকে রেখেছিলাম। আইটেম দুই: তিনজোড়া কন্ট্যাক্ট লেন্স, প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন রঙের। আইটেম তিন: তিনটি পরচুলা, তিন সেট ভ্রু আর গোঁফ-দাড়ি; ম্যাচিং কালার। আইটেম চার: একটা পেটমোটা ফাইল—পত্রিকার কাটিং-এ ভরা। সব ক'টাতেই ছায়াশত্রুর দ্বারা সংঘটিত ব্যাংক-ডাকাতির বর্ণনা ছাপা হয়েছে।' দুঃখী দুঃখী চেহারা বানিয়ে

আমাকে দেখছে সে এখন। 'আর কিছু বলার দরকার পড়ে, মি. কারমাইকেল?'

বিমর্ষ বদনে মাথা নাড়লাম আমি।

'এখন আপনি আপনার উকিলকে ডাকতে পারেন,' র‍্যানডেল বলল। 'এখন আমি আপনার বিরুদ্ধে একাধিক সশস্ত্র ব্যাংক-ডাকাতির অভিযোগ আনছি। আগামী দিনগুলো আপনার যাতে চোদ্দশিকের ভেতরে কাটে, সেজন্য যা কিছু করার সবই করব আমি। এতটুকু কার্পণ্য করব না।'

করবে যে না এতে আমারও বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ নেই। বললাম, 'সত্যিই আপনি স্মার্ট, লেফটেনেন্ট। স্বীকার করছি, দারুণ একটা ফাঁদ পেতেছিলেন।'

'আগেই বলেছি ফন্দিটা আমাদের কারও মাথা থেকে বের হয়নি।' ড্রয়ারের ভেতরে হাত চালিয়ে ছোট্ট একটুকরো কাগজ বের করে আনল সে। ওটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

'এর ভেতরেই সব রহস্যের সমাধান পাবেন...পড়েই দেখুন না।'

অচেতন ভাবে নিভাঁজ কাগজের টুকরো হাতে নিলাম আমি। কাঁচা হাতের পেনসিলে লেখা। মাত্র অল্প ক'টা লাইন। আমাকে ল্যাং মারার জন্যে যথেষ্ট!

'মাননীয় ব্যাংক প্রেসিডেন্ট সাহেব,

ছায়া শত্রুকে ধরতে চান? তাকে বুদ্ধু বানাতে হলে আসল টাকার সাথে কিছু জাল টাকাও রাখার ব্যবস্থা করুন। পরের বার ডাকাতি করতে এলে সবগুলো নোটই তার হাতে ধরিয়ে দিন। ধরা সে পড়বেই!'

শ্যাফিন রেমান, বয়স ১০।

পড়া শেষ করে ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে ফেললাম ওটা। র‍্যানডেল দেখছে আমাকে। এখনও নির্বিকার মুখ, ভাব বোঝা

যায় না। সহজ সুরে বলল, 'ছেলেটার নামে ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে প্রতি মাসে পাঁচ ডলার করে জমা হতে থাকবে সেখানে। দারুণ, তাই না?'

'সত্যি দারুণ!' স্বীকার না করে পারলাম না। মুখে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করছি। দাঁত কেলানো বোকা বোকা হাসি!

এরপরেও যদি বাচ্চাদের সহ্য না করতে পারি, দোষ দিতে পারবেন আমাকে?

মূলঃ জেমস হোল্ডিং

রূপান্তরঃ মাহবুবুর রহমান শিশির

সন্ধ্যা

হাইড পার্কের কোনার দিকের একটা বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসলেন নরমান গোর্টসবাই। সামনের রাস্তায় গাড়িঘোড়ার স্রোত চলছে। মার্চ মাস, সাড়ে ছয়টা বাজে, সন্ধ্যা নেমে আসছে। তবে পুরোপুরি আঁধার নামেনি, পার্কের বাতি আর চাঁদের আলোয় কিছুটা আলোকিত এদিকটা। পার্কের মধ্যে কয়েকজন লোক হাঁটাহাঁটি করছে, আর কয়েকজন লোক দূরের কোনও বেঞ্চে বসে আছে।

দৃশ্যটা খুশি করল গোর্টসবাইকে। তাঁর মতে, সন্ধ্যা হচ্ছে পরাজিত সময়। সারাদিনের জীবনযুদ্ধ শেষে নারীপুরুষ এসময় তাদের আসল চেহারা বের করে। তারা চায় না অপরিচিত মানুষ তাদের দিকে চেয়ে থাকুক। একটা ব্যক্তিগত ব্যর্থতা খোঁচাচ্ছে গোর্টসবাইকে।

গোর্টসবাইর পাশে বিষণ্ন মুখে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসেছিলেন। একটু পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন, মনে হলো বাড়ির পথ ধরলেন তিনি। প্রায় সাথে সাথেই বেঞ্চিতে এসে বসল এক তরুণ। পোশাক-আশাক খারাপ নয়, কিন্তু আগের লোকটার মতই মনমরা মুখ তার। সময়টা যে তার ভাল যাচ্ছে না, যেন এটা বোঝাতেই একটা অস্ফুট গালি দিয়ে, ধপাস করে বসল সে বেঞ্চে।

'মনে হচ্ছে, তোমার মন-মেজাজ ভাল নেই,' মন্তব্য করলেন নরমান। এত পরিচিত মানুষের মত ছেলেটা তাঁর

দিকে ফিরল যে সাথে সাথে সচকিত হয়ে উঠলেন তিনি।

'আমার জায়গায় হলে আপনার মেজাজও ভাল থাকত না,' বলল তরুণ। 'ভীষণ বোকার মত কাজ করে ফেলেছি আমি।'

'তাই?' নিরাসক্ত গলায় প্রশ্ন করলেন নরমান।

'আজ বিকেলেই শহরে এসেছি। বার্কশায়ার স্কোয়ারের পাটাগোনিয়ান হোটেলে উঠব বলে পরিকল্পনা আমার,' বলে চলল তরুণ। 'ওখানে গিয়ে দেখি, কয়েক সপ্তাহ আগেই হোটেলটা ভেঙে ফেলে একটা সিনেমা হল বানানো হয়েছে। ট্যাক্সি ড্রাইভারের পরামর্শে আরেকটু দূরের একটা হোটেলে উঠলাম আমি। হোটেল থেকে বাড়িতে চিঠি লিখলাম, নাম-ধাম-ঠিকানা দিয়ে। তারপর বের হলাম সাবান কিনতে। জিনিসটা সাথে আনতে ভুলে গিয়েছিলাম, আর হোটেলের সাবান ব্যবহার করতে পারি না আমি। সাবান কিনে একটু পথ হাঁটলাম। একটা বারেও ঢুকলাম। ফিরতে গিয়ে দেখি রাস্তা ভুলে গেছি। এমনকী হোটেলের কী নাম, সেটা কোন্ রাস্তায়, তা-ও মনে নেই। লণ্ডন শহরে যার কোনও বন্ধু-বান্ধব নেই তার জন্য এটা সাংঘাতিক ব্যাপার। অবশ্যই আমি বাড়িতে টেলিগ্রাফ করতে পারি, কিন্তু ওরা আমার চিঠি পাবে আগামীকাল। আর এই সময় আমার হাতে কোনও টাকা নেই। একটা শিলিংও নেই পকেটে। সাবান আর ড্রিঙ্ক কিনতে চলে গেছে সব। পকেটে আমার দু'পেন্স আছে, মনে হচ্ছে রাস্তায় কাটাতে হবে রাতটা।'

দীর্ঘ বিরতি নিল তরুণ। 'একটা প্রায় অবিশ্বাস্য গল্প বললাম আমি, তাই না?'

'না, ঠিক অবিশ্বাস্য নয়,' মেপে মেপে বললেন নরমান। 'আসলে একবার বিদেশে গিয়ে, ঠিক এরকম একটা ঘটনা আমার জীবনেও ঘটেছিল। দু'জন ছিলাম আমরা সেবার,

ব্যাপারটা আরও চমকপ্রদ সেজন্যে। সে যাই হোক, আমাদের মনে ছিল যে হোটেলটা একটা খালের পাড়ে। সোজা খাল ধরে যেতে যেতে, ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেলাম হোটেলটা।'

নড়েচড়ে উঠল তরুণ। 'বিদেশ হলে আমি এত বিপদে পড়তাম না,' বলল সে। 'সোজা দূতাবাসে গিয়ে রিপোর্ট করলেই প্রয়োজনীয় সাহায্য মিলত। কিন্তু নিজের দেশে, এরকম পরিস্থিতিতে সাহায্য করার কেউ নেই। কেউ যদি বিশ্বাস করে আমাকে কিছু টাকা ধার না দেয়, তবে আমাকে আজ নদীর ধারে বাঁধের ওপর শুয়ে কাটাতে হবে। তবে আমি কৃতজ্ঞ যে আপনি আমার কথা একেবারে আজগুবি বলে উড়িয়ে দিলেন না।'

শেষের কথাগুলো খুব জোরের সাথে বলল অচেনা তরুণ। যেন নরমান গোর্টসবাই তাকে সাহায্য করতে পারেন এমন আশা-ভরসা সে এখনও ছাড়তে পারেনি।

'অবশ্যই,' ধীরেধীরে বললেন নরমান। 'কিন্তু, তোমার গল্পের সবচেয়ে দুর্বল পয়েন্ট হচ্ছে তুমি কোনও সাবান আমাকে দেখাতে পারোনি।'

চমকে সোজা হয়ে বসল ছেলেটা। ওভারকোটের পকেটগুলো থাবড়াল সে দ্রুত হাতে। তারপর লাফ দিয়ে দাঁড়াল। 'মনে হয় ওটা হারিয়ে ফেলেছি আমি,' বিড়বিড় করল ও।

'এক বিকেলের মধ্যেই হোটেল আর সাবান হারিয়ে ফেলাটা ভীষণ অসাবধানতার লক্ষণ,' মন্তব্য করলেন নরমান। কিন্তু তার আগেই হাঁটা দিয়েছে ছেলেটা পথ ধরে। মাথাটা উঁচু করে রেখেছে সে, যেন অপমানিত হয়েছে সে এ কথায়, তবে গায়ে মাখছে না অপমান।

'দুঃখজনক,' আপন মনে বললেন নরমান। 'ওর গল্পের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য অংশ ছিল সাবানটা। সেখানেই গড়বড়

করল ও। ও যদি বুদ্ধি করে একটা সাবান ভালমত মোড়কে জড়িয়ে সাথে রাখত তা হলে অনেক ভাল করত। এ লাইনের মানুষকে সবসময়ই হুঁশিয়ার হয়ে পথ চলতে হবে।'

বেঞ্চ থেকে উঠে পড়লেন নরমান, এমন সময় বিস্ময়সূচক একটা শব্দ বেরিয়ে এল তাঁর মুখ থেকে। বেঞ্চের ধারে একটা ডিম্বাকৃতির প্যাকেট পড়ে আছে। কোনও কেমিস্টের দোকান থেকে প্যাক করা একটা সাবান। ওভারকোটটা যখন জোরের সাথে আছড়ে ফেলেছিল বেঞ্চিতে তখনই পড়ে গেছে ওটা, কোনও সন্দেহ নেই। ওটা হাতে নিয়ে, ছায়াঢাকা পথ ধরে নরমান ছুটলেন একটু আগের স্বল্প পরিচিত তরুণের উদ্দেশে।

আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, এমন সময় দেখলেন রাস্তার মোড়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে। পার্ক পেরিয়ে যাবে, নাকি নাইট্সব্রিজের পথ ধরবে, তাই ভাবছে সে নিশ্চয়ই। চমকে ফিরল সে ডাক শুনে। নরমানকে দেখে চেহারায় স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ ফুটল।

'তোমার গল্পের সত্যতা পাওয়া গেছে,' বলে সাবানের প্যাকেটটা তুলে দেখালেন নরমান গোর্টসবাই। 'নিশ্চয়ই তোমার ওভারকোটের পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল জিনিসটা। বেঞ্চের পাশেই পড়ে থাকতে দেখি সাবানটাকে। মনে হয় এক গিনিতে আপাতত চলে যাবে তোমার। কী বলো? আর সাথে নাও আমার কার্ড।'

কয়েনটা দ্রুত পকেটস্থ করে কয়েকটা ধন্যবাদসূচক কথা বলে নাইট্সব্রিজের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। সেদিকে তাকিয়ে আপন মনে বললেন নরমান, 'বেচারা, একেবারেই দেউলিয়া। ভবিষ্যতে মানুষের কথায় আরেকটু আস্থা রাখব আমি।'

ফিরতি পথে পার্কের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চললেন নরমান। যে

বেঞ্চে বসেছিলেন সেটার আশপাশে, ওপর-নীচে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটা কিছু খুঁজে দেখছেন। চিনতে পারলেন লোকটাকে নরমান, বিকেলের সেই ভদ্রলোক। 'কিছু হারিয়েছেন বুঝি আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, স্যর। একটা সাবানের চাকা হারিয়েছি আমি এখানে।'

মূলঃ সাকি

রূপান্তরঃ আবদুল্লাহ মুহিউদ্দিন তানিম

বিচ্ছেদ

মহিলা কোনও ব্যথা অনুভব না করেই মারা গেছেন। তাঁর নিথর দেহ বিছানার ওপর পড়ে আছে। দু'চোখ বন্ধ। চেহারায় প্রশান্তির ছাপ। তাঁর মাথার লম্বা, সাদা চুলগুলো বিছানার ওপর এমনভাবে বিন্যস্ত হয়ে পড়ে আছে, দেখে মনে হয় মৃত্যুর মিনিট দশেক আগে তিনি এগুলো পরিপাটি করে আঁচড়েছেন। লাশ দেখে মনে হবে কোনও পবিত্র আত্মার বসবাস ছিল এই দেহে।

বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন মৃত মহিলার ছেলে। তিনি একজন বিচারক। ন্যায় বিচারের জন্য তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। তাঁর পাশেই মহিলার একমাত্র মেয়ে বসে কাঁদছে। তাকে সবাই সিস্টার ইউলালি বলে ডাকে। ছোটকাল থেকেই সে চার্চের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাঝে বড় হয়েছে।

ওদের বাবার সম্বন্ধে ওরা তো বলতে গেলে কিছুই জানে না। শুধু জানে, মাকে কখনও সুখ দিতে পারেনি বাবা।

মেয়েটা বার বার মায়ের এক হাতে চুমু খাচ্ছে। মহিলার অন্য হাতটি বিছানার চাদর খামচে ধরে আছে।

দরজায় টোকা দেয়ার শব্দ শুনে ভাই-বোন সেদিকে তাকাল। দেখল, ডিনার সেরে ফিরে এসেছেন প্রিস্ট। তাঁকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে। বুকে ক্রুশ এঁকে পেশাদারী ভঙ্গিতে বললেন, 'মাই পুওর চিলড্রেন, এই দুঃখের সময় আমি তোমাদের সাথে থাকতে চাই।'

সিস্টার ইউলালি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ধন্যবাদ, ফাদার।

কিন্তু আমরা মায়ের সাথে থাকতে চাই একান্তে। তাঁকে দেখার এই শেষ সুযোগ। যখন ছোট ছিলাম, তখন আমরা একসাথে ছিলাম। আর এখন...' প্রচণ্ড দুঃখে তার চোখ থেকে পানি পড়তে লাগল। কথা শেষ করতে পারল না।

তার কথা শুনে প্রিস্ট বাউ করে বললেন, 'তোমাদের যেমন ইচ্ছা, বাছা।' তিনি বিছানার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে বুকে ক্রুশ আঁকলেন। তারপর প্রার্থনা করে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'উনি খুব ভাল মানুষ ছিলেন।'

ঘরের এক কোনায় রাখা ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বাইরে থেকে আসা বাতাসে খড় আর কাঠের মিষ্টি গন্ধ। চাঁদের নরম আলো জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে। ব্যাঙের ডাক আর ঝিঁঝি পোকার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

মনে হচ্ছে এক নীরব প্রশান্তি মৃত মহিলাকে ঘিরে রেখেছে।

দু'ভাই-বোন মৃতদেহের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে উচ্চস্বরে অঝোরে কাঁদছে। আস্তে আস্তে তাদের কান্নার শব্দ কমে এল। উভয়েই এখন ফোঁপাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দু'জনে উঠে দাঁড়িয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পুরানো স্মৃতিগুলো বার বার ওদের মনে পড়ে যাচ্ছে। যেসব স্মৃতি একদিন আগেও খুব সুখের ছিল, আজ সেগুলো শুধুই বেদনার। মা-র প্রতিটা কথা, হাসি, মনে পড়ছে। জীবনের প্রতি পদে পদে কীভাবে চলতে হবে, মা সবসময় ওদের গুরুত্ব দিয়ে শেখাত। মাকে ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কাউকে ওরা বেশি ভালবাসেনি। মা-ই ছিল ওদের সব। আর এখন...! এই বিশাল পৃথিবীতে ওরা নিঃস্ব, অসহায়, এতিম!

সন্ন্যাসিনী বোন তার ভাইকে বলল, 'তোমার মনে আছে, মা সবসময় নিজের পুরানো চিঠিগুলো পড়ত। ওগুলো ড্রয়ারে আছে। চলো ওগুলো পড়ি। চিঠিগুলোতে নিশ্চয়ই আমাদের দাদা-দাদীর কথা লেখা আছে। ওঁদের তো আমরা দেখিনি। তবে চিঠি পড়ে

হয়তো ওঁদের কথা জানতে পারব। মনে পড়ে, ওঁদের কথা মা প্রায়ই বলতেন?'

ড্রয়ারে ওরা দশটা ছোট প্যাকেট পেল। প্যাকেটগুলো বহু ব্যবহারে মলিন হয়ে গেছে। তবে সাবধানে বাঁধা, একটার পর একটা সুন্দর করে সাজানো। চিঠিগুলো ওরা বিছানার উপর রাখল। একটার ওপর 'বাবা' লেখা দেখে তুলে নিয়ে খুলে পড়তে লাগল।

হাতের লেখার ধরনটা পুরানো ধাঁচের। প্রথম চিঠির শুরুতে লেখা 'প্রিয় আমার'। দ্বিতীয়টায় লেখা 'আমার ছোট্ট সুন্দর মামণি'। পরেরটায় লেখা 'আমার প্রিয় মামণি'। হঠাৎ ইউলালি জোরে জোরে পড়তে লাগল। চিঠির মধ্যে তার মা-র ছোটবেলার কথা লেখা। তার ভাই বিছানার পাশে বসে মায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চিঠির কথাগুলো শুনতে লাগল।

ইউলালি পড়া থামিয়ে হঠাৎ বলল, 'পড়া শেষ হলে চিঠিগুলো মা-র কবরে দিয়ে দেব।' সে আরেকটা প্যাকেট তুলল। এতে কোনও নাম নেই। মৃদু কণ্ঠে পড়তে লাগল, 'আমার ভালবাসা, তোমাকে আমি পাগলের মতো ভালবাসি। গতকাল থেকে আমাদের স্মৃতির কথা মনে করে আমি যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি। তোমার ঠোঁট দুটো আমি নিজের ঠোঁটে, তোমার চোখ দুটো নিজের চোখে আর তোমার বুক আমি নিজের বুকে অনুভব করছি। আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে ভালবাসি। আমাকে তুমি পাগল করেছ। আমার দু'হাত খোলা, তোমাকে জড়িয়ে ধরার জন্য আকুল হয়ে আছি। আমার দেহ-মন তোমাকে পাবার জন্য আকুল হয়ে আছে।

মহিলার ছেলে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। ইউলালি পড়া থামিয়ে দিয়েছে। বোনের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে নীচের স্বাক্ষরটা দেখল। ওখানে লেখা—'তোমার ভালবাসা, হেনরী'। কিন্তু ওদের বাবার নাম তো রেনে, তা হলে কি এটা ওদের বাবার লেখা নয়?

ছেলেটা চিঠির প্যাকেট থেকে আরেকটা চিঠি বের করে পড়তে লাগল। ওতে লেখা–'আমি তোমার আদর ছাড়া বাঁচতে পারব না।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কঠিন দৃষ্টিতে মা-র দিকে তাকাল ও। ইউলালি মূর্তির মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভাইয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ওর চোখের কোণায় জল টলমল করছে।

মহিলার ছেলে আস্তে করে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। বাইরের অন্ধকার রাতের দিকে তাকিয়ে রইল চুপচাপ।

যখন সে ঘুরে বোনের দিকে তাকাল, দেখল, তার চোখে পানি নেই। এখনও মাথা নিচু করে বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

সে দ্রুত চিঠিগুলো নিয়ে এলোমেলোভাবে ড্রয়ারে ছুঁড়ে ফেলল, তারপর বিছানার পর্দাটা টেনে দিল।

জানালা দিয়ে যখন দিনের প্রথম আলো ঘরে প্রবেশ করল তখন সে আর্মচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যে মায়ের জন্য কয়েক ঘণ্টা আগেও সে অঝোরে কেঁদেছে, যার স্মৃতি তাকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে, তার দিকে একবারও না তাকিয়ে আস্তে করে বলল, 'আমাদের এখন চলে যাওয়া উচিত, বোন।'

মূলঃ গী দ্য মোপাঁসা
রূপান্তরঃ তারক রায়

ছিনতাই

দরজাটা ছিল বাইরে থেকে তালামারা।

'স্টার অভ দ্য নর্থ' মহাকাশযানের ট্যুরিস্ট কেবিনে আটকা পড়ে আছে কাল্লি। লম্বামুখো স্টুয়ার্ডটা ওকে কোনও সুযোগই দেয়নি। কাল্লি আসলে বুঝতেই পারেনি ওকে এ ধরনের ফাঁদে ফেলা হবে। বেসিনের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসল সে। অবশ্য কেউ যদি এখন তার আশপাশে থাকত, এভাবে দাঁত বের করে হাসবার কথা সে চিন্তাও করত না। তার এই হাসির অর্থ অনেক কিছুই হতে পারে। তবে তার মন খুব কঠিন। এই মুহূর্তে নিজের সঙ্গে তামাশা ছাড়া এই হাসির আর কী অর্থ হতে পারে? বিছানার উপর বসল কাল্লি। পুরু বিছানার একপাশটা সাঁই করে উপরে উঠে গেল। দরজার হাতলটা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেল। দারুণ জিনিস বানিয়েছে বটে। কিন্তু এমন অসতর্ক সে হলো কীভাবে? নাকি টের পেয়ে গিয়েছিল ওরা? প্রথমেই ওকে চিনে ফেলেছিল?

'আমি দুঃখিত, স্যর,' কাল্লি যখন স্লাইডিং ডোর খুলে বিছানাটা অগোছাল দেখল, তখন স্টুয়ার্ডটা বলেছিল ওকে। 'আমি গুছিয়ে দিচ্ছি।'

'তাড়াহুড়োর দরকার নেই,' কাল্লি বলেছিল। 'আমি শুধু আমার কাপড়গুলো ঝুলিয়ে রাখতে চাই। অবশ্য সেটা পরেও করা যেতে পারে।'

'ওহ্, না, স্যর,' বলেছিল পাতলা, জেদি, লম্বামুখো লোকটা।

'ওভার ড্রাইভের আগেই যাত্রীদের মালপত্র ও বিছানা ঠিকঠাক করে দেয়া হয়।'

'ভাল কথা। কিন্তু করিডরে শুধু শুধু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। একটা ড্রিঙ্ক দাও আমাকে।'

'মাত্র কিছুক্ষণ, স্যর,' স্টুয়ার্ড বলেছিল। 'এখনি নতুন চাদর নিয়ে আসছি আমি। পরে বিছানায় হেলান দিয়ে আরাম করে ড্রিঙ্ক করবেন। এভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে আপাতত ভেতরে বসুন, স্যর। চাদর ছাড়া বিছানায় বসতে নিশ্চয় আপত্তি নেই? আমি এই এলাম বলে...'

'কিন্তু তাড়াতাড়ি...'

'সে আর বলতে!'

তখন বিছানায় গিয়ে বসেছিল কাল্লি এবং মুহূর্তে বিছানার একটা দিক উপরে উঠে গিয়েছিল। পেছনের দিকে হেলে পড়েছিল সে। পা দুটো উঠে গিয়েছিল শূন্যে।

'মাফ করবেন, স্যর,' স্টুয়ার্ড দরজার বাইরে থেকে খিকখিক করে হেসে উঠেছিল। ঠেলে বন্ধ করে দিয়েছিল দরজাটা। পরক্ষণেই দরজায় তালা মারার শব্দ শুনতে পেয়েছিল কাল্লি। বুঝতে পেরেছিল কী ঘটেছে। আটক করা হয়েছে তাকে! তখন থেকেই বিষয়টা নিয়ে ভাবতে লাগল ও। তার মনে হলো এটা ছাড়া স্টুয়ার্ডের আর কী-ই বা করণীয় ছিল?

কাল্লি আয়নার দিকে তাকাল আবার। দেখতে লাগল নিজেকে। তীক্ষ্ণ চোয়াল, নীল চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। বর্তমান পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল ও। চার দেয়ালের মাঝে বন্দি রেখে ওকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করছে ওরা। চোখ বোলাল সে কেবিনটার ভেতরে। একটা সিঙ্গেল ট্যুরিস্ট কেবিন এটা। যানটায় রয়েছে অসংখ্য কেবিন। সিঙ্গেল বেড, ডবল বেড এবং বেড ছাড়া বড় বড় কক্ষ। তবে বেশির ভাগই ট্যুরিস্ট কেবিন। কেবিনগুলো সুসজ্জিত। কেবিনের দেয়ালের উপরের অংশে রয়েছে আলো,

তাপমাত্রা ও ভেন্টিলেশন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মিউজিক ও রোমাঞ্চকর ছবির টেপ, খাবার, ড্রিঙ্কস এবং অতিথির জন্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। একটা ফোনও রয়েছে এবং একটা বোতাম। স্টুয়ার্ডের রুমের সাথে দুটোরই সংযোগ রয়েছে। একটু ভেবে ফোনটা ব্যবহার করল সে, বোতামে চাপ দিল। কিন্তু সাড়া পেল না ওপাশ থেকে। ঠিক এসময়ে তার সামনের দেয়ালে লাল আলোর ঝলকানি হলো। দেয়ালের ভেতর দিয়ে ভেসে এল একটা কণ্ঠ। 'আমরা ওভার ড্রাইভে যাচ্ছি। আমি ক্যাপ্টেন বলছি। বিশ মিনিট পরে আমরা ওভার ড্রাইভ দিতে যাচ্ছি। লাউঞ্জের যাত্রীরা তাদের নির্ধারিত কেবিনে ফিরে যান। সব যাত্রী তাদের কেবিনে অবস্থান করবেন। প্রথমেই সিটবেল্ট বেঁধে নেবেন। আমরা ওভার ড্রাইভে যাচ্ছি। আমি ক্যাপ্টেন বলছি...'

সুইচ অফ করে দিল কাল্লি। এ ঘোষণার অর্থ হলো প্রত্যেক যাত্রীকে তার কেবিনে বাধ্যতামূলক ভাবে থাকতে হবে। এবং ক্রুরা থাকবে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে। কাল্লি যদি এখন বের হয় কেউ জানবে না। ঝুঁকি আছে কাজটাতে, কিন্তু কিছু করার নেই। ওভার ড্রাইভের আগেই তাকে সুযোগটা নিতে হবে।

নিজের চারপাশে তাকাল কাল্লি। কয়েদীরা জেল থেকে কীভাবে পালায় চিন্তা করল ও। খাড়া মসৃণ দেয়াল। ওটা বেয়ে উপরে ওঠা সম্ভব নয়। বিছানার তোশক ওঠাল ও। তাকাল স্প্রিং-এর দিকে। চাপ দিয়ে খাটটাকে উপরে তুলল, এত উপরে যে খাটের উপর দাঁড়ালে ছাদটাকে স্পর্শ করতে পারবে সে এবং বেরিয়ে আসতে পারবে ছাদের ভারী গোল ঢাকনা খুলে।

পকেটে হাত ঢোকাল কাল্লি। বের করে আনল একটা ভাঁজ করা কাগজ এবং সোনালি রঙের ফাউন্টেন পেন। কলমটার ক্যাপ ও নিব খুলে ফেলল সে। ভেতর থেকে একটা টিউব বের করে আনল। টিউবটাকে সরিয়ে রাখল একপাশে। তারপর পরনের

প্যান্ট থেকে বেল্টটা খুলে ফেলল। বেল্ট থেকে মুক্ত করল বাকলটা। বাকলের এক বিশেষ স্থানে চাপ দিয়ে ফাউন্টেন পেনের টিউবটা আটকে দিল। কারিগরি বিদ্যা ফলানোর কিছুক্ষণের মধ্যে সেটা পিস্তলের আকৃতি নিল। মুখের ভেতর হাত ঢুকিয়ে খুলে আনল নকল মাঢ়ী। ওগুলো আসলে এক ধরনের বুলেট। বাকলের ফাঁকে ওগুলোকে ম্যাগাজিনের মত আটকে দিল সে। চোখ পড়ল পকেট থেকে বের করা কাগজটার দিকে। ভাঁজ খুলল ও। পড়ল ভেতরের লেখা। 'নতুন পৃথিবী হবে আমাদের ঠিকানা, আমাদের ভালবাসা।—লুসি।'

চমৎকার! ভাবল কাল্লি। নির্বোধ মেয়েদের কাছ থেকে এরকমই আশা করা যায়। চিরকুটে 'নতুন পৃথিবী' সম্পর্কে ফুটে উঠেছে রোমান্টিক ধারণা। অথচ কাল্লি জানে সেখানে রোমাণ্টিকতা বলে কিছু নেই, নেই জীবনের চাঞ্চল্য। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সেখানে মরবে সবাই। কিন্তু মেয়েটা বিশ্বাস করেনি তার কথা। এই পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূরের 'নতুন পৃথিবী' সম্পর্কে কথা বলার সময় মেয়েটার দু'চোখে স্বপ্ন উপচে পড়তে দেখেছে সে। 'ওটা একটা স্বর্গ,' বিড়বিড় করে বলেছিল মেয়েটা। 'পুরানো পৃথিবীতে কে থাকবে বলো? কী আছে এখানে?' মনে মনে তখন হেসেছিল কাল্লি। অনুভব করেছিল ওর পকেটে কী যেন গুঁজে দিচ্ছে মেয়েটা। এখন সেটাই দেখছে কাল্লি।

কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। কী মনে করে আবার কুড়িয়ে আনল। পুরে রাখল পকেটে। বর্তমান সমস্যা নিয়ে ভাবল সে। কেবিন থেকে তাকে বের হতে হবে। পাঁচ মিনিট এর মধ্যেই চলে গেছে। হাতে আছে মাত্র পনেরো মিনিট। দ্রুত উঠে দাঁড়াল সে বিছানার উপর। চাপ দিল ছাদের ঠিক মাঝখানে। তার জন্যে এটা কঠিন কিছু না। এই নভোযানের সব কিছুই মুখস্থ তার। গত সপ্তায় এটার মডেল নিয়ে খুঁটিনাটি দেখেছে সে। ঢাকনাটা সরে গেল। ঝুলে পড়ল সে। নিজেকে টেনে বের করে আনল। নেমে

পড়ল করিডরে।

করিডরটা ফাঁকা। কেউ নেই। নীরব একেবারে। আশপাশের সমস্ত দরজা বন্ধ। হেঁটে এগোতে লাগল সে। নভোযানের ঠিক মাঝখানের জায়গায় এসে থামল। ইস্পাতের একটা মই দেখতে পেল সেখানে। উঠে গেছে মেঝে থেকে উপরের দিকে। কাল্লি দেখল, উপরে মইয়ের মাথার দিকে ধাতুর তৈরি ভারী ঢাকনি বন্ধ করে রেখেছে উপরে ওঠার পথ। কিছুক্ষণ চিন্তা করল ও। পিস্তলটা হাতের মধ্যে নিল। তারপর উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। একটা হাত উপরে উঠিয়ে মোচড় দিল সে ঢাকনির হাতলে। খুলে গেল ঢাকনি। পিস্তলটা হাতে নিয়ে উপরে উঠে এল।

ভেতরে ঢুকেই থমকে গেল কাল্লি। বিছানার উপর বসে আছে আট বছরের কাছাকাছি ছোট্ট এক মেয়ে। তাকিয়ে আছে সরাসরি ওর দিকে। পিস্তলের নলটা ঘোরাল কাল্লি। তাক করল মেয়েটার কপালের ঠিক মাঝ বরাবর। আঙুল কিছুটা চেপে বসল ট্রিগারে। কিন্তু ছোট্ট মেয়েটা নড়ল না একচুলও। মেয়েটাকে নিরুদ্বিগ্ন মনে হলো ওর। নিস্তব্ধতার ভেতর কাল্লি নিজের রক্ত চলাচলের শব্দ শুনতে পেল। টিপে দিল ট্রিগার।

মৃদু দুলে উঠল বাচ্চা মেয়েটা। তারপর পড়ে গেল চিৎ হয়ে। দ্রুত তার কাছে চলে এল কাল্লি। ঝুঁকে কান পাতল বুকে। শুনতে পেল মেয়েটার নিঃশ্বাসের মৃদু আওয়াজ। উঠে দাঁড়াল কাল্লি। এ ধরনের গুলি রক্তে মেশে না। কিন্তু খুব দ্রুত নার্ভের উপর কাজ করে। এটা এনেসথেটিক গুলি। এর কল্যাণে মেয়েটা এখন সুখনিদ্রা দেবে। এই রুমের ছাদেও একই রকম ঢাকনি রয়েছে। হাতলটা ধরে মোচড় দিতে যাবে, এমন সময় উপর থেকে ভেসে আসা নারী কণ্ঠ শুনতে পেল কাল্লি।

'শয়তানটা ভেতরেই আছে,' নারী কণ্ঠটা বলছে। 'ওকে আটকে রাখা হয়েছে।'

'সে কী করবে?' বলল অন্য একটি নারী কণ্ঠ।

'ছ'মাস আগে ঠিক এটার মত দেখতে একটা নভোযান ছিনতাই করেছিল সে। সেটার নাম ছিল "প্রিন্সেস অভ অরগিল"। কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি তার। শুনেছি ওটার সবাইকে খুন করে সে, কেউ যাতে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে না পারে। শয়তানটা এই নভোযানে উঠেছে। স্টুয়ার্ডটা তাকে চিনেই আটকে ফেলেছে। আপনার ভয় করছে না?'

'আমি ভীতু নই।'

'এই নভোযানেরও কেউ রেহাই পাবে না, যদি সে বেরোতে পারে।'

'কে বলল?'

'ওহ্, সবাই তা জানে।'

কিছুক্ষণ ভাবল কাল্লি। পিস্তলটা দু'পাটি দাঁতের ফাঁকে আটকে নিল। তারপর মাথার উপরের ঢাকনির হাতলটা দু'হাতে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। টানতে লাগল নীচের দিকে। ঢাকনি খুলে গেল। খোলা মুখের কিনারে দু'হাত রাখল সে। তারপর লাফিয়ে মাথার উপরের কেবিনে উঠে এল। হাতে আবার চলে এল পিস্তলটা।

রুমের ভেতর দু'পাশে দুটো বিছানা। মাঝখানে ফাঁকা জায়গা। একটা বিছানায় পা ছড়িয়ে বসে আছে প্রায় বিশ বছরের এক মেয়ে। বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট শরীর। মাথায় সোনালি চুল। হাঁটুর উপর আড়াআড়ি ভাবে তোয়ালে বিছিয়ে নখে নেইলপলিশ মাখছে সে। অন্য বিছানার মেয়েটা লম্বা। মাথায় ঘন কালো চুল। দারুণ সুন্দরী। ঝুঁকে পাশের ডেস্কে লিখছে কী যেন, সম্ভবত চিঠি। দু'জনেই একসাথে কাল্লির দিকে ফিরে তাকাল। চোখ গেল হাতের অস্ত্রটার দিকে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সোনালি চুলের মেয়েটি। মুখ ঢাকল তোয়ালে দিয়ে এবং সেই সাথে ঢলে পড়ল বিছানায়। কালো চুলের সুন্দরী মেয়েটার মুখমণ্ডল ধীরে-ধীরে ফ্যাকাসে হয়ে এল।

'জিম!' বলল সে সবিস্ময়ে।

'দুঃখিত,' বলল কাল্লি। 'আমার আসল নাম কাল্লি হোয়েন। ভুল নামে চিনতে আমাকে। এ ব্যাপারে আমি খুবই দুঃখিত, লুসি। এ ছাড়া উপায় ছিল না।'

'তুমি-তুমি তা হলে...'

'হ্যাঁ, লুসি। আমিই সেই ছিনতাইকারী। এখন আর দুর্ঘটনা এড়ানোর কোনও পথ নেই।'

'আচ্ছা!' বলল লুসি। তাকাল কাল্লির হাতে ধরা অস্ত্রের দিকে। 'তুমি কি আমাকে গুলি করতে চাও?'

'করতেও পারি,' বলল কাল্লি। 'আমি ভাবতেও পারিনি পৃথিবী ছাড়ার জন্যে তুমি এতটা উতলা ছিলে।'

'তোমাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম, কাল্লি।' ভাবলেশহীনভাবে বলল লুসি। 'কিন্তু তুমি...তুমি একটা খুনী। তোমাকে দেখে একটা কবিতার কথা মনে পড়ছে। বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে খামারবাড়ির এক তরুণীর কাছে এসেছিল এক যুবক। ছেলেটাকে দেখে তার প্রেমে পড়ে গেল মেয়েটা। ভেবেছিল, ছেলেটা সৈনিক হবে। কিন্তু শেষকালে মেয়েটাকে সে বলল সে একজন আউট-ল, বনের মধ্যে পালিয়ে আছে। ওহ্, কাল্লি...তুমিও...'

অপমানে সংকুচিত হলো কাল্লি। 'লুসি...লুসি...'

'ওহ্, ঠিক আছে,' লুসি বলল। তাকাল কাল্লির দিকে। 'তোমার কাছে অস্ত্র আছে। কী করতে চাও আমাদের নিয়ে?'

'শুধু চুপচাপ বসে থাকো,' বলল কাল্লি। 'এখান দিয়ে উপরে উঠব আমি।' দেয়ালের ফোনটার কাছে গেল সে। টেনে নামিয়ে আনল রিসিভারটা। 'তুমি স্টুয়ার্ডকে ফোন করো। ফোনে ব্যস্ত রাখো ওকে। আমি যাবার পরেও কথা বলতে থাকো। খবরদার উল্টোপাল্টা কিছু কোরো না। এমন ভাব দেখাও যেন সব ঠিক আছে।'

রুমের ভেতরের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল কাল্লি। নীচে তাকিয়ে দেখল ওর দিকেই বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে আছে লুসি। উপরের রুমটায় ঢুকে দেখতে পেল রুমটা যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। দরজা খুলে পাশের রুমটায় গেল সে। এই রুমটার ওপাশে আর কিছুই নেই। কেবল শূন্যতা। কাঁচের জানালার ভেতর দিয়ে সে চোখ রাখল বাইরে। বিশাল সব নক্ষত্র তীরের বেগে যেন ছুটে যাচ্ছে নভোযানটার গা ঘেঁষে। মনে পড়ল লুসির কথা। বেচারি ভালবেসেছিল ওকে।

সময় বেশি নেই। দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এল কাল্লি। বাইরের করিডরটা তাকিয়ে দেখল একনজর। হ্যাঁ, উপরেরটা কন্ট্রোল রুম হবে, ভাবল সে। এগোল সামনে। কম্যুনিকেশন রুমের কাছে গিয়ে থামল। মনে হলো লুসির কণ্ঠ শুনতে পেয়েছে সে, ভেতর থেকে। বিপরীত দিকের রুমটা খুলল ও। দেখতে পেল অত্যাধুনিক লেজার রাইফেলগুলো। এক হাতে পিস্তলটা ধরে অন্যহাতে একটা রাইফেল তুলে নিল সে। তারপর করিডরে ফিরে এসে কান পাতল কম্যুনিকেশন রুমে।

'না, আর কেউ নেই,' লুসি বলছে কাউকে। 'সে একাই।'

হাতল ঘুরিয়ে দরজা নিঃশব্দে ফাঁক করল কাল্লি। লুসিকে দেখতে পেল। আরও আটজন রয়েছে রুমে। ওই লম্বামুখো স্টুয়ার্ডটাও রয়েছে, যে ওকে আটকে রেখেছিল কেবিনে।

'হ্যাঁ, আর কেউ নেই,' গমগম কণ্ঠে বলল কাল্লি।

সবাই বিদ্যুদ্বেগে ঘুরল ওর দিকে।

ভেতরে ঢুকে দরজার কাছের টেবিলের উপর পিস্তলটা রাখল কাল্লি। দু'হাতে ধরল এবার ভারী রাইফেলটা। সবাইকে কাভার দিচ্ছে সে। 'আমি একা। একদম একা,' বলে উঠল।

'কী চাও তুমি?' ক্যাপ্টেনের পোশাক পরা লোকটা জানতে চাইল। চেহারায় রাগ।

প্রশ্নটাকে উপেক্ষা করল কাল্লি। রুমের ডান দিকে ঘুরে গেল

সে। 'তোমাদের একজনকে এখানে দেখছি না,' কাল্লি বলল। 'কোথায় সে?'

'ডিউটি নেই ওর,' উত্তর দিল কাল্লিকে নীচের কেবিনে আটকে রাখা লম্বামুখো স্টুয়ার্ডটা। 'ঘুমাচ্ছে।'

'পেছনে ঘোরো,' তাকে নির্দেশ দিল কাল্লি। 'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।'

রুমের প্রত্যেককে খুঁটিয়ে দেখল সে। কীসের যেন সতর্ক সংকেত দেখতে পেল লুসির চোখে। বড়-বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে লুসি।

'তুমি এখানে ঢুকলে কেন?' রূঢ় কণ্ঠে তাকে বলল কাল্লি।

সাদা হয়ে গেল লুসির ঠোঁট দুটো। 'আমি নীচে তাকাই। দেখতে পাই কেবিনের বাচ্চা মেয়েটার কী হাল তুমি করেছ,' ভেঙে এল লুসির কণ্ঠ। ফিসফিস করে বলল, 'ওহ্, কাল্লি—'

'থামো!' গর্জে উঠল কাল্লি। 'সবাই ওই কোনায় জড়ো হও। যতক্ষণ না কেউ বলছে অন্য লোকটা কোথায়, ততক্ষণ প্রতিবার একজনকে গুলি করব আমি। রেডি...'

'তুমি একটা বোকা,' ক্যাপ্টেন বলল। প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে তার মুখের রং। 'এখানে একা তুমি। নিজ থেকে একা কিছুতেই এই নভোযানের নিয়ন্ত্রণ নেবার সুযোগ পাবে না। তুমি জানো নভোযান ছিনতাইকারীদের কপালে কী ঘটে? আত্মসমর্পণ করো, কাল্লি। আমরা তোমাকে নতুন পৃথিবীতে ছেড়ে দেব। মৃত্যুদণ্ড এড়িয়ে তুমি বেঁচে থাকতে পারবে।'

'ধন্যবাদ,' বলল কাল্লি। 'আমরা ওভার ড্রাইভ দেব ঠিকই, কিন্তু নতুন পৃথিবীর দিকে আমরা যাব না। কোর্স ঠিক করো, আমি যেভাবে বলব।'

'না!' কঠোর শোনাল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ।

'তুমি বেশ সাহসী মানুষ।' হাসল কাল্লি। 'কিন্তু সহযোগিতা না করলে আমি তোমাকে গুলি করব। তারপর লাইন ধরে এক

এক করে গুলি করতে থাকব তোমার অফিসারদের। নিজের প্রাণ বাঁচাতে চাইবে কেউ না কেউ। তোমাকে যা করতে বলেছি সেটা সে করে দেবে।' ক্যাপ্টেনের চোখে চোখ রাখল কাল্লি। 'কী ঠিক করলে?'

'ঠিক আছে, কনট্রোল রুমে চলো। কোথায় নভোযান থামাতে হবে বলো আমাকে,' ধীরে, সতর্কভাবে উত্তর দিল ক্যাপ্টেন।

'প্রথমে আমি প্রিন্সেস অভ অরগিলের কাছে যেতে চাই। আমি দেখতে চাই ওটার ক্যাপ্টেন আর অফিসাররা কেউ বেঁচে আছে কি না,' বলল কাল্লি।

'তাতে শুধু সময়ই নষ্ট হবে,' বলল ক্যাপ্টেন। 'প্রিন্সেস অভ অরগিল মহাশূন্যের কোন্ গলিতে পড়ে আছে কে জানে?'

'তুমি সহযোগিতা করছ না, ক্যাপ্টেন,' কাল্লি লেজার রাইফেল তাক করল মেইন কম্পিউটার প্যানেলের দিকে। 'এবার পস্তাও!'

'না, গুলি কোরো না।' ফার্স্ট অফিসার লাফিয়ে পড়ল মেইন কম্পিউটার প্যানেল এবং কাল্লির মাঝখানে। 'তা হলে বিস্ফোরণ ঘটবে। মারা যাব সবাই। এই নভোযানে কয়েক শ' যাত্রী আছে। তোমার কোর্স কী? তুমি কোথায় আমাকে সেট করতে বলো? এখনি করে দিচ্ছি আমি।'

কাল্লি হাসল। 'বুদ্ধিমান লোক।'

ফার্স্ট অফিসারকে অভিশাপ দিতে শুরু করল ক্যাপ্টেন। এমন জঘন্য ভাষায় গালি দিতে লাগল যে ভুলে গেল রুমটার মধ্যে লুসি আছে।

ফার্স্ট অফিসার কোর্স সেট করতে লাগল কাল্লির নির্দেশমত। মাত্র একবার স্টার্ট বন্ধ করল। আচমকা লাইট চলে গেল। এবং মহাকাশযান ওভার ড্রাইভ দিল। মাত্র এক সেকেণ্ড পরেই আলো চলে এল। ঠিক সেই সময়ে বিস্ফোরণের মত শব্দ করে বেজে উঠল অ্যালার্ম।

'সুইচে চাপ দাও,' বলল কাল্লি।

ফার্স্ট অফিসার চলে এল সামনে। কম্যুনিকেশন রুমটার স্ক্রিনের সাথে সংযুক্ত বাটনে চাপ দিল। সাদা জ্যাকেট পরা এক লোককে হঠাৎ দেখা গেল পুরো স্ক্রিন জুড়ে। হাসি ফুটে উঠল কাল্লির ঠোঁটে। বিড়বিড় করে বলল, 'প্রিন্সেস অভ অরগিল।'

স্ক্রিনের লোকটা তাকাল কাল্লির দিকে। মাঝারি বয়সের শান্ত সৌম্য চেহারা। বুড়ো আঙুল উঁচু করল সে।

'ভেড়াও,' বলল কাল্লি।

'তুমি দুর্ঘটনা ঘটাতে চাও, কাল্লি?' জিজ্ঞেস করল ফার্স্ট অফিসার। 'এখানে সেটা সম্ভব না।'

'এই মুহূর্তে–' শুরু করল কাল্লি, কিন্তু শেষ করতে পারল না কথা। তার পেছন থেকে অন্য একটি কণ্ঠ ভেসে এল। 'তোমার খেল খতম।'

কাল্লি ঘুরল না। চোখে-মুখে দুঃখী ভাব ফুটিয়ে তুলে এই প্রথম নভোযানের অফিসারদের দিকে এবং লুসির দিকে দীর্ঘসময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর দাঁত বের করে হাসল। হঠাৎ করেই হাসি মিলিয়ে গেল তার। 'বন্ধু,' পেছনের লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বলল সে। 'এটা রক্ষা করতে পারলে পৃথিবীর মানুষের চোখে তুমি হিরো হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের কথা হলো সে সুযোগ তোমার কখনওই হবে না।'

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল কাল্লি। ভাবল, স্টুয়ার্ড অথবা অফিসাররা কেউ কিছু বলবে। কিন্তু মন্তব্য করল না কেউ। সবাই নিশ্চুপ।

'তুমি আমার পেছনে আছ ঠিকই,' বলল কাল্লি, 'কিন্তু ভবিষ্যৎ আমার অনুকূলে। আমাকে থামাতে পারবে না তুমি। যদি মনে করো আমি কেবল কথার কথা বলছি, আবার চিন্তা করো তা হলে।'

ঘুরল সে। পা বাড়াল সামনে। তার কানের পাশ দিয়ে প্রথম বুলেটটা ছুটে গেল। পরের বুলেটটা তার সামনে মেঝেতে পড়ে

লাফিয়ে উঠল। কাল্লিকে লক্ষ্য করে অবিরাম গুলি করছে লোকটা। কিন্তু লাগাতে পারছে না। সম্ভবত লোকটা নার্ভাস হয়ে পড়েছে। কাল্লি ধীরে-সুস্থে তুলল রাইফেলটা। লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগারে চাপ দিল। লেজার আঘাত করল লোকটাকে। পড়ে গেল কুণ্ডলী পাকিয়ে করিডরের বাইরে। একই সময়ে পায়ে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল কাল্লি। গোটা রুম দুলতে শুরু করল তাকে ঘিরে। যন্ত্রণায় বেঁকে যাচ্ছে তার মুখ। রুমের সবাই বুঝল পায়ে গুলি খেয়েছে কাল্লি।

'আহ!' গুঙিয়ে উঠল কাল্লি। জোর করে হাসি টেনে আনল মুখে। বসে পড়ল। দেখল লুসি দরজার পাশের টেবিলটায় হাত বাড়িয়ে এক ঝটকায় তুলে নিল কাল্লির পিস্তলটা, যেটা কাল্লি আগে ওখানে রেখে দিয়েছিল।

'না, লুসি! না।' চিৎকার দিল কাল্লি।

কিন্তু লুসি দু'হাতে পিস্তলটা ধরল। সোজা করে তাক করল কাল্লির দিকে। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পড়ছে অশ্রু।

'লুসি, তুমি কি আমাকে গুলি করতে চাও?'

'সেটাই তোমার জন্যে ভাল, কাল্লি!' ফুঁপিয়ে উঠল লুসি। 'আমার সামনে একজনকে খুন করেছ তুমি। আরও খুন করবে। দুঃখিত, কাল্লি, তোমাকে গুলি না করে উপায় নেই আমার।'

'না, লুসি, না!' কথা শেষ হলো না কাল্লির। লুসির হাতে ধরা পিস্তলটা ঝাঁকি খেল। প্রচণ্ড শব্দে বুলেট এসে আঘাত করল কাল্লির বুকে। জ্ঞান হারাল কাল্লি।

যখন জ্ঞান ফিরে এল কাল্লির, সবকিছু প্রথমে ঝাপসা লাগল তার কাছে। পাশে দাঁড়ানো দেখল লুসিকে। সাদা জ্যাকেট পরা লোকটা কাল্লির মাথার কাছে। 'কেমন বোধ করছ?' কাল্লিকে জিজ্ঞেস করল সাদা জ্যাকেট।

'ভাল,' অস্ফুট স্বরে বলল কাল্লি। 'কিন্তু এত দেরি করছিলে কেন?'

'আমি বুঝতে পারিনি তুমি আক্রান্ত হবে। সব এখন নিয়ন্ত্রণে। নিশ্চিন্ত থাকো। দুটো গুলি ঢুকেছিল, বের করে ফেলেছি।' হাসল লোকটা।

'লুসির কোনও দোষ ছিল না, ডাক্তার,' বিড়বিড় করে বলল কাল্লি। 'ও বুঝতে পারেনি।'

'ওহ্। কী বোঝাতে চাইছে সে?' কাঁদছে লুসি।

'সে বোঝাতে চাইছে,' কর্কশ স্বরে বলল সাদা জ্যাকেট পরিহিত ডাক্তার, 'তোমরা যারা "নতুন পৃথিবী"র জন্যে পাগল হয়ে উঠেছ সেই নতুন পৃথিবী বলতে কিছু নেই। "পুরানো পৃথিবী" ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলে যে বিবৃতি দেয়া হচ্ছে তা-ও গুজব।'

'ওহ্। আপনিও তাই বলছেন?' জ্বলে উঠল লুসির চোখ জোড়া।

'ইয়াং লেডি,' বলল ডাক্তার, 'আমাদের বন্ধু কাল্লি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?'

লুসির নাক টানার শব্দ শুনতে পেল কাল্লি। বলল, 'সে-সে একজন ছিনতাইকারী। প্রিন্সেস অভ অরবিল্লকে ছিনতাই করেছিল সে। মেরে ফেলেছিল তার যাত্রীদের। আর এখন এই স্টার অভ দ্য নর্থকেও সে ছিনতাই করেছে। আপনি সহযোগিতা করেছেন তাকে।'

'কেবল এ দুটোই নয়, এ পর্যন্ত আটটা নভোযান সে ছিনতাই করেছে,' মৃদু হেসে বলল ডাক্তার। 'তাকে ওই দায়িত্বই দেয়া হয়েছিল। আসলে সে ছিনতাই করেনি, বরং রক্ষা করেছে। বোকা মানুষেরা "পুরানো পৃথিবী" ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। ওদের ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে কাল্লি এর জন্যে তাকে মাসে মাসে বেতনও দেয়া হয়।'

'কী বলছেন আপনি?' কেঁপে গেল লুসির গলা। 'এমন জঘন্য কাজ তাকে বেতন দিয়ে করানো হচ্ছে?'

'ঠিক তাই।' বলল ডাক্তার। 'কিন্তু এটাকে জঘন্য বলছ কেন? মানুষ তাদের পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। গুজব রটাচ্ছে মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে পৃথিবী। প্রতিমাসে হাজার হাজার মানুষ চলে যাচ্ছে পৃথিবী ছেড়ে। অবশ্য কাল্লি ফিরিয়েছে সবাইকে। তাদের দুর্ভাগ্য যে শেষ পর্যন্ত নিজেদের বোকামিতে মারা পড়েছে সবাই। কোথাকার কোন্ এক গ্রহকে "নতুন পৃথিবী" বললেই হলো? পুরানো পৃথিবী ছাড়ার দরকারটা কী? পুরানো পৃথিবীই বা এটাকে বলা হচ্ছে কেন? পৃথিবী তো পৃথিবীই। সবুজে শ্যামলে কত সুন্দর।'

'না,' বলল লুসি। 'পৃথিবীটা এখন আর সুন্দর নেই। আমি জানি। বিজ্ঞান একাডেমির সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে পৃথিবী ছেড়ে নতুন পৃথিবীতে যাবার। পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু সব কারণ জানি না আমি। শুধু এটুকু জানি নতুন পৃথিবীতে আমাদের যেতে হবে। বিজ্ঞান একাডেমি সব কিছু ব্যাখ্যা করেনি।'

'আমার মনে হয়,' বলল ডাক্তার, 'পুরোটাই ভুল বুঝেছ তুমি। ভুল বুঝেছে তোমার মত অনেকেই। বসবাসের অযোগ্য হয়নি পৃথিবী। বিজ্ঞান একাডেমির কিছু খামখেয়ালী লোক অন্যগ্রহ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চাইছে। এর বেশি কিছু না। তুমি কাল্লির সাথেই পৃথিবীতে ফিরে যাও। আমার মনে হয় তুমি আগের মতই তাকে পছন্দ করবে। পৃথিবীর মত অমন চমৎকার জায়গা আর কোথাও নেই, খুকি।'

'হ্যাঁ, পৃথিবীকে আমরা নতুন করে সাজাব,' বলল কাল্লি। 'একেবারে নতুন করে। আমি জানি পৃথিবীকে ঘিরে একটা চক্রান্ত চলছে। কিন্তু ওরা তা পারবে না। আমরা ওটাকে আমাদের মত করেই গড়ে তুলব।'

'ওহ্, কাল্লি, কী ভুল বুঝেছিলাম তোমাকে।' লুসি বলল। হঠাৎ সে বসে পড়ল কাল্লির বিছানার কাছে। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে

ধরল ওকে। কাল্লিও দু'হাতে বুকের ভেতর টেনে নিল লুসিকে। ডাক্তার তাকাল সেদিকে। তারপর মৃদু হেসে নিঃশব্দে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ভেতরে লুসির ঠোঁট দুটো নিজের ঠোঁটে নিয়ে পিষতে লাগল কাল্লি। প্রবল আবেগে দু'জন-দু'জনের পোশাক খুলে নিল।

নভোযান যেদিন পৃথিবীতে পৌঁছাল, অবাক হয়ে গেল লুসি। হাজার হাজার মানুষ ফুলের তোড়া নিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে ওদের। মুখে হাসি। উৎফুল্লে লাফাচ্ছে সবাই। 'স্বাগতম, কাল্লি,' বলছে ওরা চিৎকার করে। 'আমাদের নিরাপত্তা তুমি নিশ্চিত করেছ। পৃথিবীতে এখন আর কোনও শত্রু নেই। নতুন পৃথিবীর কথা মুখে আনবার মতও নেই কেউ। ধন্যবাদ, কাল্লি। এমন সুখের জীবন আমাদের আর কখনওই ছিল না।'

হঠাৎ লুসির দিকে চোখ পড়ল ওদের। নিমেষেই থমকে গেল ওরা। চোখে-মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়। 'ও—ও বেঁচে আছে কীভাবে?'

হাসল কাল্লি। 'কেন? ও কি তোমাদের অনেকের চেয়ে দেখতে সুন্দর নয়?'

'কিন্তু...কিন্তু ও একজন মানুষ...'

'বাচ্চা তৈরির ক্ষেত্রে মানুষের কোনও তুলনা নেই,' বলল কাল্লি, 'ডাক্তারও একই কথা বলবে। নভোযানের মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল। ওর পেটে এখন বড় হতে থাকবে আমার সন্তান। প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তো কিছু করা যাচ্ছে না, তাই নয় কি?'

বিমূঢ় দৃষ্টিতে কাল্লির দিকে তাকাল লুসি। ঢোক গিলল। 'কাল্লি, তোমার কথা বুঝতে পারছি না আমি। এরাই বা কী বলছে? কাল্লি, আমাকে ঠিক করে বলো, কী হচ্ছে এসব?'

'দুঃখিত, ডার্লিং,' উত্তর দিল কাল্লি। 'বিজ্ঞান একাডেমির আশংকাই সত্যি হয়েছে। পৃথিবী আসলেই মানুষের জন্যে

বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। এর কারণ হলো আমরাই এটাকে দখল করে নিচ্ছিলাম। বিজ্ঞানীরা টের পেয়ে গিয়েছিল সেটা। কিন্তু কিছুই করার ছিল না তখন। শেষ পর্যন্ত তারা "নতুন পৃথিবী" নাম দিয়ে অন্য এক গ্রহে পাঠাতে চাচ্ছিল এই পৃথিবীর মানুষদের, যাতে সেখানে টিকে থাকে তারা। কিন্তু সফল যে হয়নি তা তো দেখতেই পাচ্ছ। একটা নভোযানও যেতে পারেনি সেখানে। মহাকাশে আমরাই ওগুলো ছিনতাই করেছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি। আমি না হলে অন্য কেউ। সব মানুষকে মরতে হয়েছে। তুমিই একমাত্র মানুষ যে এখনও বেঁচে আছ।'

'তোমরা–তোমরা কারা?' ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করল লুসি। এখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না তার। মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছে সে। স্বপ্ন ভেঙে গেলেই দেখবে সব ঠিকঠাক আগের মতই আছে। কিন্তু সে জানে এটা স্বপ্ন নয়। সত্যিই বেদখল হয়ে গেছে পৃথিবী। চোখ মেলে দূরে তাকাল লুসি। সব কেমন প্রাণহীন, ফাঁকা।

'আমরা জন্মেছিলাম এসটেরোপ ফোর গ্রহে,' বলল কাল্লি। 'জায়গাটা পৃথিবীর মত এত সুন্দর না। তাই পৃথিবীতেই চলে এসেছি আমরা। এটাই এখন আমাদের ঠিকানা। তোমাদের মতই বুদ্ধিমান আমরা, কখনও-কখনও আরও বেশি। এবং শক্তিশালী। প্রমাণ তো পেয়েছই।'

'আমাকে...আমাকে কি তোমরা মেরে ফেলবে?'

'হ্যাঁ, লুসি,' কাল্লি বলল। 'অবশ্য মানুষের একটা নমুনা হিসাবে তোমাকে বাঁচিয়েও রাখতে পারি। তা ছাড়া তোমার পেটে আমার বাচ্চা আসছে। যা হোক, তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্তটা পরে নেব। বাচ্চাটা আগে জন্ম নিক। দেখি মানুষের পেটে আমাদের বাচ্চারা কেমন হয়ে জন্মায়।'

হঠাৎ গা গুলিয়ে উঠল লুসির। মনে হলো দম বন্ধ হয়ে যাবে তার। বুঝতে পারল, নভোযানে সবাইকে মেরে ফেললেও ওকে কেন বাঁচিয়ে রেখেছিল তখন। পাশে তাকাল লুসি। খাদের ভেতর

লাফ দিয়ে পড়লে সে কি মরবে না? মনে মনে প্রস্তুতি নিল লুসি।

'দুঃখিত,' বলল কাল্লি। 'আত্মহত্যার কথা চিন্তাও কোরো না। অন্তত বাচ্চাটা জন্ম নেবার আগ পর্যন্ত। চলো, নামা যাক। মুশকিল হয়েছে কি জানো? মানুষের চিন্তাভাবনা সব আমরা আগে থেকেই পড়ে ফেলতে পারি। নাও, ডান পা-টা আগে বাড়াও...'

নেমে এল ওরা। ধীরে-ধীরে পেছনে বন্ধ হয়ে গেল নভোযানটির দরজা। উল্লসিত জনতা ফুল ছিটিয়ে বরণ করল ওদের।

মূলঃ গর্ডন আর. ডিকসন
রূপান্তরঃ মিজানুর রহমান কল্লোল

দৌড়

নিচু ছাদের একটি মাটির ঘরে বসে কৃষকরা আলোচনা করছিল কীভাবে তাদের জরুরি বৈঠকের কথা সবগুলো গাঁয়ে পৌঁছে দেয়া যায়। আমার কাছে পরামর্শ চাইল কী করবে। আমি কোনও বুদ্ধি দিতে পারলাম না।

এমন সময় নিচু, ভীরু একটি কণ্ঠ আমাদের চমকে দিল। 'আমাকে বার্তাটা দিন। আমি পৌঁছে দেব।' ছেঁড়া একটা জামা আর তাপ্পি মারা গাজররঙা হাফপ্যান্ট পরা বছর কুড়ির বলিষ্ঠ গড়নের এক তরুণ কথাটা বলেছে।

'কোন্ গ্রামে দিয়ে আসবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সবগুলো গাঁয়ে।' জবাব এল।

'সবগুলো গাঁয়ে! তুমি কি জানো বৈঠক কালই?'

'আজ্ঞে। জানি।' 'বলল সে। সব মিলে দশ-বারোটা গাঁ...ষাট মাইলের বেশি হবে না দূরত্ব। ও আমি কয়েক ঘণ্টায় চক্কর দিয়ে ফেলব।'

এ কি ঠাট্টা করছে, নাকি সত্যি পারবে বলছে? আমি ভাল করে তাকালাম ছেলেটার দিকে। ওর মোটা ঠোঁট জোড়া যেন সদ্য চাষ করা জমির হাল, তার ওপরে নীলচে গোঁফের রেখা মিশেছে গালের খোঁচা দাড়ির সঙ্গে। লম্বা ঘাড়, চিতা-বাঘের মত সরু পেট এবং ব্রোঞ্জের ঢালের মত গোল হাঁটু। পায়ের ডিম বা গুলে কোনও লোম নেই, শুধু একজোড়া ময়ূরের ছবি উল্কি করা। চোখ জোড়া নিষ্প্রভ। এ ছেলে কী করে কয়েক ঘণ্টায় ষাট মাইল রাস্তা

পাড়ি দেবে? আমাদের কথার মাজেজা বুঝতে পেরেছে আদৌ? বাদামি দাড়িঅলা ইন্দর সিং শক্ত হাতে আমার কাঁধ খামচে ধরে বলল, 'এ হলো বুটা সিং... ভাগু গ্রামের। ওকে চেনেন না? ও এক দৌড়ে একশো মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে পারে।'

'একশো মাইল?'

'হ্যাঁ। একশো মাইল। ও যখন ছোটে মনে হয় পেছনে ঝোড়ো বাতাস রেখে যাচ্ছে...'

'একশো মাইল!' বিস্ময় কাটছে না আমার।

'বুটা সিং-এর নাম শোনেননি কখনও?' জিজ্ঞেস করল ইন্দর সিং।

'না। শুনিনি।'

'বুটা হলো রাখুর ছেলে,' শুরু করল ইন্দর সিং। 'আমার গাঁয়ের লোক। বুটার জন্মের পর তার মা তাকে একটা ঝুড়িতে রেখে মাঠে যেত লাঙল দিতে। মাঠের কোণে একটা ভাঙা খড়ের ঘরে থাকত ওরা। বুটার বাবা শেয়াল, খরগোশ আর ফেজাণ্টের হাত থেকে শস্যের খেত রক্ষার জন্য সর্বক্ষণ পাহারা দিত। শীতের এক রাতে নিউমোনিয়া বাধিয়ে মরে যায় বাপ। রাখু তার ছোট ছেলেকে নিয়ে মাঠের ধারেই থাকত। এক বেদে দলের কাছ থেকে পাহাড়ি একটা কুত্তার বাচ্চা কিনে নিয়েছিল রাখু। বাচ্চাটা শীঘ্রি জোয়ান মর্দে পরিণত হয়। তার সঙ্গে বেড়ে ওঠে বুটাও। সে কুত্তাটার লেজ মুচড়ে দিত, জানোয়ারটা কেঁউ কেঁউ করে উঠত, লাফাত-ঝাঁপাত, খেলা করত বুটার সঙ্গে।

'বুটার ছেলেবেলা কেটেছে উট, ঘোড়ার বাচ্চা, খেঁকশিয়াল আর কাঠবিড়ালী তাড়া করে। ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে সে খরগোশ তাড়া করত। সঙ্গে ছুটত কুত্তাটা। এতই ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে বুটার গতি, দৌড়ে ধরে ফেলতে পারত খরগোশ, ছেড়ে দিয়ে আবার তাড়া করত ওটাকে। একটা খরগোশ একটানা চার মাইল দৌড়াতে পারে, শেয়াল পারে আট মাইল, ঘোড়া চল্লিশ মাইল

আর উট পঞ্চাশ মাইলের বেশি পারে না। তবে বুটা একশো মাইল রাস্তা পার হতে পারে...'

'একশো মাইল পার হতে তার কত সময় লাগে?' জানতে চাইলাম আমি।

'বারো ঘণ্টা। ঘোড়া বুটার চেয়ে দ্রুত ছুটতে পারে সন্দেহ নেই, তবে একটানা একশো মাইল পথ পাড়ি দেয়া তার পক্ষেও সম্ভব নয়।'

আমার দিকে তাকাল ইন্দর সিং। বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কাগজপত্র ওর হাতে দিয়ে দিন। কাল সকালের মধ্যে সে যথাস্থানে পৌঁছে দেবে ওগুলো।' বুটার দিকে ফিরল সে। 'বুটা, বেটা! এই কাগজগুলো নাও। সবগুলো গাঁয়ে পৌঁছে দিয়ো। যাও, আমার সিংহ।'

বুটার হাতে কাগজ দিয়ে কোন্ কোন্ গ্রামে যেতে হবে তার নাম বলল ইন্দর সিং। কার কাছে পৌঁছে দিতে হবে বার্তা তা-ও খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিল।

পরদিন কৃষকদের সংঘের নেতারা বৈঠকের জন্য নির্ধারিত সময়ে হাজির হয়ে গেল। আমি আলাদা ভাবে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলাম তাকে মেসেজ কে পৌঁছে দিয়েছে। সবাই একই জবাব দিল, 'বুটা।'

বৈঠক শেষে উকিল কুমার সাইন, অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার যুগল কিশোর, বিচারপতি আজমির সিংসহ কয়েকজন বসলাম বুটাকে ঘিরে। কথা বললাম ওর সঙ্গে। আমাদের আফসোস লাগল ভেবে এরকম একটি প্রতিভার কথা গাঁয়ের বাইরের কেউ জানে না। 'বুটা লণ্ডন গিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতায় যদি অংশ নিতে পারত, আমি নিশ্চিত পৃথিবীর মানচিত্রে ভাগু গ্রামের নামটা সে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখত।' ঘোষণা করলেন হেডমাস্টার।

'আমাদের দেশে প্রতিভার অভাব নেই,' যোগ করলেন কুমার সাইন। 'আমাদের বড় বড় সাঁতারু, কুস্তিগীর এবং শিকারী

আছে। অথচ এদের কথা কেউ জানে না। এদের প্রতিভার বেহুদা অপচয় হচ্ছে।'

'বুটা টানা একশো মাইল দৌড়াতে পারলে বিশ্বখ্যাত হওয়া থেকে তাকে ঠেকায় কে?' সায় দিলেন বিচারক।

সামরিক বাহিনীর এক হাবিলদার বলল, 'পাতিয়ালার মহামান্য রাজা খেলাধুলা খুব পছন্দ করেন। আমরা কোনওভাবে খবরটা তাঁর কানে পৌঁছে দিতে পারলে, মহারাজা বুটাকে নির্ঘাত আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক টুর্নামেন্টে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।'

একচোখো, ধূর্ত এক দলিল লেখক বলল, 'কেউ কি পরীক্ষা করে দেখেছে বুটা সত্যি একশো মাইল দৌড়াতে পারে কি না?' টাক মাথা এক দোকানদার বুটাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সন্দেহের সুরে বলল, 'চাষারা দূরত্বের মাত্রা ঠিকমত মাপতে জানে না। কেউ ত্রিশ মাইল দৌড়ালে মনে করে একশো মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে।'

'আমাদের গাঁয়েই একটা দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করি না কেন,' প্রস্তাব দিলেন হেডমাস্টার। 'বড় ফসলের মাঠটা প্রায় ৪৪০ গজ লম্বা। বুটা এ মাঠে চারশো বার চক্কর দিলেই তার একশো মাইল দৌড়ানো হয়ে যাবে। ওর দৌড় দেখে আমরাও মজা পাব। তারপর ওর ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।' এ প্রস্তাবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সবাই।

আমি বুটাকে জিজ্ঞেস করলাম সে মাঠে দৌড়াতে রাজি কি না। চোখ পিটপিট করে নিরাসক্ত গলায় জবাব দিল, 'আপনারা যা বলেন।'

ঢোলক মারু ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করল খবরটা, 'ভায়েরা শোনো! রবিবার সকাল সাতটায় বিখ্যাত দৌড়বিদ বুটা সিং একশো মাইল দৌড়ে নামবে। গাঁয়ের সবাইকে বড় মাঠে হাজির হয়ে এই আশ্চর্য দৌড় দেখার আমন্ত্রণ রইল!' দ্রিম! দ্রিম! দ্রিম!

রোববার খুব সকালে মাঠে ভিড় জমে গেল। সবাই বুটার

আশ্চর্য দৌড় দেখতে এসেছে। বুটার পরনে খদ্দরের একটা হাফপ্যান্ট, আগুনরঙা রুমালে বেঁধে নিয়েছে লম্বা চুল। খুলির ওপর খোপার মত দেখাচ্ছে। কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় রেফারীর ভূমিকায় হাজির হয়ে গেলেন অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার। বাঁশিতে ফুঁ দিলেন তিনি। শুরু হয়ে গেল বুটার একক দৌড় প্রতিযোগিতা।

সকাল আটটা পর্যন্ত লোক সমাগম হতে থাকল। হেডমাস্টার বসে বসে দেখছেন বুটা একই গতিতে বড় মাঠ একের পর এক চক্কর দিয়ে চলেছে। মহিলারা মাঠের এক কোণে বসে মাথায় আঁচল দিয়ে সংসারের গালগল্প করছে আর দেখছে বুটার দৌড়।

দুপুরের দিকে বিরতি দিল বুটা। ঢোলক বুটার জন্য এক জগ দুধ নিয়ে এসেছিল। দুধ পান করল সে, বদলে ফেলল ঘামে শরীরের সঙ্গে এঁটে যাওয়া হাফপ্যান্ট। চুল আঁচড়ে নিয়ে মাথায় চুড়ো করল, তারপর রুমাল দিয়ে বেঁধে নিয়ে আবার শুরু করল দৌড়। সন্ধ্যা পর্যন্ত দৌড়াল সে। সাড়ে ছ'টায় শেষ হলো তার চারশো রাউণ্ডের চক্কর। নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা আগেই দৌড় শেষ করেছে সে। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। বুটার চুল আর আগুনরঙা রুমালে সূর্যের বিদায়ী আবির, পালকের মত জ্বলছে। বুটার বুক ঘন ঘন ওঠানামা করছে, আঁটোসাঁটো শরীরে ঘামের বন্যা।

জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল। হাততালি দিচ্ছে। দু'জন ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে এগোল বাজারের দিকে। খবরটা বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে। বুটা বলল, 'সবই ওপরঅলার ইচ্ছা। তার শক্তি আমার হাড়ের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এ কারণেই একশো মাইল দৌড়াতে পেরেছি।'

স্থানীয় একটি পত্রিকায় খবরটা ছাপতে দিলাম আমরা। পরিকল্পনা করলাম মহামান্য রাজার সঙ্গে বুটার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

তিন দিনের দিন বুটার মা এল গাঁ থেকে। বয়স ষাটের কোঠায়, শক্তপোক্ত গড়নের কৃষক নারী। ছেলের মতই মোটা

ঠোঁট, ছোট ছোট ঝাপসা চোখ। সে ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছে। আমরা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, বুটার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমাদের কথায় আমল দিতে চাইল না বৃদ্ধা। বলল, 'আমি একা খামারের দিকে নজর দিতে পারি না, বাপু। ক্ষেত থেকে কে শেয়াল আর খরগোশ তাড়াবে? বুড়ো কুকুরটা মরে গেছে। আমার ছেলে ছাড়া কেউ নাই। আমি ওকে ছাড়া থাকতে পারব না।'

'বুড়ি মা, তোমার ছেলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবে আর তুমি তাকে আঁচলের তলায় লুকিয়ে রাখতে চাইছ! ওর থাকা উচিত শহরে, অজপাড়াগাঁয়ে নয়। পৃথিবীর মানুষ ওকে চিনবে। তুমি ওর জীবনের উন্নতির জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছ। এমন স্বার্থপর আর বোকার মত আচরণ কোরো না। ওকে আমাদের কাছে ছেড়ে দাও।' অনুনয় করলাম আমরা।

আমাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল সে। তবে চেহারা দেখে মনে হলো না বিশ্বাস করেছে। ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল বুড়ি, 'আমি আমার ছেলেকে ছাড়া থাকতে পারব না। ওকে নিয়ে যেতে এসেছি। নিয়ে যাবই।'

বিচারক যখন বললেন মহামান্য রাজার সঙ্গে বুটার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, রাজি হলো বৃদ্ধা। 'দুশ্চিন্তা কোরো না, মা,' বলল বুটা। 'আমি কিছুদিনের মধ্যেই সাত সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশে যাব। লণ্ডনে একশো মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার জিতব। সারা পৃথিবীর মানুষ আমাকে চিনবে। আমি ধনী হয়ে ফিরে আসব গাঁয়ে। শুধু লণ্ডন যাওয়ার একটা সুযোগ পেলেই হলো।'

পরদিন নিজের বাড়ি ফিরে গেল বুড়ি ছেলেকে রেখে।

শহরের প্রান্তে বিচারকের বাড়ি। বুটাকে তাঁর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হলো। বিচারক তাঁর বন্ধুদের নিয়ে বিকেলে তাস খেলেন আর বুটা বারান্দায় বসে থাকে একা নিজের ভাবনায় মগ্ন

হয়ে। আমরা দুটো চিঠি পাঠিয়েছি। একটা পাতিয়ালার স্পোর্টস কর্মকর্তার কাছে, অন্যটি মহারাজাকে। তাঁদের জবাবের অপেক্ষা করছি। সকাল বেলা বুটা লম্বা লম্বা পা ফেলে ডাকঘরে যায় বিচারকের চিঠিপত্র নিয়ে আসতে। মাঝে মাঝে বিকেলে সে বাজারে যায় পান, সিগারেট কিংবা লেবু কিনতে, বিচারকের তাসখেলার সঙ্গীদের জন্য। যারা বিচারকের বাড়ি আসে বেড়াতে তারা বুটাকে দেখে, কেমন ঝিম মেরে আছে ছেলেটা। আগের সেই তেজ যেন নেই শরীরে। এভাবে তিন হপ্তা গেল। বুটার মনে হলো তিন মাস।

একদিন সে আমাকে বলল, 'সার, আমি এক লোককে চিনি। সে একসময় পাতিয়ালার মহারাজার দরবারে কাজ করত। এখন ফরিদকোটে আছে। মহারাজার সঙ্গে তার ভাল খাতির। তার কাছে গেলে সে মহারাজার সঙ্গে আমাকে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। তারপর আমি বিদেশ যেতে পারব।'

এক হপ্তা পর ফরিদকোটে গেল বুটা।

এর কিছুদিন পরে শুনলাম, পাতিয়ালা গেছে বুটা। নানাজনকে ধরে সে নাকি মহারাজার ব্যক্তিগত কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করেছে। লোকটা তাকে মহামান্যের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবে বলেছে।

এ ঘটনার কিছুদিন পর দেশ ভাগ হয়ে গেল। আমি চলে এলাম দিল্লি। বুটার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ রইল না।

১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময়। উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল তখন দেশ ভ্রমণ করছেন, বৈঠকে বসছেন যুবরাজদের সঙ্গে।

আমি ওইদিন পাতিয়ালায় ছিলাম। বিরাট শোভা যাত্রা। সর্দার প্যাটেল এবং মহারাজা খোলা একটি গাড়িতে পাশাপাশি বসেছেন। নানা রঙের পাগড়ি মাথায় লোকজন ভিড় করে

দাঁড়িয়েছে রাস্তায়। ভিড়ের মধ্যে বুটাকে দেখতে পেলাম। সামরিক বাদকরা ঝকমকে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে আগে আগে চলেছে, পেছনে মহারাজার গাড়ি এগোচ্ছে ধীর গতিতে। দৃশ্যটা দেখছে বুটা।

বুটার কাছে এগিয়ে গেলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম সাক্ষাৎকারের কী হলো। বলল, 'এ মুহূর্তে রাজা রাজ্য সংক্রান্ত জরুরি কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ততা একটু কমলেই ওঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

দিল্লী ফিরে এলাম আমি। তারপর দু'বছর আর বুটার সঙ্গে দেখা নেই। যদিও ওর খবরাখবর পাচ্ছিলাম। সে সাক্ষাতের জন্য এখনও অপেক্ষা করছে পাতিয়ালায়। কিন্তু মহারাজার ব্যস্ততা কমছে না কিছুতেই। মহারাজার ব্যক্তিগত কর্মচারী বুটাকে পাতিয়ালায় একটা চাকরি দেয়ার কথা বলেছে। বুটা বলেছিল সে গাঁয়ে ফিরে যাবে। কর্মচারী বলেছে গাঁয়ে গিয়ে অলস সময় না কাটিয়ে বুটা ইচ্ছে করলে পাতিয়ালার চাকরিটা নিতে পারে, এতে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হবে এবং অলিম্পিকে যেতে পারবে বুটা। বুটা এ সুযোগ হারাতে চাইল না। রাজকীয় রান্নাঘরের দারোয়ানের চাকরিটা নিল। বেতন যদিও খুবই কম। অবশ্য ওর করার মত কাজও নেই তেমন। সারাদিন একটা টুলে বসে থাকা আর হাই তোলা। মাঝে মাঝে বাগানে ঘুরে বেড়ায় বুটা।

বুটার মা আবার এল ছেলেকে গাঁয়ে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য। কিন্তু শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়া বুটা ফিরিয়ে দিল তার মাকে। বলল, নানা কারণে মহারাজার সাক্ষাৎ পেতে দেরি হচ্ছে বটে, তবে তাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে একবার লণ্ডন যেতে পারলেই। বুড়িকে সে গত তিন মাসের বেতন দিয়ে দিল। আঁচলে টাকাটা বেঁধে গাঁয়ে ফিরল মা।

বুটা তার চাকরি নিয়েই থাকল। বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত

হয়ে পড়ে সে। কাঁহাতক আর পাথর হয়ে বসে থাকা যায়? তার ইচ্ছে করে বাজারে যেতে, ঘুরে বেড়াতে। একদিন সারাদিন সে ডিউটি করল না। সাথে সাথে নালিশ চলে গেল ম্যানেজারের কাছে, সেখান থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে। ডেকে পাঠানো হলো বুটাকে। তীব্র ভর্ৎসনা করা হলো। হুমকি এল আবার এরকম কাণ্ড করলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে তাকে। তা হলে আর কোনওদিন অলিম্পিকের খেলায় অংশ নিতে পারবে না বুটা।

ভয় পেল বুটা। চোখ পিটপিট করে জানাল এমন কাজ সে আর জীবনেও করবে না। তারপর থেকে সে সতর্ক এবং নিয়মানুবর্তী হয়ে গেল।

বছরখানেক পরে আমি আবার পাতিয়ালায় গেলাম বিচার বিভাগের একটি মামলার সাক্ষী হতে। ক্লান্ত একটি দিন শেষে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, অপেক্ষা করছি গাড়ির জন্য, একটা সাইকেল-রিকশা দেখতে পেলাম। ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে এদিকেই।

রিকশার পাশে লাঠি হাতে হাঁটছে এক বৃদ্ধা। রিকশাটা কাছে আসতে লক্ষ করলাম, ভেতরে বসে আছে বুটা। পরনে খাকি হাফপ্যান্ট, পায়ে চকচকে একজোড়া চামড়ার জুতো। শার্ট এবং পাগড়িটা নতুন। আমাকে দেখে হাসল সে। চালক রিকশা থামাল।

'কেমন আছ, বুটা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে আর আপনাদের আশীর্বাদে ভালই আছি। ধন্যবাদ,' জবাব দিল সে। 'মহামান্য রাজা এখন চাইল-এ, তাঁর গরমের ছুটি কাটানোর প্রাসাদে আছেন। উনি ওখান থেকে ফিরে এলেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমার নাম তালিকায় সবার উপরে...শুনেছি আসছে শরতে লণ্ডনে খেলার একটা দল যাচ্ছে। আশা করি দলটার সঙ্গে আমিও যেতে পারব...'

ওর দিকে তাকালাম আমি। জানতে চাইলাম রিকশা করে কোথায় যাচ্ছে।

বুড়ি মানে বুটার মা বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গুঙিয়ে উঠল, 'কী বলবরে বাপ! আমার বুটা ছিল পাখির মত মুক্ত। দারোয়ানের টুলে সারাক্ষণ বসে থাকা কী ওর পক্ষে সম্ভব? সারাদিন টুলে বসে থাকতে থাকতে ওর উরু আর হাঁটুতে রক্ত জমে গেছে। দ্যাখো, কেমন ফুলে গেছে পা জোড়া! হা ভগবান, আমার বুটার এখন কী হবে!'

বুকে চাপড় দিয়ে কেঁদে উঠল বৃদ্ধা, 'পা সারাতে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।'

বুটার হাঁটু দেখলাম আমি। ঢালের মত হাঁটু ফুলে ঢোল হয়ে আছে।

বুনো চোখের দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকাল বুটা। বলল, 'ডাক্তার বলেছেন ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি দিয়ে আমার চিকিৎসা করবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে আমার হাঁটু সেরে যাবে। আমি আবার দৌড়াতে পারব। তারপর, সার, আমি লণ্ডন যাব। একশো মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেব...'

রিকশাটা ধীর গতিতে আবার চলতে লাগল। আমি মা আর ছেলে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকলাম।

মূলঃ বলবন্ত গার্গি
রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

আট নম্বর

প্রায় আশি মাইল বেগে চলছিলাম, কিন্তু সামনের বিস্তৃত রাস্তার তুলনায় তা হাস্যকর গতি মনে হচ্ছিল।

লাল চুলো ছেলেটার চোখ গাড়ির রেডিও শুনতে শুনতে একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কী যেন ঝিলিক দিয়ে গেল ওর চোখে। খবর শেষ হতেই ভলিয়্যুম কমিয়ে দিল।

হাত দিয়ে মুখের পাশে মুছল সে।

'এ পর্যন্ত ওরা সাতজনের মৃতদেহ পেয়েছে।'

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

'আমিও শুনছিলাম,' বললাম। ড্রাইভিং হুইল থেকে এক হাত সরিয়ে পিঠের পিছনে ঘষলাম। আড়ষ্ট ভঙ্গিটা দূর করার চেষ্টা।

সে আমাকে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখল। 'ভয় পাচ্ছ?' মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল।

ঝট্ করে ওর দিকে তাকালাম।

'না, ভয় পাব কেন?'

ছেলেটা হাসতেই থাকল।

'পুলিশ এডমন্টনের চারপাশের সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে।'

'শুনেছি।'

ছেলেটা প্রায় খিলখিল করে হাসছে।

'ওদের পক্ষে একটু বেশিই স্মার্ট ছেলেটা। কোনও লাভ নেই।'

ওর কোলের ওপর রাখা ব্যাগটার দিকে তাকালাম। কী আছে

ভেতরে?

'দূরে যাচ্ছ?'

সে মাথা ঝাঁকাল। 'জানি না।'

ছেলেটা সাধারণের তুলনায় একটু খাটোই হবে, আর শরীরের গড়নও খুব একটা শক্তিশালী না। দেখতে মনে হয় সতেরোর মত বয়স হবে, তবে বলা যায় না আরও পাঁচ বছর বেশিও হতে পারে। মুখের গড়নটা বাচ্চাদের মত—বয়স সহজে বোঝা যায় না।

প্যান্টের ওপর হাতের তালু ঘষল সে।

'কখনও ভেবেছ কেন সে এরকম করে?' বলল।

রাস্তা থেকে চোখ সরালাম না।

'না।'

সে ঠোঁট ভেজাল।

'হয়তো অতিরিক্তই করা হয়েছিল তার প্রতি। সারা জীবনই অন্যে তার উপর জোর চালিয়েছে। লোকের অবিরাম আদেশ আর নিষেধ তাকে সহ্যের শেষ সীমায় নিয়ে গেছে। সবসময় অন্যে কথার ছড়ি ঘুরিয়েছে তার উপর।'

ছেলেটা সামনের দিকে তাকাল।

'অবশেষে তার রাগের বিস্ফোরণ ঘটেছে। মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা তো আছে! তার বাইরে গেলে কিছু একটা হওয়ারই ছিল।'

এক্সিলারেটার থেকে পা সরালাম।

সে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল

'গাড়ি থামাচ্ছ কেন?'

'তেল ফুরিয়ে আসছে,' আমি বললাম।

'গত চল্লিশ মাইলের মধ্যে একটাও তেলের পাম্প পড়েনি। সামনেরটা থেকে না নিলে আরও চল্লিশ মাইল ওই তেলে চলবে না।'

রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে পেট্রোল পাম্পে ঢুকে পড়লাম।

একজন বয়স্ক লোক কাছে এগিয়ে আসল।

'ট্যাংক ভর্তি করো,' বললাম।

'আর তেলের কী অবস্থা দেখে নিয়ো আগে।'

ছেলেটা খুব মনোযোগ দিয়ে পাম্প দেখছে। ছোট্ট একটা বিল্ডিং, দু'পাশের এক সমুদ্র গম ক্ষেতের মাঝে একমাত্র কাঠামো।

গাড়ির জানালার দিকে তাকালাম। ধুলোয় ধূসরিত। পরিষ্কার করা দরকার।

পাম্পের একপাশে একটা দেয়াল ফোন চোখে পড়ল।

ছেলেটা অধৈর্যের সাথে একটা পা ঠুকল।

'বুড়োটা বড্ড বেশি দেরি করছে। অপেক্ষা করা আমি পছন্দ করি না।' পাম্পের লোকটাকে দেখা যাচ্ছে গাড়ির হুড তুলে তেল চেক করতে।

'এত বয়সের একজনের বেঁচে থাকার দরকারটা কী? মরলেই মানাত ওকে।'

একটা সিগারেট ধরালাম।

'ও তোমার সাথে একমত হবে বলে মনে হয় না।'

ছেলেটার চোখ আবার ফিলিং স্টেশনের দিকে গেল।

'ওই তো একটা ফোন দেখা যাচ্ছে।' সে হাসল। 'কাউকে ফোন করতে ইচ্ছা করছে? চাইলে করো।'

সিগারেটের এক রাশ ধোঁয়া ছাড়লাম।

'না।'

বুড়ো লোকটা যখন ভাংতি পয়সা ফেরত দিতে এল, ছেলেটা জানালার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

'রেডিও হবে আপনার কাছে?'

লোকটা মাথা নাড়ল। 'না। আমি কোলাহলমুক্ত থাকতেই পছন্দ করি।'

ছেলেটা হাসল।

'ঠিক বলেছেন। চুপচাপ থাকলে বেশিদিন বাঁচবেন।'

রাস্তায় আবার বের হয়ে স্পিড আশি মাইলে তুললাম।

ছেলেটা কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল। তারপর বলল, 'সাতজনকে খুন করতে কলিজা লাগে। জীবনে কখনও পিস্তল ধরে দেখেছ?'

'প্রায় সবাই-ই ধরেছে।'

ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁত দেখা যাচ্ছে ছেলেটার।

'কারও দিকে তাক্ করেছ কখনও?'

আমি ওর দিকে তাকালাম।

চোখগুলো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

'লোকে তোমাকে ভয় পেলে মন্দ লাগবে না, বিশ্বাস করো।'

'পিস্তল থাকলে তুমি আর খাটো থাকো না।'

'না,' বলল।

ছেলেটা খাটো, তা আগেই দেখেছি। উচ্চতা কত হবে অনুমান করার চেষ্টা করলাম।

'তুমি আর পুঁচকে ছেলেটি নও। হতচ্ছাড়া বদমাশও না।'

ওর চোখে কী যেন ঝিলিক দিয়ে গেল।

'পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা লোকটা তখন তুমি!'

'ঠিক, যতক্ষণ না অন্যেরও একটা পিস্তল থাকে।'

'ভাল বলেছ তো! হা হা!'

'তবে খুন করতে কিন্তু বুকের পাটা লাগে, জানো তো?' ছেলেটা আবার বলল।

'অনেক লোকই তা জানে না। খুন হওয়াদের মধ্যে পাঁচ বছরের একটা বাচ্চাও আছে।' বললাম আমি।

'তাতে তোমার এত আপত্তি কেন?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল সে।

'হতে পারে ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিল?'

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

'কেউ তা মনে করছে না।'

ওর চোখে একটু অনিশ্চয়তার ছায়া পড়ল।

'ও একটা বাচ্চাকে হত্যা করবে মনে করছ কেন?'

'কী জানি, বলা কঠিন,' বললাম। 'সে শুরু করেছে একজনকে হত্যা করে। তারপর আরেকটা, তারপর আরও একটা। হয়তো কিছু সময় পরে কে খুন হলো দেখার ধৈর্যই থাকল না ওর? পুরুষ, মহিলা, বা না হয় বাচ্চাই হলো? তার কাছে তো একই ব্যাপার।'

ছেলেটা মাথা ঝাঁকাল।

'আসলে একটা আলাদা মজা চলে আসে। ব্যাপারটা অত কঠিন না। প্রথম কয়েকটার পরে, কোনও কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না। কাজটা ভাল লাগতে শুরু করে। যতই হোক, লোকগুলো একদিন না একদিন তো মরতই। কয়েক দিন আগেই না হয় মরল। তার বিনিময়ে যদি একজনকে মজা দেয়া যায়, ক্ষতি কী?'

গাড়ি ঝড়ের বেগে চালাচ্ছি। আরও মিনিট পাচেক চুপচাপ থাকল সে।

'তারা ওকে কখনও ধরতে পারবে না। সে ওদের চেয়ে একটু বেশিই স্মার্ট।'

রাস্তা থেকে কিছু সময়ের জন্য চোখ সরালাম।

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে? পুরো দেশটা ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। সবাই জানে ও দেখতে কেমন।'

ছেলেটা অনীহার ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচু করল।

'হয়তো ওর কিছু আসে যায় না এতে। ওর করার ছিল, তাই করেছে। আরও করবে, আমি জানি। লোকে বলতে বাধ্য হবে, ও কিছু করে দেখাবার ক্ষমতা রাখে।'

পরের এক মাইল একটা শব্দও না বলে পার হলাম। তারপরই গাড়ির সিটে ছেলেটা নড়েচড়ে বসল।

'রেডিওতে ওর বর্ণনা শুনেছ?'

'অবশ্যই,' বললাম আমি। 'গত পুরো সপ্তাহ জুড়েই।'

সে আমার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকাল।

'তাই? তারপরও আমাকে গাড়িতে তুলতে ভয় করেনি?'

'না।'

ছেলেটার মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা।

'ইস্পাত-দৃঢ় নার্ভ তো তোমার?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'না। ভয় পাওয়ার অবস্থা হলে ঠিকই ভয় পাই।'

ওর চোখ আমার ওপর স্থির।

'রেডিওর বর্ণনার সাথে আমি পুরোপুরি মিলে যাই।'

'হ্যাঁ।'

যতদূর চোখ যায় খালি রাস্তা চলে গেছে সামনে। দু'পাশে ধু ধু সমতল মাঠ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না। একটা বাড়িও না। কোনও গাছ পর্যন্ত না।

ছেলেটা হাসল।

'ঠিক খুনীটার মতই দেখতে আমি। সবাই ভয় পায়। ভাল লাগে আমার।'

'আশা করি ব্যাপারটা উপভোগ করেছ,' আমি বললাম।

'গত দুইদিনে এ রাস্তায় তিনবার পুলিশ আটকেছে আমাকে। খুনীর যোগ্য প্রচারই দেয়া হয় আমাকে। আমি সন্তুষ্ট।'

'বুঝতে পারছি,' বললাম। 'জানি তুমি প্রচার আরও পাবে,' যোগ করলাম। 'আমার মনে হচ্ছিল এ হাইওয়ের কোথাও তোমার সাথে দেখা হয়ে যাবে। দুর্ভাগ্য পিছু পিছু চলেই আসে।'

গাড়ির গতি কমিয়ে আনলাম।

'দয়া করে আমার ব্যাপারেও একটু চিন্তা করো। আমিও কি বর্ণনার সাথে মিলে যাই না?'

ছেলেটা প্রায় চুকচুক শব্দ করল।

'আহা! ওই বাদামী চুল নিয়ে? ওর চুল তো লাল। এই যে

আমারটা দেখো।'

আমি হাসলাম।

'কিন্তু আমি তো চুলে কৃত্রিম রঙও লাগাতে পারি?'

ছেলেটার চোখগুলো বড় বড় হয়ে উঠল, যখন বুঝতে পারল কী ঘটতে চলেছে।

ও হতে যাচ্ছে আট নম্বর।

মূলঃ জ্যাক রিচি

রূপান্তরঃ মুহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন

স্কুল-পরিদর্শক

গাঁয়ের এক লোক তার লাঙল নিয়ে ছুতোরের বাড়ি যাচ্ছিল। স্কুল-পরিদর্শক তাকে রাস্তায় থামালেন। জিজ্ঞেস করলেন স্কুলের কথা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে কোথাও একটা স্কুল আছে শুনেছি। সম্ভবত গ্রামের বাইরে।' সে একটা রাস্তার দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

রাস্তা বা মেঠোপথটা কাদায় ভরা। স্যাণ্ডেলে লেগে ছিটকে ওঠে কাদা। মাটির কুটিরগুলোর পাশ দিয়ে পানির সরু ধারা বয়ে এসে কর্দমাক্ত করে তুলেছে পথটাকে। ধুলোও বিস্তর। রাস্তাটা হঠাৎ করেই মাঠের কিনারে এসে শেষ হয়ে গেছে। দুটো মাঠের মাঝখানের আল ধরে এগোলেন পরিদর্শক। চোখে পড়ল সাইকেলে চড়ে এদিকেই আসছে একজন। স্কুল পরিদর্শক তাঁর কাছাকাছি এগিয়ে যেতে সে নেমে পড়ল সাইকেল থেকে, সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল একপাশে।

'স্কুলটা কোন্ দিকে?'

'স্কুল?'

'হুঁ।'

'শিশাম গাছটা দেখছেন না?' বেশ কয়েকটা মাঠের পরে, বড় একটা গাছের দিকে ইঙ্গিত করল সাইকেলঅলা। 'স্কুলটা ওই গাছের নীচে।'

'আমার সঙ্গে একটু যাবেন? দেখিয়ে দেবেন?'

শহুরে-বাবুকে সাহায্য করার আনন্দে তৎক্ষণাৎ রাজি সে।

ছাত্র কিংবা শিক্ষক, অথবা কোনও চাষা যদি তাকে বাবু'র সঙ্গে দেখে, গাঁয়ে তার সম্মান বেড়ে যাবে এক লহমায়। ভাবতেই বুকটা ফুলে উঠল। তারা একসঙ্গে হাঁটতে শুরু করল।

'খুব ভাল মানুষ, সারজী। মাস্টারের কথা বলছি। অনেক পরিশ্রম করে।'

স্কুল-পরিদর্শক কোনও মন্তব্য করলেন না। জেলায় জেলায় স্কুল পরিদর্শনের এ কাজটা প্রায় শেষের দিকে। তিনি স্কুল-পরিদর্শনের জন্য কোথায় না গেছেন– নোংরা শহর, বোটকা গন্ধ অলা মহল্লা, প্রত্যন্ত গ্রাম, যেখানে তাঁর জীপ ঢোকে না। আর এরা আছেও কত দুর্দশায়। দেখলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। গত তিন বছরে এ পরিবেশের সঙ্গে তাঁর খাপ খাইয়ে নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা পারেননি। প্রতিটি স্কুল তাঁর মন খারাপ করে দিয়েছে। স্কুলগুলোতে সাপ্লাই নেই, মানুষজন তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পড়াতে যেতে দিতে আগ্রহী নয়, নির্বোধ ছাত্র, পরাশ্রয়ী শিক্ষক। কিন্তু তিনি কী করবেন? তাঁকে শুধু সুপারিশ করতে বলা হয়। তাঁর প্রতিটি সুপারিশ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ প্রত্যাখ্যান করে। এরা পরিকল্পনা করে কম, উন্নয়ন তো আরও কম।

সবুজ গমের শীষে ভরা, কর্ষিত মাঠ ধরে এগিয়ে চলেছে দু'জনে। এক জায়গায় জমিন খানিকটা ঢালু। ওখানে পানি জমে ছোটখাট পুকুর সৃষ্টি হয়েছে। পানির মধ্যে পোকা-মাকড় ভাসছে, পানির উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে। ওরা পুকুরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বিনবিন গুঞ্জনে পোকামাকড়ের ঝাঁক ঘিরে ধরল দু'জনকে। তার সঙ্গী চাষা লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। চলার তালে সাইকেলের ঢিলে ঘণ্টা ঢং ঢং শব্দে বাজছে। লোকটার বর্ণহীন পায়ের জুতোয় অসংখ্য তাপ্পি, গোড়ালির দিকটা ফাটা। দ্রুতগামী সঙ্গীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে স্কুল-পরিদর্শকের কষ্টই হচ্ছে। ওরা একটি শস্য খেত পার হলো। এর পরেই সেই শিশাম গাছ।

মাঠের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে গাছটি। ছায়া ছড়াচ্ছে। এ মাঠের জমি কর্ষণ করা হয়েছে। গাছের নীচে বা আশপাশে দেখা যাচ্ছে না কাউকে। হতাশ হলো চাষা।

'স্কুলটা এখানেই ছিল। আমি নিশ্চিত। জমিতে ফসল বোনার আগে অন্তত।'

'তো?'

'স্কুলটা বোধহয় কোথাও তুলে নিয়ে গেছে।'

'কিন্তু দালানটা?'

'দালান?'

'দালান নেই? স্কুলের দালান?'

'না, সাহেব, কোনও দালান-টালান নাই। মাস্টার যেখানে যায়, তার সঙ্গে স্কুল যায়। সে স্কুলটাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে।' দু'জনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছে কী করবে, চাষা কয়েক মাঠ দূরে এক লোককে দেখতে পেল। হাতে নিড়ানি।

'ওই মিয়া,' চেঁচিয়ে ডাকল সে। ঝুঁকে নিড়ানি নিয়ে কাজ করছিল লোকটা, হাঁক-চিৎকার শুনে সিধে হলো। চোখে রোদ পড়ছিল, হাত দিয়ে কপাল ঢাকল সাইকেল অলা। 'মিয়া। স্কুলটা কই? শহর থেকে সাহেব এসেছেন স্কুলের খোঁজে।'

'স্কুল? আজ সকালে ছেলেগুলোকে আখ খেতের ওদিকে যেতে দেখেছি,' চেঁচিয়ে জানাল সে।

আখ খেত ঘন। প্রচুর আখ ফলেছে। গাছের কাণ্ডগুলো ধূসর-সবুজ, গায়ে মেরুন রঙের ছোপ। বাতাসে দুলছে। খেতের ওপাশে আরও মাঠ, কর্ষিত এবং প্রস্তুত। চারদিকে চোখ বুলাল ওরা। দেখা যাচ্ছে না কাউকে।

'ও তো আখ খেতের কথাই বলল,' বিমূঢ় দেখাল চাষাকে।

'হুঁ,' বললেন স্কুল-পরিদর্শক। ক্লান্ত কণ্ঠ।

'মনে হয় মাঠের ওই পাশে হবে।'

'শোনেন, আপনি যান। গিয়ে দেখেন। স্কুলের খোঁজ পেলে

আমাকে জানাবেন' ভুরুর ঘাম মুছলেন স্কুল-পরিদর্শক।

সাইকেল মাটিতে শুইয়ে রেখে লম্বা পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল তার মালিক। স্কুল-পরিদর্শক রাস্তার ওপর বসে পড়লেন। তারপর একে একে দেখলেন বাদামি জমিন, ফসল, ঝকঝকে নীল আকাশ। এক ফোঁটা মেঘ নেই। দূরের গাছ থেকে ভেসে এল কাকের 'কা কা', কেউ ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, অনেক উঁচুতে উড়ছে ওগুলো। কিচমিচ শব্দ তুলে উড়ে গেল একঝাঁক পাখি।

একটা চিৎকার শোনা গেল। ঘুরলেন তিনি। সাইকেলঅলা ছুটে আসছে তাঁর দিকে। হাত নাড়ছে। স্কুল-পরিদর্শক সিধে হলেন। শরীরের পেশীগুলো আড়ষ্ট। সারাদিন অফিসে বসে থাকতে থাকতে জং ধরে গেছে গায়ে। অফিসে বসে থাকেন তিনি, জীপেও তাই, স্কুল পরিদর্শনে গেলেও বসেই থাকতে হয়।

'পেয়েছি,' হাস্যোজ্জ্বল মুখে জানাল চাষা। স্কুল-পরিদর্শককে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সে মাঠের মাঝ দিয়ে।

ইতস্তত বোধ করছেন স্কুল-পরিদর্শক। এখন আখের মাঠে তাঁর কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নেয়া হলেও তিনি কিছু করতে পারবেন না। তাঁর কোনও সাক্ষী নেই। আখের সবুজ, ধারাল ডগা বাড়ি খাচ্ছে মুখে এবং হাতে। মুখ রক্ষা করতে হাতজোড়া ঢালের মত ব্যবহার শুরু করলেন তিনি। মাটি বেশ শক্ত। বারকয়েক হোঁচটও খেলেন। খেতের মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে, নগ্ন মাটিতে পা মুড়ে বসে পড়াশোনা করছে জনা চল্লিশেক ছাত্র। ওদের বসার জন্য এমনকী ছালাও নেই। নিচু মাথাগুলোর বেশিরভাগ স্লেটে আঁক কাটতে ব্যস্ত। কেউ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখছে, কেউ বা বোর্ড বা কাঠের ফলকে। কয়েকটি বোর্ড আখের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা। কাঁচা কালি শুকোচ্ছে রোদে। এক বৃদ্ধ, ভাঙাচোরা একটা চেয়ারে বসেছেন তাঁর ছাত্রদের মাঝখানে। হাতে একটি লাঠি। দেখলেই বোঝা যায় চেয়ারখানা বহুবার মেরামত করা হয়েছে কোথাও কোথাও কাঠ

ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে পেরেক। স্কুল-পরিদর্শককে দেখে চেয়ার ছাড়লেন বৃদ্ধ। নগ্ন পা।

'ক্লাস, ট্যাণ্ড,' ইংরেজিতে হুকুম দিল ক্লাস ক্যাপ্টেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল, কুর্তার নীচের অংশ থেকে ধুলো ঝাড়ছে। স্কুল-পরিদর্শককে দেখে মাস্টার সাহেব রীতিমত অভিভূত। কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল তাঁর নিজেকে সামলে নিতে। তিনি কাঁধের কাপড়টা দিয়ে ত্রস্ত হাতে ঝেড়ে দিলেন চেয়ার পরিদর্শককে বসতে দেয়ার জন্য। সাইকেলঅলা ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল। স্কুল-পরিদর্শক তাকে ধন্যবাদ দিলেন। সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'হুজুর এসেছেন! কী সৌভাগ্য আমাদের! হুজুর!'

'তা হলে এই হলো আপনার স্কুল?' ভুরু কুঁচকে চারদিকটা একবার দেখে নিলেন স্কুল-পরিদর্শক। ঢোক গিললেন মাস্টার। 'জী, সাব।'

'আপনি ওদেরকে কী শেখান?' তিনি মাস্টারকে ঢোক গিলতে দেখছেন।

'উর্দু, অংক, ইংরেজি এবং হাতের লেখা, সার।'

'স্কুলের বই থেকে?'

'স্কুলের বই থেকে, সারজী।' চেয়ারের নীচে রাখা ছেঁড়া, কাদামাখা কতগুলো বই তুলে নিয়ে পরিদর্শকের হাতে তুলে দিলেন মাস্টার।

স্কুল-পরিদর্শক উর্দু টেক্সট বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। থেমে গেলেন একটি অধ্যায়ে এসে। এক ছাত্রকে বললেন পড়তে। ছেলেটা হতবুদ্ধি চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

'সারজী, বইটা চতুর্থ শ্রেণীর। আর ও পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে।'

'এখানে কোন্ ক্লাস পর্যন্ত পড়ানো হয়?'

'সিক্স, সারজী। ক্লাস ওয়ান থেকে সিক্স, আর এরা ক্লাস ফোরের ছাত্র।' লাঠি তুলে দেখালেন শিক্ষক।

'তুমি পড়ো।' স্কুল-পরিদর্শক হুকুম করলেন এক ছাত্রকে।

উঠে দাঁড়াল ছেলেটি। পড়তে শুরু করল। পরিষ্কার, জড়তাহীন উচ্চারণ। কোথাও বাধল না। বিন্দুমাত্র বিড়বিড় করল না। নির্ভুলভাবে পড়ে গেল সে। বোঝা যাচ্ছিল শিক্ষকের আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত।

'অন্য কোনও ক্লাসকেও কিছু করতে বলুন, সারজী,' অনুরোধ করলেন মাস্টার।

পরিদর্শক দ্বিতীয় শ্রেণীকে কিছু অঙ্ক কষতে দিলেন। বেশিরভাগ ছাত্র নির্ভুল অঙ্ক করল। ক্লাস ওয়ানের এক ছেলে সামনে-পেছনে দুলে, গানের ভঙ্গিতে তরতর করে বলে গেল ইংরেজি বর্ণমালা, ঠেকল না কোথাও। ক্লাস সিক্সের একটি ছেলে চমৎকার আবৃত্তি করল 'ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ...' সে-ও ছড়াটি শেষ করল গানের ঢঙে। স্কুল-পরিদর্শক কোনও প্রাইমারি স্কুলে এত উঁচু মানের পড়াশোনা দেখেননি। ছাত্রদের পারফরমেন্সে তিনি খুবই সন্তুষ্ট। সন্তুষ্ট শিক্ষকের উপরেও। চেয়ার ছাড়লেন পরিদর্শক। ক্যাচ-কোচ শব্দে তীব্র আপত্তি জানাল ওটা।

'ক্লাস, ট্যাণ্ড,' হুংকার ছাড়ল ক্লাস মনিটর। আগের চেয়েও উচ্চকিত শোনাল তার কণ্ঠ। স্কুল-পরিদর্শক চলে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। মাস্টার হাতে লাঠি নিয়ে তাঁর পেছন পেছন এগোলেন। এ ঘটনা তাঁর গাঁয়ে বেশ আলোড়ন তুলবে। কয়েকদিন গল্প করার খোরাক পেয়ে যাবে গ্রামবাসী।

মাঠ থেকে বেরিয়ে প্রশ্ন করলেন পরিদর্শক, 'আপনি বার বার স্কুল বদল করেন কেন? ঘর ভাড়া করে ক্লাস করতে পারেন না?'

'ঘর ভাড়া, সারজী?'

'হ্যাঁ। একটা ঘর ভাড়া করলেই হয়।'

'কেউ আমাদের ঘর দেবে না, সাব। ওরা এখানে স্কুল হোক তা-ই চায় না। অনেকবার এ ব্যাপারে তারা আপত্তি জানিয়েছে। বহুবার। ওদের ধারণা তাদের সন্তানরা সময় নষ্ট করছে। কাজ

করার সময়ে মজা করছে। তাদের ধারণা; বাপকে মাঠে ফসল বুনতে কিংবা গরু চড়াতে সাহায্য করার বদলে স্কুলে এসে ছেলেপিলেরা বেহুদা সময় কাটাচ্ছে। শুধু গাঁয়ের মোড়ল চৌধুরী আলী মোহাম্মদই আমাদের প্রতি যা একটু সদয়, সারজী। তিনি মনে করেন শিক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর পক্ষে আমাদের ঘর কিংবা জমি দেয়া সম্ভব নয়। তবে তিনি গতবার শিশাম গাছের নীচে আমাদের পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মাঠে ফসল বোনার সময় হলে আমরা ওখান থেকে চলে আসতে বাধ্য হই। এবারে আখ খেতটা ব্যবহার করছি পড়ালেখার জন্য।'

'উনি খেতের মাঝখানটা আপনাদের জন্য পরিষ্কার করে দিয়ে ভাল কাজ করেছেন।'

'জী, সারজী। তিনি ভাল কাজ করেছেন। আমি আর আমার ছাত্ররা মিলে ওই এলাকায় তাঁর আখের গাছ লাগিয়েছি। তিনদিন লেগেছে। এমনকী ক্লাস ওয়ানের ছেলেরাও কাজ করেছে। সকাল আটটা থেকে মাগরেবের আজান পর্যন্ত একটানা কাজ করেছি। আমরা আখ বাণ্ডিল করে বেঁধে চৌধুরীর গরুর গাড়িতে তুলে দিয়েছি। চৌধুরী বলেন, আমাদের অবশ্যই শিক্ষার মূল্য দিতে হবে। আমরা তাই কাজ করেছি।' মাস্টার মাথার সাদা পাগড়িটি খুলে ফেললেন। মেহেদি মাখানো চুল তাঁর। মাথার মাঝখানে টাক পড়ে গেছে। চোখে পানি। কথা বলার সময় কর্কশ শোনাল কণ্ঠ।

'আখের বোঝা বইতে গিয়ে আমি আমার চুল হারিয়েছি,' মাথায় আবার পাগড়ি চাপালেন বৃদ্ধ, তাকালেন অন্যদিকে। হাঁটতে লাগলেন ওঁরা। স্কুল-পরিদর্শক রাস্তা ধরে, মাস্টার তাঁর পাশে, মাঠ দিয়ে।

'সারজী, আমরা যদি পড়াশোনা করার জন্য শুধু একটি ঘর পেতাম। একটি ঘর।' শান্ত গলায় বললেন তিনি। 'নিদেন একখণ্ড জমি। ছেলেপিলেদের নিয়ে ওখানে একটি ঘর তুলতে পারতাম।

গোটা একটা মাস হয়তো সময় লাগত। কিন্তু ঠিকই ঘর তুলে ফেলতে পারতাম।'

নীরবে হেঁটে চলেছেন স্কুল-পরিদর্শক।

'সারজী, আমি জানি জমির খুব দাম। তা ছাড়া কেউ স্কুল চায়ও না। কিন্তু তবু যদি একখণ্ড পাওয়া যেত, গাঁয়ের কোণে চামারদের একখণ্ড জমি আছে। ওটাও যদি পাওয়া যেত। খুব খুশি হতাম, সারজী। ঘর পাওয়া না গেলেও অন্তত জমি যদি পাওয়া যেত...'

নিশ্চুপ থাকলেন স্কুল-পরিদর্শক। তিনি ইতিমধ্যে মানসচক্ষে দেখতে পেয়েছেন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সরকার প্রাইমারি স্কুলের জন্য বিল্ডিং কিংবা জমি কোনওটাই দেয়নি। স্থানীয়দেরকেই ওটা জোগাড় করতে হবে। কাজেই সরকার কেন এখন তা পরিবর্তন করতে যাবে? আইন আইনই। এরকম বহু আইন আছে যা শতাব্দী ধরে চলে আসছে। স্বাধীনতায় এ আইনের কোনও হেরফের হয়নি। তখনও যা ভাল ছিল, এখনও তা ভাল। তা ছাড়া আর্থিক সাশ্রয়েরও একটা ব্যাপার আছে। পরিদর্শক কর্তা ব্যক্তিদের সমস্ত যুক্তি যেন শুনতে পাচ্ছেন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। ছোট্ট একখণ্ড জমি। এই-ই তো। এ বৃদ্ধের মত শিক্ষার প্রতি নিবেদিত প্রাণ আর কে আছেন? ছাত্রদের নিয়ে এরকম কে চিন্তা করে? গত তিন বছরের অভিজ্ঞতায় এরকম আর কাউকে দেখেছেন বলে মনে পড়ল না। গাড়িতে উঠে পড়লেন স্কুল-পরিদর্শক। মাস্টারের সালামের জবাবে মাথা ঝাঁকালেন শুধু। চলে গেলেন গাড়ি নিয়ে। বৃদ্ধের চোখের দিকে তাকানোর সাহস হলো না তাঁর।

মূল: এম আতাহার তাহির
অনুবাদ: অনীশ দাস অপু

রেস্তোরাঁয় খুন

রাত একটা বাজতে এখনও বিশ মিনিট বাকি। রিভলভিং দরজা ঠেলে ভ্রাম্যমাণ রেস্তোরাঁর ভেতরে ঢুকল নেলসন। পেছনে সহকারী সেরেকি। ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর বোলাল তারা। খাপছাড়া একটা দৃশ্য। ছোট ছোট সাদা টেবিলগুলোর প্রায় সব ক'টাতেই খাবার সাজানো রয়েছে। অথচ খাওয়ার কেউ নেই। এক কোণে ভিড় করেছে একগাদা লোক। এক হয়ে আছে সবার কালো মাথা। মৌমাছির মত গুঞ্জন তুলেছে তারা। দু'একজন পেছন থেকে চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে সারসের মত গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে সামনে।

জোরাল একটা গুঞ্জন তুলে দু'ভাগ হলো ভিড়। একজন পুলিস বেরিয়ে এল সেই ফাঁক দিয়ে। এতক্ষণ ভিড়ের মধ্যেই ছিল সে। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এখন সরে যান তো আপনারা। এই টেবিলটা ছাড়ুন। কিছুই দেখার নেই। লোকটা মারা গেছে–ব্যস, এই।'

ভিড় আর দরজার মাঝামাঝি এসে দুই গোয়েন্দার সাথে দেখা হয়ে গেল পুলিসের। না বললেও চলত, তবু পুলিসটা বলল, 'ওই কোণে আছে লাশটা। মনে হচ্ছে– হজমের গণ্ডগোল।'

এই বলে গোয়েন্দা দু'জনের সাথে আবার ভিড়ের দিকে এগোল পুলিস। আবার দু'ভাগ হলো ভিড়। মাঝখানে সাদা ছোট টেবিলগুলোর একটি। একটা চেয়ারে পড়ে আছে একটা মানুষ।

মৃত। একজন অ্যাম্বুলেন্স ডাক্তার, স্ট্রেচারবাহী দুই লোক আর রেস্তোরাঁর ম্যানেজার আছে ওখানে।

'মারা গেছে?' ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল নেলসন।

'হ্যাঁ, আমরা একটু দেরিতে পৌঁছেছি এখানে,' নেলসনের কাছে সরে এল ডাক্তার। ফলে তার কথা আর কেউ শুনতে পেল না। 'লাশটা এখন মর্গে নিয়ে যাওয়াই ভাল। তারপর পোস্টমর্টেম করে দেখা যাক—কী হয়। আমার ধারণা বিষক্রিয়া। তার থুতনিতে সাদা কিছু একটা লেগে আছে, তা যাই হোক না কেন। আর মুখের নীচে আধ-খাওয়া যে স্যাণ্ডউইচটা চাপা পড়েছে, ওতেও ওই একই জিনিস। কাজেই ব্যাপারটা জানিয়ে রাখলাম আপনাদের। এখন যাই তা হলে। গুড নাইট।'

কনুই সোজা করে ভিড়ের মাঝ দিয়ে এগোল ডাক্তার। তার পিছু পিছু স্ট্রেচারবাহী দুই লোক।

খানিক পর ভীতিকর হেডলাইট জ্বেলে কোণে একটা চক্কর মেরে চলে গেল অ্যাম্বুলেন্স।

নেলসন এবার পুলিসকে বলল, 'দরজার কাছে গিয়ে আটকান সবাইকে। টেবিলের বাকি তিন খদ্দেরকে বের না করা পর্যন্ত কেউ যেন ফস্কে না যায়।'

ম্যানেজার বলল, 'ছোট এক ব্যালকনি আছে ওপরে। ওখানে গিয়ে দাঁড়ালে কি একটু সুবিধে হত না এখানকার চেয়ে?'

'হ্যাঁ, শীঘ্রিই যাওয়া হবে ওখানে,' সায় দিল নেলসন। 'তবে ঠিক এখুনি নয়।'

টেবিলের দিকে তাকাল নেলসন। চারজনের জন্যে খাবার দেয়া হয়েছে চারদিকে। দু'জন সবেমাত্র ছুঁয়েছে তাদের খাবার। একজন শেষ করেছে, শুধু এঁটো রয়েছে তার প্লেটগুলোতে। আর একটা খাবার খানিক আগে ঢাকা পড়ে ছিল আলুথালুভাবে উপুড় হয়ে থাকা একটি নিষ্প্রাণ দেহের আড়ালে। তার একটি হাত বেরিয়ে এসেছিল টেবিলের ওপর, আরেকটি নিস্তেজভাবে

ঝুলছিল মেঝে বরাবর।

'কে ছিলেন ওখানে?' অভুক্ত খাবার দুটোর একটা দেখিয়ে জানতে চাইল নেলসন। 'দয়া করে বেরিয়ে এসে পরিচয়টা দিন।'

কিন্তু নড়ল না কেউ।

'কী ব্যাপার, আসছেন না কেন?' গলা চড়িয়ে দিল নেলসন। 'আমরা কোনও প্রশ্ন করার আগেই বেরিয়ে আসুন ভালয় ভালয়।'

ভিড়ের পেছন দিয়ে বেরিয়ে এল কেউ। সেই মহিলা, মিনিটখানেক আগে বাড়ি ফেরার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল যে। নালিশের ভঙ্গিতে একজনের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওখানে–ওই ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁকে পরিষ্কার মনে থাকার কারণটি হচ্ছে–চেয়ারে বসার আগে হাতের ট্রে দিয়ে তিনি গুঁতো মেরেছিলেন আমাকে। মানে–গুঁতোটা লেগে গিয়েছিল আরকী।'

সেরেকি এগিয়ে গিয়ে ধরে নিয়ে এল লোকটাকে। তার ফ্যাকাসে চেহারা দেখে সাহস দিল নেলসন, 'কেউ আপনাকে কোনও আঘাত করবে না। তবে ব্যাপারটাকে জটিল করার চেষ্টা করবেন না। আমাদের কাজে আপনার যতটুকু সাহায্য দরকার, সেটুকু করলেই চলবে।'

'ওই মৃত লোকটাকে কখনও দেখিনি আমি,' বিলাপের ভঙ্গিতে বলে উঠল সে। যেন ইতিমধ্যে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। 'সবেমাত্র আমার খাবারটা টেবিলে রেখেছি, আমি–'

কথা শেষ না করে থেমে গেল সে। কেউ বিপদে পড়লে ভাগীদার খোঁজে যন্ত্রণার অংশ নিতে। এ লোকটিও তাই করল। চট করে আরেকজনকে দেখিয়ে বলল, 'এই যে–ইনিও তো ছিলেন টেবিলে। আমাকে যদি ধরা হয়, তা হলে তাঁকে ধরা হবে না কেন?'

'ধরতেই তো চাইছি আমরা,' নিষ্প্রাণ কণ্ঠ নেলসনের। 'এই

যে, সাহেব—আসুন এদিকে।' নতুন সাক্ষীকে ডাকল নেলসন। 'হ্যাঁ, এবার বলুন, এখানে বসে স্প্যাগেটি খাচ্ছিলেন কে?'

তিন নম্বরকে খুঁজল নেলসন। সবাইকে বলল, 'যত শীঘ্রি তাকে বের করা যাবে, আপনারা তত দ্রুত বাড়ি যেতে পারবেন।'

সবাই সরোষে তাকাল চারদিকে। বিরক্তির সাথে খুঁজল তিন নম্বরকে, যার জন্যে দেরি হয়ে যাচ্ছে তাদের। কিন্তু এবার সত্যিই যেন একটু জটিল হয়ে দাঁড়াল ব্যাপারটা। কোনও খবর নেই তিন নম্বরের। সাদা ইউনিফরম পরা বাসের এক স্টাফ বেরিয়ে এল শেষমেশ। নেলসনকে বলল, 'আমার মনে হয়, দুর্ঘটনাটা ঘটার পরপরই বেরিয়ে গেছে লোকটা। ঘটনাটা ঘটার মিনিটখানেক আগে এই টেবিলের দিকে তাকাই আমি। তখন তার খাওয়া হয়ে গেছে। খেলাল দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল সে। এবং উঠি উঠি করছিল।'

'ঠিক আছে, দেখব সে কত বড় চালাক,' বলল নেলসন। 'এখানে সে থাকুক বা না থাকুক, তাকে ঠিকই ধরে ফেলব। এখন বাকি সবাই চলে যান আপনারা। দরজায় দাঁড়ানো পুলিসের কাছে নাম-ঠিকানা দিয়ে যাবেন। কেউ মিথ্যে নাম-ঠিকানা দিয়ে ফাঁকিবাজির চেষ্টা করবেন না, তা হলে কিন্তু নিজের বিপদ ডেকে আনবেন।'

জায়গাটা ভোজবাজির মত ফাঁকা হয়ে গেল। কৌতূহল মেটানোর চেয়ে নিজের পৈতৃক প্রাণটা আগে বড়, কাজেই মৃত লোকটার মৃত্যু-রহস্য নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে গা বাঁচানোর দিকে মন দিল সবাই। ভেতরে রইল শুধু মৃত লোকটার টেবিলের দুই ভোজ-সঙ্গী, রেস্তোরাঁর ম্যানেজার, বাসের স্টাফ এবং গোয়েন্দা দু'জন।

একজন সহকারী মেডিকেল এক্সামিনার এল দু'জন লোক নিয়ে। সাথে মার্কা মারা বাস্কেট। সংক্ষিপ্ত একটা প্রাথমিক তদন্ত

সারল তারা। এই ফাঁকে মৃতের দুই ভোজ-সঙ্গী, বাসের স্টাফ এবং ম্যানেজারকে বিভিন্ন প্রশ্ন করল নেলসন। তাদের কথা থেকে খণ্ড খণ্ড দৃশ্য জোড়া দিয়ে পুরো ঘটনার একটা চিত্র দাঁড় করানোর চেষ্টা করল সে।

বড়সড় বাসের ভেতর এই ভ্রাম্যমাণ রেস্তোরাঁর নিয়মিত খদ্দের ছিল মৃত লোকটা। স্টাফের কথানুযায়ী তাই। সে তাকে ভাল করেই চেনে। মুখচেনা আরকী। স্টাফের মতে, লোকটা ছিল একটু অন্যরকম। প্রতিদিন রাতে একই সময় এখানে আসত সে, রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে। আর খেতও রোজ একই খাবার–একটি বোলোগনা স্যাণ্ডউইচ এবং কফি। গত ছ'মাসে কখনও এর নড়চড় দেখা যায়নি। খাওয়ার পর তার টেবিল থেকে বাসের স্টাফ রোজ একই রকম টুকরো-টাকরা সাফ করত। ম্যানেজার স্টাফের এ কথায় সমর্থন জানিয়ে বলল, একদিন বোলোগনা স্যাণ্ডউইচ না পেয়ে খেপে গিয়েছিল সে। লোকটা সম্পর্কে আরও জানা গেল, যেখানে বিল দেয়ার সময় দামি পোশাকের খদ্দেররা এক-আধ ডলার ভাঙায়, সেখানে তোবড়ানো হ্যাট আর পুরানো একটা ওভারকোট পরেও দশ-বিশ ডলার ভাঙাত সে।

মৃত লোকটার আধ-খাওয়া স্যাণ্ডউইচ এখনও রয়ে গেছে টেবিলে। স্যাণ্ডউইচের টুকরোটা পরীক্ষা করে মেডিকেল এক্সামিনার নেলসনকে বলল, 'আমার মনে হয়, এই স্যাণ্ডউইচের ভেতর কিছু একটা আছে। সম্ভবত সায়ানাইড–তবে আমার ভুলও হতে পারে।'

সেরেকি কিন্তু আগেই মৃত লোকটার শরীরে তল্লাশি চালিয়েছে একবার। সে বলল, 'লোকটার নাম লিও আভ্রাম, এই যে ঠিকানা। তার সাথে সাতশো ডলারের ক্রেডিট কার্ড এবং নগদ তিনশো ডলার পাওয়া গেছে। ক্রেডিট কার্ড ছিল ডান জুতোর ভেতর, আর ডলারগুলো ছিল বাঁ জুতোতে। ঠিকানামত

গিয়ে একবার ঢুঁ মেরে আসব নাকি!'

'আমি যাই,' বলল নেলসন। 'তুমি দেখো এদিকটা।'

স্যাণ্ডউইচের ওয়াক্সড পেপারটা পড়ে আছে চেয়ারের নীচে। নেলসন সেটা তুলে নিয়ে একটা পেপার-ন্যাপকিন দিয়ে মোড়াল। তারপর সেটা রেখে দিল পকেটে।

আভ্‌রামের বাড়িটা খুব দূরে নয় ভ্রাম্যমাণ রেস্তোরাঁটা থেকে। হেঁটেই যাওয়া যায়। ঠিকানা ধরে সেকেলে এক জীর্ণ দালানে গিয়ে পৌঁছুল নেলসন। ঘণ্টা বাজাতেই শক্তপোক্ত গড়নের এক মহিলা বেরিয়ে এল। স্বর্ণকেশী। গায়ে পুরানো এক সোয়েটার, পায়ে কার্পেট-স্লিপার।

'আভ্‌রাম বলে কেউ থাকেন এখানে?' জিজ্ঞেস করল নেলসন।

'আমার স্বামী। কিন্তু তিনি তো এখন নেই বাসায়। বাইরে গেছেন। তবে এসে যাবেন এক্ষুণি।'

দ্বিধায় পড়ে গেল নেলসন। ভয়াবহ দুঃসংবাদটা মহিলাকে এক্ষুণি দেবে, নাকি আরেকটু পরে? পরমুহূর্তে সে ভাবল, যাক না আরও খানিকক্ষণ। সুন্দর পরিবেশটা এত শীঘ্রি নষ্ট করে কী হবে?

'আমি কি ভেতরে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারি?' অনুমতি চাইল নেলসন।

'কেন নয়? আসুন।' স্বচ্ছন্দে রাজি হলো মহিলা।

ছাইয়ের খালি ক্যানে ভরা একটা অন্ধকার বেসমেন্ট-ওয়ে ধরে নেলসনকে নিয়ে গেল মহিলা। ঢুকল একটা স্বল্পালোকিত ঘরে। এককোণে টিম টিম করে জ্বলছে সবুজাভ হলুদ গ্যাসলাইট। অথচ ছাদে ইলেকট্রিসিটির তার টানা আছে।

'নির্ঘাত হাড়-কেপ্পন ছিল বুড়ো!' মৃত লোকটাকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বলল নেলসন। সেই সঙ্গে টের পেল, বউয়ের প্রতি বিন্দুমাত্র দরদ ছিল না তার।

ঘরের আরেকটা জিনিস দেখে বেশ অবাক হলো নেলসন। এক বার্নারের একটা গ্যাসের চুলোয় এক পট কফির পানি ফুটছে। ঘরে কফির ব্যবস্থা রয়েছে, অথচ সে কফি খেতে গেছে বাইরে, ব্যাপারটা কী?

'আচ্ছা, আপনার স্বামী কোথায় গেছেন, জানেন?' জিজ্ঞেস করল নেলসন।

'দুই ব্লক পরেই একটা ভ্রাম্যমাণ রেস্তোরাঁয় রোজ এসময় খেতে যায় সে।'

'এ কেমন কথা?' কৌতূহলী কণ্ঠ নেলসনের। 'এখানে কফির ব্যবস্থা থাকতে রোজ রোজ বাইরে যান কেন?'

অব্যক্ত একটা ক্ষোভ ফুটে ওঠে মহিলার চেহারায়। মিলিয়ে যায় পরমুহূর্তে। যেন দীর্ঘদিন উপেক্ষিত হতে হতে এখন আর তেজ নেই এ ক্ষোভের। মহিলা উদাস কণ্ঠে বলে উঠল, 'ওখানে নাকি আলোটা ভাল পাওয়া যায়, এজন্যেই যায় রোজ। এটা আসলে একটা ছুতো। নিজের জন্যে টাকা খরচে কোনও কিপ্টেমি নেই তার, আমার এবং ছেলেমেয়েদের বেলায়ই যত কার্পণ্য।'

'ক'টি ছেলেমেয়ে আপনার?'

'দুটি, তবে একটিও তার নয়।' নিরাসক্ত কণ্ঠ মহিলার।

নেলসন দেখে, একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে এবং আরও ছোট এক বালক উঁকিঝুঁকি মারছে পাশের ঘর থেকে। লজ্জা পাচ্ছে এদিকে আসতে।

'উম্-ম, ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল নেলসন। 'আমি এখন আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দেব। শক্ত করুন মনটাকে। খানিক আগে ওই রেস্তোরাঁয় মারা গেছেন আপনার স্বামী।'

চেহারায় বিরক্তির ছাপটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল মহিলার। ফ্যাকাসে একটা ভাব ফুটে উঠল। যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে সে।

'এই দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী সায়ানাইড।' বলল নেলসন।

মহিলা কোনও কথা না বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল একটা।

'আচ্ছা, মি. আভ্রামের শত্রু ছিল কোনও?' জিজ্ঞেস করল নেলসন।

'কেউ তাকে পছন্দ করত না, আবার কেউ ঘৃণাও করত না–ব্যস, এটুকুই শুধু জানি আমি।'

'তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন–এমন কোনও কারণ ছিল কি?'

'আত্মহত্যা? কক্ষনো না! সে তার টাকাকে যেমন ভালবাসত, তেমনি জীবনকেও।'

কথাটা অবশ্যি ঠিক, মনে মনে স্বীকার করল নেলসন। একজন কৃপণের নিজের জীবন নিয়েও কিপ্টেমি করাটা স্বাভাবিক।

উঁকিঝুঁকিরত মেয়েটি এক পা-দু' পা করে চলে এল এ ঘরে। ভয় ভয় একটা ভাব। হাত দুটো পেছনে লুকানো।

'মা, সত্যিই সে মারা গেছে?' কৌতূহলী কণ্ঠ মেয়েটির। যেন সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছে তার।

মহিলা মাথা নাড়ল শুধু, জল নেই চোখে।

'তা হলে এটা এখন আমরা জ্বালাতে পারব, তাই না, মা?'

পেছনের লুকানো হাত দুটো সামনে আনল মেয়েটি। হাতে একটা ইলেকট্রিক-বালব।

নেলসন যদিও শক্ত মনের মানুষ, কিন্তু মেয়েটির কথা অন্তর ছুঁয়ে গেল তার। আলোর অভাব মেয়েটিকে এতই কষ্ট দিচ্ছে, ঘরের মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে। নেলসন মহিলাকে বলল, 'কাল আমাদের অফিসে আসুন, মিসেস আভ্রাম। ওখানে আপনার স্বামীর কিছু টাকা রয়েছে। নিয়ে আসবেন ওগুলো। গুড নাইট।'

রাত দুটোর দিকে আবার রেস্তোরাঁয় চলে এল নেলসন। কিন্তু রেস্তোরাঁ বন্ধ। তার মানে সবাই চলে গেছে। সোজা হেডকোয়ার্টারে চলে এল সে। দেখা করল ক্যাপ্টেনের সাথে।

ক্যাপ্টেন তাকে বলল, 'কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি থেকে ইতিমধ্যে জানা গেছে পরীক্ষার ফল। ওই স্যাণ্ডউইচ ভর্তি ছিল সায়ানাইডের স্ফটিক। তবে যে পাউরুটি থেকে স্যাণ্ডউইচটা বানানো হয়েছে, ওটা পরীক্ষা করে পাওয়া যায়নি কিছু। এমনকী পাউরুটি কাটার ছুরি, কাটিং-বোর্ড সবই বিষমুক্ত। তার মানে মি. আভ্‌রাম হয় আত্মহত্যা করেছেন, নয়তো কেউ তাকে সুপরিকল্পিতভাবে খুন করেছে।

'মি. আভ্‌রামের বাড়ি থেকে এইমাত্র এলাম,' বলল নেলসন। 'এটা আত্মহত্যা নয়। যে লোকের মাথায় আত্মহত্যার প্ল্যান থাকে, বাড়িতে ইলেকট্রিক-বালব না জ্বালিয়ে পয়সা বাঁচানোর কথা ভাবে না সে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ,' মাথা নেড়ে সায় দিল ক্যাপ্টেন। 'কথাটায় যুক্তি আছে। তা ছাড়া সায়ানাইডের মত দামি বিষ মি. আভ্‌রামের মত হাড়-কিপ্টের জোগাড় করার কথাও নয়। সবচে' বড় কথা, সায়ানাইড এমন জিনিস নয় যে, চাইলে সহজেই হাতে এসে যাবে। তা হলে মানেটা দাঁড়াচ্ছে—এটা পরিষ্কার একটা খুন। এবং খুব সম্ভব টেবিলের তিন নম্বর লোককে পাওয়া গেলে রহস্যের জট অনেকটা খুলে যাবে। এখন সবকিছু বাদ দিয়ে এই তিন নম্বরকে খুঁজতে লেগে যাও তোমরা।'

বাসের স্টাফ এবং ভোজের টেবিলের অপর দুই সঙ্গীর কাছ থেকে পাওয়া বর্ণনা মিলিয়ে তিন নম্বর লোকটার একটা কাল্পনিক ছবি দাঁড় করানোর চেষ্টা করল নেলসন। লোকটা বিশালদেহী, পেল্লাই ভুঁড়িও আছে। হালকা-রঙের স্যুট ছিল পরনে। সাথে কালো একটা ছোট ব্যাগ ছিল তার, দেখতে অনেকটা ব্যবসায়ীদের স্যাম্পল-কেসের মত। ওটা টেবিলের নীচে নামিয়ে রেখেছিল সে। মি. আভ্‌রাম যখন তার স্যাণ্ডউইচ নিয়ে টেবিলে যায়, ততক্ষণে খাওয়া হয়ে গেছে লোকটার। তারপরেও অকারণে দেরি করছিল সে। উঠি উঠি ভাব করে দাঁত

খোঁচাচ্ছিল। এবং বার বার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল। পালাই পালাই একটা ভাব ছিল তার মাঝে। এমনও হতে পারে, তার ওই বাক্সের ভেতর লুকানো ছিল সায়ানাইড। রেস্তোরাঁয় সবাই যখন খাওয়ায় ব্যস্ত, এই ফাঁকে কাজটা সেরেছে। তবে মি. আভ্রাম অবশ্যই টেবিলে স্যাণ্ডউইচ রেখে মুহূর্ত কয়েকের জন্যে কোথাও গিয়েছিল। তা হতে পারে—কফি আনার জন্যে। তখন টেবিলের নীচে লোকটা এমন এক শব্দ করে, বাকি দুই ভোজ-সঙ্গী টেবিলের নীচে তাকায়। এই ফাঁকে সায়ানাইড মেশানোর আসল কাজটা সেরে ফেলে সে।

তবে এই কাল্পনিক দৃশ্যটা মোটেও মনঃপূত হলো না নেলসনের। কারণ স্যাণ্ডউইচটা ওয়াক্সড-পেপারে মোড়ানো ছিল। ওয়াক্সড-পেপার খুলে সায়ানাইড মেশালে অবশ্যই টের পেয়ে যেত বুড়ো আভ্রাম। তা যাই হোক, এখন সবার আগে এই তিন নম্বরকে খুঁজে বের করা দরকার। তা হলেই বেরিয়ে আসবে সব।

মি. আভ্রাম মারা যাওয়ার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ধরা পড়ল এই তিন নম্বর। এবং এক্ষেত্রে সফল হলো সেরেকি। আরেকটা ভ্রাম্যমাণ রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে ধরা পড়ল তিন নম্বর। বাসের স্টাফ এবং দুই সাক্ষীর বর্ণনার সাথে মিলে গেল তার চেহারা-সুরত, দৈহিক গড়ন, এমনকী সেই স্যাম্পল কেসও। অবশ্যি আজ আগের স্যুটটা বদলে ছাইরঙা একটা স্যুট পরেছে সে।

নাম তার আলেক্সাণ্ডার হিল। ক্যাপ্টেন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী করেন আপনি?'

সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হয়ে গেল হিলের চেহারা। জোরে জোরে শ্বাস টানায় হাঁপরের মত ওঠা-নামা করতে লাগল তার ভুঁড়ি। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'আমি—আমি একটা হোলসেল ড্রাগ প্রতিষ্ঠানের সেল্সম্যান।'

অমনি তিন গোয়েন্দার চাঁদি গরম। নির্ঘাত এ বেটাই সায়ানাইড দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খোলা হলো তার স্যাম্পল-কেস। কিন্তু ক্যাপ্টেন, সেরেকি আর নেলসনকে হতাশ করে দিয়ে বেরিয়ে এল টুথ-পাউডার, অ্যাসপিরিন এবং মাথা ব্যথার ওষুধ।

কিন্তু তিনজনের সন্দেহ দূর হলো না মোটেও। তিন গোয়েন্দা তিনদিক থেকে প্রশ্নবান ছুঁড়তে লাগল হিলের দিকে। এদিকে হিলের তো ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। তার ঘাবড়ে যাওয়া আরও খেপিয়ে তুলল তিন গোয়েন্দাকে। হেডকোয়ার্টারে এলে কালপ্রিটরা এমন গোবেচারা ভাব ধরেই থাকে।

ক্যাপ্টেন শুধোল, 'আপনার ভেতর যদি কোনও প্যাঁচ না-ই থাকবে, তা হলে সবাই রয়ে গেল, অথচ আপনি পালালেন কেন?'

'আমার তাড়া ছিল। তা ছাড়া আমি যখন বেরিয়ে যাই, তখনও দিব্যি বেঁচে ছিলেন তিনি।'

'তা হলে কি বলতে চান, তার মৃত্যুর খবর আপনি জানেন না।'

'জানব না কেন, পরদিন সকালে পত্রিকা দেখেই তো জানতে পারলাম সব।'

এভাবে অনেকক্ষণ প্রশ্ন করেও হিলের পেট থেকে সেরকম আশাব্যঞ্জক কিছু বের করা গেল না। তারপরেও ছাড়া হলো না তাকে। ক্যাপ্টেন নেলসনকে আড়ালে ডেকে ঢুঁ মারতে বললেন হিলের ডেরায়। যদি কোনও গোপন কৌশলে মি. আভ্রামকে সে সায়ানাইড খাইয়েই থাকে, তা হলে তার বাড়িতে পাওয়া যেতে পারে বিষের নমুনা।

হিলের কাছ থেকে চাবি নিয়ে তার ডেরার দিকে ছুটল নেলসন। আপার ওয়েস্ট সাইডে, এক রুমের ছোট্ট এক ফ্ল্যাটে থাকে ব্যাচেলার হিল। ঘরের ভেতরে ঢুকে আলো জ্বেলে তন্ন তন্ন করে সবকিছু পরীক্ষা করল নেলসন। কিন্তু কণা পরিমাণ

সায়ানাইডও খুঁজে পেল না।

ফেরার পথে সোজা হেডকোয়ার্টারের দিকে না গিয়ে মি. আভ্রামের বাড়িতে একবার ঢুঁ মারবে বলে ঠিক করল নেলসন। ওদের প্রতি কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে তার। তাই দেখে আসবে, কেমন আছে ওরা।

আভ্রাম হাউসে আলো জ্বলছে আজ। ঘণ্টা বাজাতেই সেই মেয়েটি দরজা খুলে দিল। পেছনে ছোট ভাই।

'মা তো বাড়িতে নেই,' বলল মেয়েটি।

ভাইটি অমনি বলে উঠল, 'নিক চাচার সাথে বেড়াতে গেছে।'

বোনটি এবার খেপে গেল ভাইয়ের ওপর, 'এই–তুই এ কথা বললি কেন? মা বার বার বারণ করে গেছে না?'

মৃদু হাসি ফুটল নেলসনের ঠোঁটে। মহিলা জানে না, বাচ্চাদের কাছে গোপন কথা রেখে গিয়ে কত বড় বোকামি করেছে। ওদের পেট থেকে আরও কথা বের করার জন্যে নেলসন বলল, 'নিক চাচা তো তোমাদের আপন চাচা নন, তাই না?'

মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, 'আপনি কী করে জানলেন?'

'জানি, জানি,' বিজ্ঞের মত বলল নেলসন। 'তোমাদের মা তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, ঠিক তো?'

'হ্যাঁ, চাচা, ঠিক ধরেছেন,' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল ছেলেটি। 'তিনি আমাদের নতুন বাবা হবেন।'

'তোমাদের আসল বাবা কোথায়, সোনামণিরা?'

'এডওয়ার্ডস-এর কথা বলছেন?' আগ্রহের সাথে বলল ছেলেটি।

'হ্যাঁ, কোথায় তিনি?'

'তিনি তো সেই কবে মারা গেছেন।'

'কোথায়?'

'ডেট্রয়েটে।'

'আমাকে তার পুরো নামটা বলবে, বাবা?'

'আলবার্ট জে. এডওয়ার্ডস।'

হেডকোয়ার্টারে ফিরে ডেট্রয়টের নির্দিষ্ট একটা দপ্তরে তার করে দিল নেলসন। আলবার্ট জে. এডওয়ার্ডস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চায় সে।

পরদিন সকালে মিসেস আভ্রাম এল স্বামীর টাকা নিতে। নির্দিষ্ট কাগজে স্বাক্ষর করে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে টাকাটা নিল সে।

নোটগুলো গুনে বলল, 'আপনারা বোধহয় ভুল করছেন, এখানে একশো ডলারের অনেক বেশি নোট দেখা যাচ্ছে। আমি তো জানি, খুব অল্প টাকাই ছিল আভ্রামের জুতোর ভেতর। রাতে ঘুমোনোর সময় বালিশের নীচে টাকাটা রাখত। কখনও গুনে দেখার সুযোগ পাইনি। তবে ধারণা ছিল, সব মিলিয়ে বড় জোর পঞ্চাশ, সত্তর, কি একশো ডলার–'

'তার দুই জুতোর ভেতর ছিল এক হাজার ডলার,' বলল ক্যাপ্টেন। 'আর ওভারকোটের ভেতর সেলাই করা ছিল আরও হাজারখানেক।'

নেলসন মনে মনে ভাবল, যাক বেচারী, এই টাকাগুলো দিয়ে অন্তত কিছু করতে পারবে ছেলেমেয়ের জন্যে।

ছেলেমেয়ে দুটির মুখ থেকে শোনা নিক চাচার ব্যাপারটা মন থেকে গেল না নেলসনের। স্বামী হারানো এক মহিলা তার দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলতে, সংসারের নতুন অবলম্বন খুঁজে নিতে, আরেকটি বিয়ে করতেই পারে, কিন্তু এরপরেও অজ্ঞাত একটা কৌতূহল উতলা করে তুলল নেলসনকে। আভ্রাম হাউসের আশপাশে ওঁৎ পেতে আবিষ্কার করে ফেলল নিককে। প্রথমে অবশ্যি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল না নেলসন–ওই লোকটিই নিক। অনুসরণ করে সন্দেহ ঘুচিয়েছে।

একদিন আভ্রাম হাউসের পাশে, আড়ালে ঘণ্টাখানেক ওঁৎ পেতে থাকার পর বিদেশীদের মত দেখতে একটা লোককে বেরিয়ে আসতে দেখে নেলসন। নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে তাকে অনুসরণ করতে থাকে সে। লোকটা সোজা গিয়ে একটা ব্যাংকে ঢুকল। তারপর যখন সে ব্যাংক থেকে বেরোল, আর পিছু নিল না তার। এবার নেলসনও গেল ওই ব্যাংকে। নিজের পরিচয় দিয়ে লোকটা সম্পর্কে জানতে চাইল ব্যাংকের লোকজনের কাছে। কাগজ ঘেঁটে সব বলে দিল তারা। তার নাম নিকোলাস ক্রাসিন। নিজের নামে নতুন এক অ্যাকাউন্ট খুলেছে সে। জমা দিয়েছে এক হাজার ডলার।

একজন বিধবা তার মৃত স্বামীর টাকা এভাবে হবু স্বামীকে দান করতেই পারে, এরপরেও সূক্ষ্ম একটা সন্দেহের কাঁটা খচমচ করতে লাগল নেলসনের মনে। অফিসে ফিরে এসে দেখে, ডেট্রয়েট থেকে জবাব এসেছে তারের। জানা গেল, আলবার্ট জে. এডওয়ার্ডস ছিল একজন কনস্ট্রাকশন শ্রমিক। একটা আণ্ডার কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং-এ কাজ করার সময় অনেক উঁচু থেকে পড়ে মারা যায় সে। তার অটোপসি রিপোর্টে ছিল...

এডওয়ার্ডস-এর অটোপসি রিপোর্টটা বার বার মন দিয়ে পড়ল নেলসন। তারপর রওনা হল মি. আভ্রামের বাড়ির দিকে।

সন্ধে পৌনে সাতটায় মিসেস আভ্রামের ওখানে পৌঁছুল নেলসন। ঘণ্টা বাজাতেই সেই মেয়েটি এসে দরজা খুলে দিল। নেলসনকে দেখে কেমন ফ্যাকাসে একটা ভাব নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'মা, দেখো, সেই লোকটা আবার এসেছে!'

নেলসন শুকনো হাসি ছেড়ে মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল। ক্রাসিন যথারীতি হাজির। মিসেস আভ্রাম এবং ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে খেতে বসেছে। ঘরে এখন শুধু বিজলী বাতিই জ্বলছে না, ক্যাসেট প্লেয়ারও দেখা যাচ্ছে। তবে

আপাতত ওটা বন্ধ।

'আমি কি আপনাদের কোনও সমস্যায় ফেললাম?' সৌজন্যের সুরে বলল নেলসন।

'না-না, তা কেন,' অপ্রস্তুতভাবে হাসল মিসেস আভ্‌রাম। 'বসুন ওই চেয়ারটায়। আর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, ও হচ্ছে ক্রাসিন, আমাদের পারিবারিক বন্ধু। কিন্তু আপনার নামটা–'

'নেলসন।'

ক্রাসিন শুধু সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল নেলসনের দিকে, মুখে কিছু বলল না।

নেলসন বলল, 'আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে আমি দুঃখিত। আপনার স্বামীর ব্যাপারে শুধু দুটি প্রশ্নের উত্তর নিয়েই আমি চলে যাব। আচ্ছা, বলুন তো, কখন আপনার স্বামীর ওই দুর্ঘটনা ঘটে?'

'সেটা তো আপনিই ভাল জানেন। তার মৃত্যুর খবর আপনিই নিয়ে এলেন না?'

'আমি মি. আভ্‌রামের কথা বলছি না, এডওয়ার্ডস-এর কথা বলছি–ডেট্রয়েটে যিনি আণ্ডার কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং থেকে পড়ে মারা যান।'

পাণ্ডুর হয়ে গেল মিসেস আভ্‌রামের চেহারা, যেন পুরানো ব্যথাটা চাগিয়ে উঠল আবার। বিস্ময় ফুটে উঠল ক্রাসিনের চেহারায়।

'বলুন না, দিনের ঠিক কোন্ সময়ে...?' আবার জিজ্ঞেস করল নেলসন।

'দুপুরে।'

'তার মানে লাঞ্চ-টাইমে,' নরম সুরে বলল নেলসন। 'এসময় বেশির ভাগ শ্রমিক বাড়ি থেকে আনা টিফিন খেয়ে থাকে।'

এটুকু বলেই হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টাল নেলসন। যেন লোভনীয়

কোনও ঘ্রাণ পাচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে নাক কুঁচকে বলল, 'বাহ্, কফির চমৎকার সৌরভ ছুটেছে তো!'

অদ্ভুত এক কষ্টের হাসি ফুটল মিসেস আভ্রামের মুখে। উৎসাহের সাথে বলল, 'এক কাপ দেব নাকি, গোয়েন্দা সাহেব?'

ক্রাসিনের সাথে চকিতে একবার দৃষ্টি বিনিময় হলো তার।

'ধন্যবাদ, পেলে তো ভালই হয়।' লোভাতুর ভাব দেখাল নেলসন।

কফি আনতে উঠে গেল মিসেস আভ্রাম। গ্যাসের চুলোর দিকে এগোতে এগোতে হঠাৎ ছেলেমেয়ে দুটির ওপর খেপে গেল সে। খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'খেয়েদেয়ে এখনও বসে আছ তোমরা? যাও, শুয়ে পড়ো গে!'

ছেলেমেয়ে দুটিকে ঠেলে পাশের ঘরে নিয়ে গেল সে। কয়েক সেকেণ্ড পর অস্পষ্ট একটা ক্লিক্ শব্দ শুনতে পেল নেলসন। চাবি দিয়ে খোলা হলো কিছু। মিনিটখানেকের মধ্যে ফিরে এল মহিলা। এবার ক্রাসিনকে বলল, 'যাও তো একটু, চুল্লীর আগুনটা নিভু নিভু হলে উস্কে দিয়ে এসো।'

ক্রাসিন চলে গেল আগুন উস্কে দিতে।

নেলসনের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে ওদিক ফিরে কফি বানাচ্ছে মিসেস আভ্রাম। তার হাতের নড়াচড়া বোঝা যাচ্ছে শুধু। কফির কাপে কী থেকে কী হচ্ছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। টুং-টাং করে মিষ্টি শব্দ আসছে কাপটা থেকে।

খানিক পর নেলসনের সামনে এসে গেল ধূমায়িত কফি। একটু একটু করে কফির কাপটা উঠিয়ে চুমুক দিতে গিয়েও শেষমেশ দিল না সে। কফিটা নামিয়ে রেখে বলল, 'বেশি গরম মনে হচ্ছে। জিভ পুড়ে যেতে পারে। একটু ঠাণ্ডা হোক আগে, তারপর খাব। কিন্তু আপনার কফি কোথায়? আর নেই নাকি? আমি তো একা খাব না।'

'কফি হয়তো আর নেই। কিন্তু আমার লাগবে না। আপনি

খান।'

'না, এখান থেকে অর্ধেক নিন আপনি।'

'না, না!' প্রায় লাফিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল মিসেস আভ্রাম। 'লাগবে না! দাঁড়ান, আমি দেখছি। হ্যাঁ, আরও আছে কফি। প্রচুর আছে!'

কফি দেখার জন্যে মিসেস আভ্রাম যখন আবার উল্টোদিকে ঘুরল, তখন কাপটা হঠাৎ মেঝেতে ফেলে দিয়ে সুন্দর একটা দুর্ঘটনা সাজাতে পারত নেলসন। কিন্তু সে তা না করে অন্য একটা কৌশল বেছে নিল। পকেট থেকে একটা দেশলাইয়ের কাঠি বের করে শুধু মাথাটা ভাঙল। মিসেস আভ্রাম যখন তার কাপে কফি ঢালছে, এই ফাঁকে বারুদসহ মাথাটা আস্তে করে ছুঁড়ে দিল চুলোটার দিকে। একেবারে নিখুঁত নিশানায় না গেলেও, বারুদসহ মাথাটা চুলোর গরম একটা অংশে গিয়ে পড়ল।

মিসেস আভ্রাম কফির কাপটা নিয়ে যেই টেবিলে এসেছে, অমনি সশব্দে ফস্ করে জ্বলে উঠল বারুদ। মিসেস আভ্রাম চমকে উঠে ছুটে গেল চুলোর দিকে। এই ফাঁকে কফির কাপ দুটো দ্রুত বদল করল নেলসন।

মিসেস আভ্রাম বোকার হাসি নিয়ে ফিরে এল টেবিলে। চাপা উত্তেজনা নিয়ে দেখতে লাগল নেলসনের কফি পান। সে-ও মজায় মজায় চুমুক দিতে লাগল কফির কাপে। মনে মনে নেলসনকে ব্যঙ্গ করে বলছে সে, 'আরেকটু পরেই বুঝবে, বাছাধন, কফির মজা কাকে বলে!'

কিন্তু নেলসন কোনও মজা বোঝার আগেই টেবিলের ওপর মাথাটা ঢলে পড়ল মিসেস আভ্রামের। ভ্রাম্যমাণ রেস্তোরাঁয় সেদিন ঠিক এমনি করেই মৃত্যু হয়েছিল তার স্বামীর।

টেবিলের ধপাস আর মেঝেতে কাপ ভাঙার শব্দ শুনে বীর দর্পে ঘরে ঢুকল ক্রাসিন। তার ডানহাতে বড়সড় একটা কুড়াল,

বাঁহাতে থলে। মৃত নেলসনকে টুকরো টুকরো করে থলেতে ভরবে সে। কিন্তু এ কী কাণ্ড! মারা গেছে তো তার হবু স্ত্রী!

মুহূর্তেই থলেটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ক্রাসিন। প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে কুড়াল চালাল নেলসনের দিকে। নেলসন ত্বরিত হাঁটু গেড়ে বসে গেল মেঝেতে। পরমুহূর্তে ধরে ফেলল কুড়ালের মাঝখানের হাতল। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। মারপিটে পাকা ট্রেনিং আছে নেলসনের। কাজেই পটাপট দু'তিনটে ঘুসি মেরে ধরাশায়ী করে ফেলল ক্রাসিনকে।

মিসেস আভ্‌রামের শেল্‌ফ থেকে উদ্ধার করা হলো কিছু সায়ানাইড, যেগুলোকে তেলাপোকার ওষুধ বলে বাচ্চাদের কখনও ধরতে দেয়নি সে। বাচ্চা দুটিকে নিয়ে আসা হলো হেডকোয়ার্টারে। ওদের ভাল কোনও গার্জেন না পাওয়া পর্যন্ত আপাতত পুলিসের হেফাজতে থাকবে।

ক্যাপ্টেন অবাক হয়ে বলল, 'এই মহিলাই তা হলে নাটের গুরু? কিন্তু রেস্তোরাঁর স্যাণ্ডউইচে সে সায়ানাইড ঢোকাল কী করে?'

নেলসন বলল, 'আভ্‌রাম ছিল হাড়-কিপ্টে, ওই রেস্তোরাঁয় গিয়ে সবসময়ই বোলোগনা স্যাণ্ডউইচ খেত সে। আর এটাই ছিল সবচেয়ে সস্তা। টানা ছ'মাস ধরে একই রেস্তোরাঁয় একই সময় একই খাবার খেয়ে আসছে সে। কাজেই নতুন প্রেমিক ক্রাসিনকে দিয়ে স্বামী আভ্‌রামকে মারার প্ল্যান সাজাতে কোনও কষ্ট হয়নি মহিলার। ক্রাসিন আগেভাগেই একটা বোলোগনা স্যাণ্ডউইচ কিনে গোপনে মিসেস আভ্‌রামকে দেয়। মহিলা এই স্যাণ্ডউইচে বিষ মাখানোর পর আবার সুন্দর করে ওয়াক্সড-পেপার দিয়ে মুড়িয়ে রেখে আসে রেস্তোরাঁয়। এখন কীভাবে এই স্যাণ্ডউইচ সরাসরি মি. আভ্‌রামের হাতে পৌঁছুল, সেটা জানা যাবে ক্রাসিনকে চেপে ধরলেই। তবে এই খুনের ক্ষেত্রে মি. আভ্‌রামের টাকা বাগানোই ছিল ক্রাসিনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

'আর মিসেস আভ্রামের উদ্দেশ্য ছিল হাড়-কিপ্টে-বুড়ো স্বামীর খপ্পর থেকে বেঁচে গিয়ে নতুন আরেক স্বামী বাগানো। এর আগে এডওয়ার্ডসকেও সায়ানাইড খাইয়ে মেরেছে সে। ডেট্রয়েট থেকে তার আগের স্বামীর যে বায়োপসি রিপোর্ট এসেছে, তাতে পরিষ্কার সায়ানাইডের কথা লেখা আছে। দালান থেকে পড়ে এডওয়ার্ডস-এর মৃত্যু হলেও, লাঞ্চের সময় সায়ানাইড খেয়েছিল সে টিফিনের সাথে। তবে প্রমাণের অভাবে এতদিন মহিলাকে ধরতে পারেনি কেউ।'

নেলসনের কাছ থেকে সব শুনে সেরিকি শুধু বলল, 'তা হলে এই ছিল ঘটনা!'

ক্যাপ্টেন ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'যে যেমন কাজ করে, তার কর্মফলও হয় তেমনি!'

মূল: কর্নেল উলরিখ
রূপান্তর: শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

জিনির জন্যে

রানওয়ের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। গেটের কাছটায় অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। যেমনটি আশা করেছিলাম, লোকটা দেখতে মোটেও সেরকম নয়। বিবর্ণ তামাটে রঙের উইণ্ড-ব্রেকার (আঁটো জামা বিশেষ) পরে আছে সে, প্যান্টটা অসম্ভব ঢোলা, আর মাথার হ্যাটটা তার সন্দেহপূর্ণ চেহারার সাথে একেবারেই বেমানান। ধূসর চুল আর ভুরু দেখে মনে হচ্ছে লোকটার বয়স চল্লিশের ঘরে। তার সদা চঞ্চল কালো চোখ দুটো ইতিউতি ঘোরাফেরা করছে বার বার। যেন আকস্মিক কোনও আঘাত এড়াতে চাইছে সে। আমার ধারণা, প্রায়ই সে অনভিপ্রেত বিচ্ছিরি পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়।

'আপনি আর্চার?' জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে হাত বাড়ালাম। সৌজন্য প্রকাশের ধার দিয়েও গেল না লোকটা। বরং আমার দিকে এমনভাবে তাকাল–যেন সে হাত বাড়ালেই হাতটা খপ্ করে ধরে জুডোর এক মোক্ষম প্যাঁচ কষে ফেলব। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে হাত দুটো উইণ্ড-ব্রেকারের পকেটে ভরল সে।

'আমি হ্যারি নিমো,' অনুচ্চ দুর্বল কণ্ঠে নিজের পরিচয় দিল সে, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভেতর থেকে ঠেলে বেরোল কথাগুলো। 'আমার ভাই আপনাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে। আপনি তৈরি?'

'আগে আমার লাগেজটা নিয়ে নিই।'

ফাঁকা ওয়েটিং রুমের কাউণ্টার থেকে আমার বড়সড় ব্যাগটা

উঠিয়ে নিলাম। টুথব্রাশ আর কাপড়চোপড় ছাড়াও দুটো আগ্নেয়াস্ত্র আছে এতে। তাৎক্ষণিক কাজের জন্যে একটি .৩৮ স্পেশাল এবং ওটার বিকল্প হিসেবে .৩২ অটোমেটিক।

হ্যারি নিমো আমাকে বাইরে নিয়ে এসে তার বিশাল কালো গাড়িটায় বসাল। গাড়ির উইণ্ডশিল্ড এবং জানালার কাঁচগুলো বেশ পুরু। কাঁচের হলদেটে আভা বলে দিচ্ছে ওগুলো বুলেটপ্রূফ।

'গুলি খাওয়ার কোনও ভয় আছে নাকি আপনার?' শুধোলাম তাকে।

'গাড়িটা আমার নয়,' বিষণ্ণ হাসি ফুটল নিমোর ঠোঁটে। 'নিকের।'

'নিক নিজে এলেন না কেন?'

ফাঁকা মাঠটার চারদিকে একবার দৃষ্টি বোলাল নিমো। যে বিমানে করে এখানে পৌঁচেছি, সেটা আকাশে উড়াল দিয়েছে আবার। সুনীল আকাশের বুকে লাল সূর্যের আলোতে ছোট্ট একটা বিন্দুর মত লাগছে ওটাকে। ধারেকাছে মানুষ বলতে শুধু কণ্ট্রোল টাওয়ারের অপারেটরকেই দেখা যাচ্ছে।

নিমো আমার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস্ করে বলল, 'নিক এখন একটা ভীতু কবুতর, বাড়ি থেকে বেরোতে ভয় পাচ্ছে। আজ সকাল থেকে এই অবস্থা।'

'কী হয়েছে সকালে?'

'সে কিছু বলেনি আপনাকে? তার সাথে তো আপনার কথা হয়েছে ফোনে।'

'আমাকে তেমন কিছু বলেননি তিনি। শুধু বলেছেন, তার নৌকা ছাড়ার আগ পর্যন্ত, ছ'দিনের জন্যে একজন দেহরক্ষী দরকার। কেন, তা বলেননি।'

'শত্রু লেগেছে তার পেছনে। আজ সকালে বিচে গিয়ে গুলি খেতে বসেছিল সে। র‍্যাঞ্চের পেছনে নিজস্ব একটা বিচ আছে তার। পানিতে নেমে গোসল করছিল, কে একজন আড়াল থেকে

গুলি শুরু করে দেয়। পরপর পাঁচ-ছ'টা গুলি পাথরের ঢিলের মত নিকের চারদিকে, পানিতে এসে পড়ে। বরাত ভাল যে নিক একজন ভাল সাঁতারু। ডুবসাঁতার দিয়ে পার পায় সে। নইলে তো ওখানেই শেষ। এই ঘটনার পর নিকের ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক। শত্রুরা তাকে চোখে চোখে রাখছে।'

'কারা এই শত্রু? বলতে অসুবিধে নেই তো?'

নিমো ঝট করে তাকাল আমার দিকে। তার চোখেমুখে অবিশ্বাস। 'হায় ঈশ্বর, নিককে চেনেন না আপনি? সে আপনাকে কিছুই বলেনি?'

'তিনি একজন লেবু-চাষী, তাই না?'

'হ্যাঁ, এখন তাই।'

'আগে কী করতেন?'

'এ সম্পর্কে আর কিছু বলতে চাই না আমি। প্রয়োজন মনে করলে নিকই খুলে বলবে সব।'

শ'দুয়েক ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে মাঠে। গাড়ির শব্দে মাথা তুলে আমাদের দিকে তাকাল ওগুলো। নিমো একমনে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। যেন গাড়ি চালানোর মত উপভোগ্য কিছু নেই পৃথিবীতে। ইঞ্জিনের টানা গুঞ্জন ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই গাড়ির ভেতর। হাইওয়ে ধরে অনেকক্ষণ চলার পর একটা ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল গাড়ি। এগিয়ে চলল জ্যামিতিক ছকে সাজানো লেবু বাগানের ভেতর দিয়ে। ঢালের নীচে জ্বলজ্বল করছে গোধূলির শেষ আলোটুকু।

একটা প্রাইভেট লেনে এসে ঢুকল গাড়ি। দু'সারি গাঢ় সবুজ গাছের মাঝ দিয়ে সিঁথির মত চলে গেছে পথটা। সোজা গিয়ে শেষ হয়েছে আধ মাইল দূরে নিচু একটা বাড়িতে।

সমতল ছাদ বাড়িটার। কংক্রিট আর মেঠো পাথরে তৈরি। সংলগ্ন গ্যারেজ। জানালাগুলোতে ভারী পর্দা ঝোলানো। বাড়ির চারদিকে সুবিন্যস্ত গুল্মে ভরা উঠন। উঠনটি দশ ফুট উঁচু

কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা।

তালাবদ্ধ গেটের সামনে এসে গাড়ি থামাল নিমো। হর্ন বাজাল গেট খুলে দেয়ার জন্যে। কিন্তু কারও কোনও সাড়া-শব্দ নেই। আবার হর্ন বাজাল সে।

গেট থেকে বাড়ি পর্যন্ত পথের মাঝামাঝি গুল্মময় জায়গা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল কিছু একটা। ভাল করে লক্ষ করতেই দেখি, মানুষ। কনুই আর হাঁটুর সাহায্যে খুব ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সে। তার মাথাটা প্রায় মিশে গেছে মাটির সাথে। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আলোতে লোকটার মাথার একপাশ এতই লাল দেখাচ্ছে, যেন সে রঙ মেখেছে ওখানটায়। নুড়ি বিছানো এবড়োখেবড়ো ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে এগিয়ে এল লোকটা।

হ্যারি নিমো গাড়ি থেকে চেঁচিয়ে জানতে চাইল, 'কিছু হয়েছে, নিক?'

লোকটি তার ভারী মাথা তুলে তাকাল আমাদের দিকে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল দু'পায়ে ভর দিয়ে। স্খলিত পায়ে এমনভাবে এগোতে লাগল সামনের দিকে, যেন হাঁটতে শিখছে বড়সড় একটা শিশু। সশব্দে প্রবলবেগে শ্বাস টানছে সে। চোখেমুখে ফুটে উঠেছে বেঁচে থাকার তীব্র আকুতি। হঠাৎ করেই চোখ বুজল সে, দড়াম করে আছড়ে পড়ল পাথরের ওপর।

হ্যারি নিমো গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে গেল কাঁটাতারের বেড়ার দিকে। পোশাকের মায়া না করে বাঁদরের মত হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বেড়া ডিঙিয়ে উল্টোদিকে নেমে গেল। ভাইয়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল নিমো। নিককে চিৎ করে হাত রাখল তার বুকে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হতাশভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

ব্যাগ থেকে রিভলভারটা বের করে দৌড়ে গেলাম গেটের কাছে।

'গেটটা তাড়াতাড়ি খুলুন, হ্যারি।'

হ্যারি প্রলাপের মত বকে চলেছে, 'বেজন্মার দল শেষ পর্যন্ত

ওকে মেরেই ফেলল! ওকে খুন করল...!'

'শিগ্‌গির খুলুন,' তাড়া দিলাম হ্যারিকে।

মৃত নিকির পকেট হাতড়ে একটা চাবির গোছা বের করল নিমো। তারপর খুলে দিল গেটটা। দুদ্দাড় করে এগিয়ে গেলাম। নিষ্প্রাণ নিকি নিমোর মুখের দিকে তাকাতেই দেখি, কপালের লাল অংশটুকুতে বুলেটের ছিদ্র।

'অপকর্মটি কে করল, হ্যারি?'

'জানি না। ফ্যাট্‌স জর্ডান, বা আর্টি ক্যাস্টোলা, কিংবা ফ্যারোনেস। ওদেরই কেউ একজন হবে।'

'দ্য পার্পল গ্যাং-এর কথা বলছেন?'

'একদম ঠিক ধরেছেন। গত তিরিশ বছর ধরে তাদের কোষাধ্যক্ষ ছিল নিকি। টাকা-পয়সার লেনদেন সে-ই করত। তারপর যখন অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরমে পৌঁছল, বেশ কিছু টাকা সরিয়ে ফেলে নিকি। তারপর সটকে পড়ে নির্বিঘ্নে।'

'কত ছিল সেই টাকার অঙ্ক?'

'নিকি আমাকে এ ব্যাপারে জানায়নি কিছু। শুধু জানি, যুদ্ধের পর সে এখানে এসে লেবু চাষের জন্যে এক হাজার একর জমি কেনে। নিকির নাগাল পেতে পনেরো বছর লেগে যায় ওদের। সে অবশ্যি জানত, একসময় ওরা তাকে ধরবেই।'

'আর্টি ক্যাস্টোলা তো গত বসন্তে তার রকদল ছেড়েছে।'

'হুঁ, এজন্যেই তো নিকির বুলেটপ্রুফ গাড়ি কেনা। আর কাঁটাতারের বেড়াটাও তখন তুলেছে। লাগামছাড়া আর্টি কখন এদিকে আসে কে জানে?'

'আচ্ছা, এতে আপনার কোনও হাত নেই তো?' সরাসরি আক্রমণ করলাম তাকে। হ্যারিকে সন্দেহ করাটা স্বাভাবিক। ভাইয়ের মৃত্যুতে যেভাবে ভেঙে পড়ার কথা, সেরকম শোক দেখা যাচ্ছে না তার মাঝে।

আবছা আঁধারে ঢাকা লেবু বাগান ঘুরে রক্তিম আঁকিবুঁকি কাটা

আকাশে গিয়ে স্থির হলো হ্যারির দৃষ্টি।

'আমি সাবানের মত পরিষ্কার মানুষ। কোনওদিনই ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে থাকিনি। আমার স্ত্রী সবসময় আমাকে সোজা রেখেছে।'

'আমাদের এখন ভেতরে গিয়ে পুলিশকে ফোন করা উচিত।'

সামনের দরজাটা ফাঁক হয়ে আছে কয়েক ইঞ্চি। দরজার কিনারে এক জায়গায় কোয়ার্টার ইঞ্চি স্টিল প্লেট লাগানো। সিল করার চিহ্ন।

আমার চিহ্ন অনুসরণ করে খেদ ঝাড়ল হ্যারি, 'ঘরের ভেতর ভালই নিরাপদে ছিল ও। কেন যে বাইরে বেরোবার শখ হলো ওর?'

'তিনি কি একাই থাকতেন?'

'কম-বেশি একাই থাকত সে।'

'তার মানে?'

আমার কথা না শোনার ভান করল হ্যারি, কিন্তু উত্তর কিছুটা পেয়ে গেলাম আমি। দরজাবিহীন খিলানের ভেতর দিয়ে লিভিংরুমের দিকে তাকাতেই দেখি, চিতার চামড়ার একটা কোট ভাঁজ হয়ে পড়ে আছে একটা সোফার পিঠে। তা ছাড়া অ্যাশট্রেতে লাল টোপর পরা সিগারেট গোঁজা। মেয়েলী জিনিস ওগুলো।

'নিকি কি বিবাহিত?'

'ঠিক তা নয়।' বিব্রত বোধ করল সে।

'মেয়েটাকে আপনি চেনেন?'

'নাহ্।'

পরিষ্কার বুঝলাম, মিথ্যে বলছে সে। হঠাৎ বাড়ির কোথাও স্প্রিং-এর ক্যাঁচম্যাঁচ শব্দ হলো। দড়াম করে আটকে গেল কিছু একটা। পরক্ষণে স্টার্ট নিল একটা গাড়ির ইঞ্জিন। পাথরে টায়ারের তীব্র ঘর্ষণের শব্দ পাওয়া গেল। দৌড়ে বেরিয়ে এলাম। একটা লাল কনভার্টিবল দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে ড্রাইভওয়ে ধরে।

গাড়ির ছাদ নামানো। সোনালি চুলের একটা মেয়ে আঁকড়ে ধরে আছে হুইল। নিকের মৃতদেহকে সাঁ করে পাশ কাটিয়ে গেটের কাছে পৌঁছুল গাড়িটা। গতি কমিয়ে আনায় আবার তীক্ষ্ণ শব্দ হলো টায়ারে। পেছনের ডান চাকা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম। লাগল না গুলিটা। ইতিমধ্যে হ্যারি এসে গেছে। দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়বার আগেই আমার রিভলভার ধরা হাতটা নামিয়ে দিল সে। কনভার্টিবলটা দ্রুত হাইওয়ের দিকে মিলিয়ে গেল।

'যেতে দিন ওকে,' বলল হ্যারি।

'কে সে?'

'জানি না,' উত্তর দিতে সময় নিল হ্যারি। 'নিকিই কোথাও থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। ওই—ফ্লোসি কিংবা ফ্লোরি বা অন্যকিছু হবে তার নাম। তবে মেয়েটা নিকিকে গুলি করেনি। এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন।'

'মেয়েটাকে আপনি খুব ভাল করেই চেনেন, তাই না?'

'দূর দূর, নিকির মেয়েমানুষ নিয়ে আমি ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাব কেন?' ঝাঁঝিয়ে ওঠার চেষ্টা করল হ্যারি, কিন্তু গলায় জোর পেল না। তবে চূড়ান্ত রকমের বিরক্তি দেখিয়ে বলল, 'যে আপনাকে ভাড়া করেছিল, সে তো এখন মৃত। তা হলে আপনার আর এখানে থাকার দরকারটা কী?'

'দরকার একটাই। এখনও আমার পাওনাটা বুঝে পাইনি।'

'ঠিক আছে, বুঝিয়ে দিচ্ছি পাওনা।'

ছুটে গিয়ে নিকির পকেট থেকে অ্যালিগেটরের (বৃহদাকার কুমির) চামড়ার বিলফোল্ডটা নিয়ে এল সে। টাকার চাপে ফুলে আছে ওটা।

'তা কত দিতে হবে আপনাকে?' জানতে চাইল হ্যারি।

'এই ধরুন শ'খানেক।'

সে আমার হাতে এক শ' ডলার গুঁজে দিয়ে বলল, 'এবার বলুন, এখানে আইনের পা পড়ার আগে আপনার পরিকল্পনা কী?'

'একটা গাড়ি চাই আমার।'

'নিকির গাড়িটা নিয়ে যান। তার আর দরকার হবে না ওটা। এয়ারপোর্টে গাড়িটা রেখে চাবিটা কারও কাছে দিয়ে দেবেন।'

'গাড়িটা নেব তা হলে?'

'নিশ্চয়ই, আমি বলছি আপনাকে।'

'ভাইয়ের সম্পত্তির ওপর কিছুটা মাতব্বরি ফলানো হচ্ছে না আপনার?'

'আরে, এই সম্পত্তির মালিক তো এখন আমিই।' টনটনে বৈষয়িক চিন্তা তার। 'এখন ভালয়-ভালয় কেটে পড়বেন কি না বলুন।'

'আমি আপাতত এখানেই থাকছি, হ্যারি। জায়গাটা আমার ভারি পছন্দ হয়েছে।'

রিভলভারটা এখনও হাতেই আছে আমার। হ্যারি তীব্র ঘৃণা নিয়ে তাকাল ওটার দিকে।

'টেলিফোনের কাছে যাও, হ্যারি,' কঠিন স্বরে আদেশ করলাম। 'শিগ্‌গির পুলিশ ডাকো।'

'তোমার এতদূর স্পর্ধা! আমাকে হুকুম করো! শেষবারের মত সাবধান করছি তোমাকে। ভাল চাও তো সটকে পড়ো, নইলে–!' পেছনের অন্ধকারে থুথু ছিটিয়ে বিদ্বেষ ঝাড়ল সে।

'আমি নিকির ডাকে এসেছি, হ্যারি। তোমার ডাকে নয়।'

সহসাই কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করল সে, 'আমার জন্যে কাজ করতে কত নেবে তুমি?'

'এটা নির্ভর করছে কাজের ধরনের ওপর।'

অ্যালিগেটর ওয়ালেটটা আবার খুলল সে। কিছু ডলার বের করে বলল, 'এখানে আরও শ'খানেক আছে। যদি এখানে থাকতেই চাও, নিকের ঢেমনীর ব্যাপারে মুখটা বন্ধ রেখো। কী বলো?'

আমি কোনও উত্তর দিলাম না, তবে টাকাটা নিলাম। আলাদা

পকেটে রাখলাম ওগুলো। হ্যারি টেলিফোন করল কাউন্টি শেরিফকে।

শেরিফের লোকজন আসার আগে অ্যাশট্রেটা খালি করল হ্যারি। চিতার চামড়ার কোটটা রেখে দিল একটা কাঠের বাক্সে। বসে বসে নিঃশব্দে তার কাজগুলো দেখলাম আমি।

পরবর্তী দুটি ঘণ্টা ডেপুটিদের চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্য দিয়ে কাটল। তারা এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন গুলি খাওয়াটাই হয়েছে মৃত মানুষটির একটা বিরাট অপরাধ। আর মৃতের ভাই হওয়ার অপরাধে হ্যারির ওপরও খুব হম্বিতম্বি করল তারা। শেষমেশ তাদের রাগ গিয়ে পড়ল নিজেদের ওপরই–অনভিজ্ঞতা আর ব্যর্থতার জন্যে। এমনকী তারা চিতার চামড়ার কোটটা পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারল না।

পুলিশ চলে গেলে সন্ধের পর বাড়ি থেকে বেরোল হ্যারি নিমো। হাঁটতে লাগল একদিকে। আমি নীরবে অনুসরণ করলাম তাকে।

কিছুক্ষণ পর হালকা ফ্রেমে গড়া একসারি কটেজ পরিবেষ্টিত জায়গায় পৌঁছুল হ্যারি। বড় একটা তালগাছ মাথা নোয়ানোর ভঙ্গিতে ঝুঁকে আছে ওখানে। প্রথম কটেজটায় ঢুকে পড়ল সে। ভেতরে ঢোকার মুহূর্তে এক ঝলক আলো এসে পড়ল তার মুখে। পরক্ষণে একটা নারী কণ্ঠ কিছু বলল তাকে। তারপর দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর এবং আলো দুটোই মিলিয়ে গেল।

দু'দিকে ঢালু ছাদঅলা পুরানো কটেজটা উঠনের ঠিক ওপারে। রাস্তা পেরিয়ে কটেজের বারান্দার আড়ালে এমনভাবে দাঁড়ালাম, যাতে কটেজটার ওপর লক্ষ রাখা যায়। পর পর তিনটে সিগারেট শেষ করার পর গাঢ় রঙা হ্যাট এবং হালকা পোশাক পরা একটি মেয়ে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। বারান্দায় একটা চক্কর মেরে চলে গেল সে।

কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এল মেয়েটা। আমার ঠিক পেছন

দিক থেকে। নড়েচড়ে সতর্ক হবার আগেই ধরা পড়ে গেলাম। বড়সড় একটা স্ট্র হ্যাণ্ডব্যাগ মেয়েটার হাতে। রাস্তার বাতি থেকে আসা আলোতে লম্বাটে আর কঠিন দেখাচ্ছে তার চেহারা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে অস্ত্র স্পর্শের আগেই স্থির হয়ে গেলাম।

'তোমার জায়গায় থাকলে ওরকম বোকামি মোটেও করতাম না,' শীতল কণ্ঠ মেয়েটার। 'এই ব্যাগটার ভেতর ছোট্ট একটা অস্ত্র আছে আমার। ট্রিগারটা টেনে দিলে কী হবে–খুব ভাল করেই জানো।'

তার ডান হাতটা স্ট্র ব্যাগের ভেতর ঢোকানো। খড়ের ব্যাগটা এখন আমার পেট বরাবর অবস্থান করছে। মেয়েটার ছায়া-ছায়া চেহারার মাঝে প্রবল আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হয়ে জ্বলছে চোখ দুটো। ক্ষীণ আলোতে চিকচিক করছে দাঁতগুলো।

'সাবাস! অভিনন্দন তোমাকে!' নির্বিকার থাকার চেষ্টা করলাম আমি। এ ছাড়া এ মুহূর্তে আর উপায় কী?

'মোটেও ঠাট্টা করছি না,' হুমকি দিল সে। 'দ্রুত গুলি করাই হচ্ছে আমার বিশেষত্ব। কাজেই পকেট থেকে হাতটা বের করলেই বুদ্ধিমানের কাজ করবে।'

পকেট থেকে খালি হাতটা উঠিয়ে আনলাম। পরক্ষণে প্রায় ছোঁ মেরে আমার আগ্নেয়াস্ত্রটা পকেট থেকে তুলে নিল মেয়েটা। তারপর দ্রুত সার্চ করে দেখল আরও কোনও অস্ত্র আছে কি না।

'তোমার পরিচয়টা এবার দাও তো, মিস্টার?' এক কদম পিছিয়ে গেল সে। 'নিশ্চয়ই তুমি আর্টুরো ক্যাস্টোলা নও। কারণ অতটা বুড়ো দেখাচ্ছে না তোমাকে।'

'তুমি কি মহিলা পুলিশ?'

'উঁহুঁ, কোনও প্রশ্ন নয়, শুধু উত্তর। বলো, এখানে কী করছ তুমি?'

'এক বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'মিথ্যে কথা। ঘণ্টা দেড়েক ধরে আমার বাড়ির ওপর চোখ

রাখছ তুমি। জানালা দিয়ে সবই দেখেছি আমি।'

'এজন্যেই অস্ত্র নিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ, হ্যারিকে অনুসরণ করে এসেছ তুমি। আমি মিসেস নিমো। কাজেই আমাকে জানতেই হবে, কেন ওকে ফলো করছ।'

'আরে, হ্যারিই তো আমার সেই বন্ধু, যার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'আবারও মিথ্যে বললে। হ্যারি তোমাকে ভয় পায়। কাজেই তার বন্ধু হতে পারো না তুমি।'

'একজন গোয়েন্দাকে হ্যারি ভয় পেলে আমি কী করতে পারি?'

'আচ্ছা!' ভর্ৎসনা করল সে। 'তা তোমার মতলবটা কী?'

'দেখো, আমিও ঠাট্টা করছি না। আমি সত্যিই একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। সাথে আমার পরিচয়পত্র আছে।'

'দেখাও। তবে সাবধান, কোনও চালাকির চেষ্টা কোরো না। তা হলে একেবারে খতম করে দেব।'

পকেট থেকে আমার পরিচয়পত্রের ফটোকপিটা বের করলাম। রাস্তা থেকে আসা আলোতে সেটা ভাল করে পরীক্ষা করল সে। তারপর ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'তা হলে সত্যিই তুমি গোয়েন্দা। কিন্তু তোমার টিকটিকিগিরি তেমন সুবিধের নয়। কাঁচা। আরও ট্রেনিং নিতে হবে।'

'আরে, আমি কি জানতাম এটা মহিলা পুলিশের বাড়ি?'

'আমি মহিলা পুলিশ! আর কিছু না?'

'যাক গে ওসব। এবার দয়া করে আমার .৩৮-টা দিয়ে দাও। কড়কড়ে সত্তরখান ডলার খসেছে ওটা কিনতে।'

'তার আগে বলো, আমার স্বামীর পিছু নিয়েছ কেন? কে তোমাকে ভাড়া করেছে?'

'নিক, তোমার ভাশুর। আজ লস অ্যাঞ্জেলেসে আমাকে টেলিফোন করে সে। সপ্তাহখানেকের জন্যে বডিগার্ড হিসেবে

ভাড়া করে। হ্যারি তোমাকে বলেনি এসব?'

কোনও জবাব দিল না সে। তাকে বললাম, 'কিন্তু নিকের ওখানে গিয়ে দেখি, দেহরক্ষীর আর প্রয়োজন নেই তার। ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারতাম। বিবেক বাধা দিল। তার মৃত্যু-রহস্য উদ্‌ঘাটন না করে যাই কী করে? হাজার হলেও তিনি আমার একজন ক্লায়েন্ট।'

'ক্লায়েন্ট বাছাইয়ের বেলায় বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত তোমার।'

'কেন, তোমার ভাশুরকে ক্লায়েন্ট হিসেবে বেছে নেয়ায় দোষটা কী হলো?'

'দোষ-টোষ বুঝি না। আমার কথা হচ্ছে, নিকের ব্যাপারে কোনও দায়দায়িত্ব নেই আমার। হ্যারিই শুধু আমার চিন্তাভাবনার বিষয়। বহুকষ্টে তাকে মন্দ পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছি। তবে ভাইয়ের কুসঙ্গ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করতে পারছিলাম না। অবশ্যি হ্যারিকে বিয়ে করার পর ওকে কখনও ঝামেলায় পড়তে দিইনি। কক্ষনো না।'

'এখন?'

'এখনও হ্যারি কোনও সমস্যায় নেই।'

'আইনের ব্যাপারটা ভুলে যাচ্ছ?'

'মানে, কী বলতে চাও?'

'যাক, ওসব বলাবলির দরকার নেই। শিগ্‌গির আমার অস্ত্র ফিরিয়ে দাও, তোমারটাও নামিয়ে ফেলো। এই রসকষহীন আলাপ ভাল লাগছে না আমার।'

দ্বিধা ফুটে উঠল তার চেহারায়। একজন ভয়ঙ্কর মহিলা এ মুহূর্তে প্রচণ্ড রকমের উদ্বিগ্ন। হ্যারির চরিত্রটা ইতিমধ্যে আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার। এই ধরাধামে তার মত কাপুরুষ দ্বিতীয়টি আছে কি না সন্দেহ। খুব সম্ভব বিপদ থেকে বাঁচার বর্ম হিসেবেই এই দুঃসাহসী রমণীকে বিয়ে করেছে সে। এমনিতে

মিসেস নিমো দেখতে কুরূপাই বলা যায়। ঘোড়াটে মুখ, বয়সটাও হ্যারির চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি। তবে মহিলার আর কিছু না থাকুক, সাহসটা আছে। আর আছে বুক ভরা ভালবাসা। স্বামীর প্রতি অপরিসীম ভালবাসাই শুধু একটি মেয়েকে রাতের আঁধারে অজ্ঞাত অস্ত্রধারীর মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারে।

আমার আগ্নেয়াস্ত্রটা ফিরিয়ে দিল সে। সোজা পকেটে চালান করলাম ওটা। রাস্তার শেষ প্রান্ত দিয়ে একদল নিগ্রো ছেলে উদ্দেশ্যহীনভাবে হল্লা করে শিস দিতে দিতে চলে গেল।

মিসেস নিমো ঝুঁকে এল সামনের দিকে। লম্বায় প্রায় আমার সমান সে। গলা যথাসম্ভব খাদে নামিয়ে হিসহিসিয়ে বলল, 'ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গও জানে না হ্যারি। তুমি যদি তাকে এ ব্যাপারে সন্দেহ করে থাকো, তা হলে ভুল করবে।'

'এতটা নিশ্চিত তুমি হলে কী করে?'

'হ্যারিকে আমি খুব ভাল করে জানি। বইয়ের মত পড়তে পারি হ্যারির মনের কথাগুলো। নিককে খুনের চিন্তা ওর মাথায় খেলবেই না। নিক হচ্ছে ওর আপন বড় ভাই, বুঝতে পারছ? পরিবারের একজন সফল ব্যক্তি সে।' তার কর্কশ কণ্ঠে ঘৃণা ফুটে উঠল। 'বিদ্বেষের বশে হয়তো আমি নিকের বিরুদ্ধে কিছু বলতে বা করতে পারি, কিন্তু হ্যারি সবসময় ভাইকে ঠিক দেবতার মত ভক্তি করত।'

'কিন্তু সময় এলে এই ভক্তি-শ্রদ্ধা কর্পূরের মত উবে যায়। বিশেষ করে স্বার্থ আর লোভ যখন হাজির হয়। নিকের মৃত্যুতে বেশ অর্থসম্পদ পাচ্ছে হ্যারি।'

'এক সেন্টও না। এটা একেবারেই অসম্ভব।'

'নিকের উত্তরাধিকারী সে। অস্বীকার করতে চাও?'

'আমি বেঁচে থাকতে নিক নিমোর পাপের টাকা স্পর্শ করতে পারবে না হ্যারি। বুঝেছ?'

'আমি না হয় বুঝলাম। কিন্তু হ্যারি কি এটা বুঝবে?'

'বরাবরের মত বাধ্য করব ওকে। সোজা কথা, হ্যারি তার মৃত ভাইয়ের সম্পত্তিতে একটা আঙুলও চালাতে পারবে না।'

'হ্যারি হয়তো নিজের জন্যে আঙুল চালাবে না। কিন্তু অন্যের জন্যে ইতিমধ্যে নিকের টাকায় হাত দিয়ে ফেলেছে সে। একজনকে বাঁচাতে চাইছে হ্যারি।'

'কাকে?'

'আমরা নিকের বাড়িতে পৌঁছুবার পরপরই একটি সোনালি চুলের মেয়ে ওখান থেকে দ্রুত পালিয়ে যায়। একটা চেরি-রঙা কনভার্টিবল নিয়ে পালায় মেয়েটি। হ্যারি খুব ভাল করেই চেনে তাকে।'

'চেরি-রঙা কনভার্টিবল?'

'হ্যাঁ, কিছু টের পেলে?'

'না, তবে সে নিশ্চয়ই নিকের কোনও শয্যাসঙ্গিনী। সারাক্ষণ শুধু মেয়ে নিয়েই তো পড়ে থাকত লোকটা।'

'হ্যারি তাকে বাঁচাতে চাইছে কেন?'

'তাকে বাঁচাতে চাইছে মানে?'

'মেয়েটা একটা চিতার চামড়ার কোট ফেলে গিয়েছিল। হ্যারি ওটা সযত্নে লুকিয়ে রাখে। তা ছাড়া পুলিশকে যাতে ব্যাপারটা না জানাই, এজন্যে আমাকে কিছু মালপানি দেয় সে।'

'হ্যারি এইসব করেছে?'

'যদি আমার চোখ ভুল না দেখে থাকে আরকী।'

'হয়তো ভুলই দেখেছ। যদি তুমি ভেবে থাকো নিককে মারার জন্যে হ্যারি ওই মেয়েকে ভাড়া করেছে, তা হলে সেটা হবে মস্ত ভুল।'

'ভুল না কী–তা আমি খুব ভাল করেই জানি।'

মিসেস নিমো তার রোগা একটা হাত আমার বাহুর ওপর রেখে মিনতি করে বলল, 'হ্যারিকে রেহাই দাও, প্লিজ! বহু কষ্টে ভাল পথে এনেছি তাকে। আমার প্রথম স্বামী ছিল পাঁড় মাতাল।

তার চেয়েও খারাপ ছিল হ্যারি।'

রাস্তা বরাবর আলোকিত কটেজের দিকে তাকিয়ে মিসেস নিমো। তার বিষণ্ন হাসির অর্ধেকটা দেখতে পাচ্ছি আমি। সহসাই সে গভীর হতাশা নিয়ে বলে ওঠে, 'মেয়েরা কেন যে আমার মত বার বার পুরুষের ফাঁদে পড়ে?'

'ঠিক আছে, মিসেস নিমো। হ্যারিকে ছেড়ে দিলাম।'

আসলে কিন্তু হ্যারিকে ছেড়ে দেয়ার কোনও ইচ্ছে নেই আমার। হ্যারির বউ কটেজে ফিরে যাবার পর কিছুদূর গিয়ে একটা সুবিধাজনক জায়গায় নতুন করে অবস্থান নিলাম। বন্ধ ড্রাই-ক্লিনিং-এর এই দোকানটা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় হ্যারির বাড়ির দরজা। আগুন আর ধোঁয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে এবার আর সিগারেট ধরালাম না। একদম নট-নড়নচড়ন হয়ে সোজা তাকিয়ে রইলাম হ্যারির বাড়ির দিকে।

রাত এগারোটার দিকে বাতি নিভে গেল নিমো কটেজের। পুরো বাড়িটাই ডুবে গেল অন্ধকারে। কিন্তু নড়লাম না তবু। মাঝরাতের কিছু আগে খুলে গেল ওই বাড়ির দরজা। চুপিচুপি বেরিয়ে এল হ্যারি। রাস্তায় এসে এমাথা-ওমাথা সতর্ক দৃষ্টি বোলাল সে। তারপর হাঁটতে শুরু করল। আমার গা ঢাকা দেয়ার জায়গা থেকে ফুট ছয়েক দূর দিয়ে চোরের মত নিঃশব্দে চলে গেল হ্যারি।

নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সন্তর্পণে পিছু নিলাম। শহরের মাঝখানে এসে একটা অল নাইট গ্যারেজে ঢুকে পড়ল সে। মিনিট কয়েক পর বেরিয়ে এল একটা শেভ্রোলে নিয়ে।

অ্যাটেনড্যান্টকে টাকা দিয়ে আমিও বুইক বাগালাম একটা। ঘণ্টায় পঁচাত্তর মাইল স্পিড তুলে ধরে ফেললাম হ্যারিকে। তারপর আবার চলল সেই সতর্ক অনুসরণ।

নিক নিমোর প্রাইভেট লেনে এসে থামতে হলো। অন্ধকার র‍্যাঞ্চহাউসের ভেতর আলো দেখা যাচ্ছে হ্যারির গাড়ির।

প্রাইভেট লেনটা থেকে গজ শতেক দূরে, রাস্তার পাশে গাড়িটা রেখে আলো নিভিয়ে দিলাম। ক'মিনিট পর আবার ফিরে এল শেভ্রোলেটা। হ্যারি একাই সামনের সিটে। আমার অন্ধ বুইকটা আবার পিছু নিল শেভ্রোলের। হাইওয়ে ধরে এগিয়ে চললাম শহরের শেষ প্রান্তের দিকে।

মোটেল এবং শহরের প্রবেশপথের মাঝামাঝি একটা সাইড রোডে সেঁধুল হ্যারি। 'ট্রেইলার কোর্ট' লেখা নিয়ন সাইনের পাশ দিয়ে এগোল সামনের দিকে। একটা শুকনো খাঁড়ির তীরে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেইলারগুলো (চাকাঅলা যে গাড়িগুলো অন্য গাড়ির পেছনে বেঁধে নেয়া হয়) ওগুলোর একটার সামনে গিয়ে স্থির হলো শেভ্রোলেটা। ট্রেইলারের জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। ফুটকি দাগঅলা কিছু একটা নিয়ে গাড়ি থেকে নামল হ্যারি। ট্রেইলারের দরজায় গিয়ে টোকা দিতে লাগল।

আমি সামনের কোণে গিয়ে ইউ-টার্ন নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরেই শেভ্রোলেটা আবার ফিরে এসে নিয়ন সাইনটা পাশ কাটিয়ে চলে গেল হাইওয়ের দিকে। এবার আর পিছু নিলাম না।

গাড়ি থেকে নেমে খাঁড়ির তীর ধরে আলোকিত ট্রেইলারটার দিকে এগোলাম। জানালায় পর্দা ঝুলছে। সেই লাল কনভার্টিবলটা কাছেই পার্ক করা। ট্রেইলারের অ্যালুমিনিয়াম দরজায় টোকা দিলাম আলতো করে।

'কে, হ্যারি?' একটা মেয়ে কণ্ঠ ভেসে এল ভেতর থেকে।

আমি এমনভাবে উত্তর দিলাম, যাতে কণ্ঠস্বরটা পরিষ্কার বোঝা না যায়। দরজা খুলতেই দেখি, সেই সোনালি চুলের মেয়ে। মেয়েটি অল্প বয়েসী, কিন্তু তার বড় বড় নীল চোখ দুটো কেমন ভারী আর বিষণ্ন দেখাচ্ছে। যেন তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছে সে। একটা নাইলন স্লিপ ছাড়া আর কিছু পরনে নেই তার।

'এসব কী?'

ঝাঁঝিয়ে উঠে দরজাটা বন্ধ করার চেষ্টা করল সে। কিন্তু পারল না। শক্তিতে কুলোতে না পেরে মেয়েটা ভয় দেখাল আমাকে, 'শিগ্‌গির চলে যাও এখান থেকে। আমাকে একা থাকতে দাও। নইলে চিৎকার করব।'

'ঠিক আছে, করো।'

সে চিৎকার দেয়ার ভঙ্গি করল, কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না। মুহূর্তেই ভীরু একটা ভাব ফুটে উঠল তার মাঝে। দুর্বল কণ্ঠে শুধোল, 'কে আপনি? পুলিশ?'

'পুলিশ না হলেও খুব কাছাকাছি। ভেতরে ঢুকব আমি।'

'ঢুকুন, লুকোবার কিছুই নেই আমার।'

'সেটাই তো দেখব।'

মেয়েটাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় তার নিঃশ্বাসে মার্টিনির বাসি গন্ধ পেলাম। ছোট্ট রুমটায় এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মেয়েলী সব পোশাক। বাঙ্ক বেডের ওপর চিতার চামড়ার সেই কোটটা যেন ওটার অগণিত সাহসী চোখ মেলে তাকিয়ে। এটাই নিয়ে এসেছে হ্যারি। কোটটা তুলে গায়ে দিল মেয়েটা। তার নার্ভাস হাত দুটো অজান্তেই পশম খুঁটতে শুরু করেছে কোটের।

'হ্যারি তোমার জন্যে খুব খাটছে, তাই না?' শুধোলাম তাকে।

'হয়তো বা।'

'তুমি কি হ্যারির কোনও উপকার করেছ?'

'যেমন?'

'যেমন তার ভাইকে খুন।'

'আপনি ভুল করছেন, সাহেব,' বাঁকা সুরে ভর্ৎসনা করল সে। 'নিক চাচার ভীষণ ভক্ত আমি।'

'তা হলে নিক খুন হওয়ার পর ওভাবে পালিয়ে এলে কেন?'

'আতঙ্কে। ওরকম পরিস্থিতিতে যে-কোনও মেয়ে তাই করত। গভীর ঘুমে অচেতন ছিলাম আমি। হঠাৎ গুলির শব্দে জেগে

উঠলাম। ধাতস্থ হয়ে পোশাক ঠিকঠাক করতে সময় লেগে গেল। তারপর বেডরুমের জানালার দিকে চোখ পড়তেই দেখি, হ্যারি কাউকে নিয়ে ফিরে আসছেন। আচ্ছা, আপনিই কি সেই লোক?

'আমি সেই মুহূর্তে আপনাকে পুলিশ ঠাওরেছিলাম। ড্রাইভওয়েতে রক্তাক্ত নিক চাচা আর আগুয়ান পুলিশ—দুইয়ে-দুইয়ে চার মিলিয়ে বুঝে গেলাম বিপদ হাজির। পালাতে না পারলে রক্ষে নেই। তাই পালিয়ে এলাম। তখন নিকের ক্যারিয়ার ছাড়া আর কোনও চিন্তা কাজ করেনি মাথায়।'

'তা তোমার ক্যারিয়ারটা কী?'

'মডেলিং, অভিনয়।'

'শোনো, যদি সঠিক জবাব না দাও, তা হলে ক্যারিয়ারের বারোটা বেজে যাবে তোমার। এখন বলো, কে গুলি করেছে নিককে?'

সে কাঁপ ধরা কণ্ঠে বলল, 'জানি না। আমি তো তখন গভীর ঘুমে অচেতন। কিছুই দেখিনি।'

'তা হলে তোমার ফেলে আসা কোটটা হ্যারি তোমাকে দিয়ে গেল কেন?'

'এই হত্যাকাণ্ডে আমি জড়িয়ে পড়ি—এটা চান না হ্যারি। হাজার হলেও তিনি আমার বাবা।'

'হ্যারি নিমো তোমার বাবা?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, তোমার নামটাই তো এখনও জানা হয়নি?'

'জিনি। জিনি ল্যারু।'

'হ্যারি তোমার বাবা হলে তো তোমার নামের শেষে নিমো থাকার কথা! তা ছাড়া হ্যারিকে নাম ধরে ডাকছ কেন?'

'হ্যারি আমার আপন বাবা নন। সৎ বাবা।'

'ব্যাপারটা কেমন খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছে না? নিক চাচা বলতে অজ্ঞান তুমি, অথচ হ্যারির প্রতি সেরকম আন্তরিকতা নেই!'

'হ্যাঁ, এ কথা ঠিক, রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও নিক চাচাকে আপন চাচার মতই জানতাম আমি।'

'তুমি বাবা-মার সাথে থাকো না কেন?'

'মার জন্যে। ছেলে হোক বুড়ো হোক, কোনও পুরুষের সাথে হেসে-হেসে একটু কথা বললেই রেগে আগুন হয়ে যায় ওই জাঁহাবাজ মহিলা।'

'তুমি বুঝি ছেলেদের সাথে হাসি-তামাশা করে মজা পাও, জিনি?'

ফিদারকাট চুলে বিশেষ ভঙ্গিমায় ঝাঁকুনি দিল জিনি। রক্তে শিহরণ জাগানো পারফিউমের সৌরভ এল। ফর্সা একটা কাঁধ অনাবৃত করে সে বাণমারা হাসি হেসে বলল, 'তোমার কী মনে হয়? হাসি-তামাশা জমবে তোমার সাথে?'

'নিকের সাথে বেশ জমিয়েছিলে—তাই না?'

'তুমি নিকের চেয়েও মজার!'

'বোধহয় স্মার্টও বেশি। হ্যারি আসলেই কি তোমার সৎ বাবা?'

'বিশ্বাস না হলে তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারো। টুল স্ট্রিটের কোথাও থাকে সে। বাড়ির নম্বরটা—'

'আমি চিনি তার বাড়ি।'

কিন্তু বাড়িতে নেই হ্যারি। কটেজের দরজায় অনেকক্ষণ নক করেও কোনও সাড়া পেলাম না। দরজার নব ঘোরাতেই খুলে গেল আলগোছে। পেছনে কোথাও আলো জ্বলছে। আশপাশে অন্যান্য কটেজগুলো অন্ধকার। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। রাস্তা একদম ফাঁকা। রিভলভার বের করে ভেতরের দিকে এগোলাম।

সিলিং বাল্বের টিমটিমে আলোতে রঙচটা পুরানো আসবাব এবং জীর্ণ কম্বল ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছু চোখে পড়ল না বড় ঘরটায়। এই লিভিংরুমটা ছাড়াও এক চিলতে আরামের জায়গা

আর ছোট্ট একটা রান্নাঘর আছে বাড়িটায়। সবকিছুই দারিদ্র্যপীড়িত, তবে পরিচ্ছন্নতার কমতি নেই। বাড়ির সবগুলো দেয়াল হাতড়ে শুধু একটি ছবিই পাওয়া গেল। আর তা হচ্ছে জিনির। কিশোরী বয়সে পার্টি ড্রেসে তোলা। ছবিতে আদুরে একটা ভাব ফুটে আছে তার মাঝে। তখনও জিনি বুঝতে পারেনি, তার সুন্দর চেহারা আর নিখুঁত গড়নের শরীর কতটা অসাধ্য সাধনে সক্ষম।

কেন জানি অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম। অসহ্য লাগায় বেরিয়ে এলাম বাইরে। এমন সময় গাড়ির শব্দ কানে এল। দ্রুত এগিয়ে আসছে শব্দটা। একটু পরেই হ্যারি নিমোর সেই ভাড়া করা শেভ্রোলেটা স্ট্রিটলাইটের আলোয় পরিষ্কার চোখে পড়ল। গাড়ির সামনের চাকাগুলো এলোমেলোভাবে এগোচ্ছে। কটেজে এসে একখণ্ড পাথরের ওপর বেকায়দাভাবে উঠে গেল শেভ্রোলের সামনের একটা চাকা। তারপর বিচ্ছিরি একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল ওটা।

সাইডওয়াক পেরিয়ে দ্রুত দরজা খুললাম গাড়ির। স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ঝুঁকে আছে হ্যারি। বেশ বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে তাকে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বুক। মুখের ভেতরেও উঠে এসেছে রক্ত। জড়িয়ে আসা কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'আমাকেও শেষ করল ও।'

'কে, হ্যারি? জিনি?'

'না, সে নয়। তবে তার জন্যেই–'

কথা শেষ করার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল হ্যারি। হ্যারির নিষ্প্রাণ দেহটা বের করে সাইডওয়াকের ওপর রাখলাম, যাতে লাশটা খুঁজে পেতে সুবিধে হয় পুলিশের।

আমার গাড়িটা নিয়ে এবার ট্রেইলার কোর্টের দিকে রওনা হয়ে গেলাম।

জিনির ট্রেইলারে আলো জ্বলছে এখনও। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। বাঙ্ক বেডের ওপর সুটকেসে কাপড়চোপড়

ভরছে জিনি। ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জমে গেল সে। সম্মোহিতের মত ভীরু পাখির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্রের দিকে।

'কোথায় পালাচ্ছ, খুকি?'

'এই শহরের বাইরে।'

'তার আগে আমাদের কথোপকথনটা হয়ে যাক।'

'আর সব কথাই বলেছি তোমাকে। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করোনি। তা যাক গে, হ্যারির সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ, তবে সে এখন মৃত। মাছির মত মারা পড়ছে তোমার পরিবারের লোকজন।'

অগোছালো বিছানার ওপর ধপ্ করে বসে পড়ল জিনি। 'মারা গেছেন? তোমার ধারণা আমি খুন করেছি তাঁকে?'

'আমার ধারণা, খুনীকে তুমি ভাল করেই চেনো। কারণ মারা যাবার পূর্বমুহূর্তে তোমার নাম বলে গেছে হ্যারি। তুমিও এখানে জড়িত।'

'আমার জন্যেই হ্যারি খুন হয়েছেন–এই বলতে চাও?' চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল জিনির। চেহারা দেখে বুঝলাম, ঝটিকা চিন্তা চলছে ওর মাথায়।

'নিক এবং হ্যারি–দু'জনেই একই খুনীর হাতে মারা পড়েছে। বলো, কে সে?'

'গড!' হতাশায় ডুকরে উঠল সে। নতুন কিছু একটা আবিষ্কারের চিহ্ন ফুটে উঠেছে তার দু'চোখে।

হাইওয়ে ধরে ছুটে যাওয়া একটা ডিজেল ইঞ্জিনের গর্জন আমাদের দীর্ঘ নীরবতায় ছেদ ঘটাল। জিনি ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'এখন বুঝতে পেরেছি ওই উন্মাদিনীই খুন করেছে নিককে।'

'তোমার মা, মিসেস নিমোর কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে গুলি করতে দেখেছ তুমি?'

'না। তবে গত এক সপ্তা ধরে নিকের বাড়ির ওপর নজর রাখছিল সে। আর আমার ওপর তার শ্যেনদৃষ্টি তো সবসময়ই থাকে।'

'নিকের হত্যাকারীকে চিনতে পেরেছ বলেই কি শহর ছেড়ে পালাচ্ছ?'

'হয়তো তাই। আবার তা না-ও হতে পারে। আসলে এত কিছু তলিয়ে দেখিনি। এখানে ভাল লাগছে না, ব্যস।'

আমার পেছনে কিছু একটা দেখে থমকে গেল জিনি। ঘাড় ফেরাতেই দেখি, মিসেস নিমো। সেই স্ট্র ব্যাগটা বিশেষ ভঙ্গিতে বুকের কাছটায় ধরে আছে সে।

তার ডান হাতটা ব্যাগ থেকে বেরোবার আগেই গুলি করলাম আমি। ডান বাহুতে লাগল গুলিটা। ছিটকে গিয়ে দরজার ফ্রেমে ধাক্কা খেল মিসেস নিমো। পরক্ষণে বাঁ হাতে চেপে ধরল ঝুলে পড়া হাতটা। চেহারায় ফুটে উঠল তীব্র বেদনার চিহ্ন।

তার হাত থেকে যে আগ্নেয়াস্ত্রটি পড়ে গেল, সেটা সস্তা একটা .৩২ রিভলভার। পরীক্ষা করে দেখলাম, একটি মাত্র গুলি খরচ হয়েছে ওটার।

'এটা শুধুই হ্যারির ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে, তাই না? এই রদ্দি রিভলভার দিয়ে নিককে অতদূর থেকে গুলি করা সম্ভব নয়।'

'হ্যাঁ,' ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত গড়ানো হাতের দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'নিকের ওপর আমার পুরানো পুলিশ গানটা ব্যবহার করেছি। নিককে মারার পর ওটা ফেলে দিয়েছি সাগরে। তখন জানতাম না, আবার আমাকে অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। মাত্র আজ রাতেই কিনেছি এই সুইসাইড গানটা।'

'হ্যারিকে মারার জন্যে?'

'না, তোমাকে। ভেবেছিলাম, তুমি আমার পেছনে লেগেছ। আমি জানতাম না, নিক আর জিনির ব্যাপারটা হ্যারি খুব ভাল করেই জানে। তোমার কাছ থেকে ওই মেয়ের বর্ণনা শুনে সব

বুঝে ফেলি আমি। আর পরিস্থিতিও তখন আমূল বদলে যায়।'

'জিনির জন্ম তো তোমার প্রথম স্বামীর ঘরে?'

'হ্যাঁ, আমার একমাত্র মেয়ে,' জিনির দিকে ফিরল সে। 'আমি যা যা করেছি, সব তোর জন্যেই, জিনি। এই পৃথিবীতে অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা আমি দেখেছি রে! প্রচুর দুঃখ-কষ্ট সয়েছি। আমি চাই না, কোনও পুরুষের হিংস্র থাবায় নিষ্পেষিত হোক তোর সুন্দর জীবন।'

জিনি কোনও উত্তর দিল না। আমি বললাম, 'নিককে হত্যার কারণ বুঝতে পারলাম। কিন্তু হ্যারিকে মরতে হলো কেন?'

'জিনিকে ফুঁসলিয়ে নিকের কাছে পাঠানোর জন্যে টাকা খেয়েছিল সে,' গভীর বেদনার সাথে বলল মিসেস নিমো। 'ঘণ্টাখানেক আগে একটা বারে চেপে ধরেছিলাম হ্যারিকে। সব স্বীকার করেছে সে। কাজেই ওকে ক্ষমা করি কী করে?'

'নিক, হ্যারি দুই শত্রু তো মারলে, কিন্তু এখানে এলে কী উদ্দেশ্যে? জিনি কি তোমার তিন নম্বর টার্গেট?'

'না না, তা কেন? জিনিকে আমি শুধু জানাতে এসেছি, আমাকে ও যতই শত্রু ভাবুক, এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত স্বপ্ন শুধু ওকে ঘিরেই। ওর জন্যেই আমার বেঁচে থাকা।'

মেয়ের দিকে স্নেদনার্ত ভালবাসা নিয়ে তাকাল মিসেস নিমো। জিনি আর্দ্র কণ্ঠে প্রবোধ দিল তাকে, 'আমাকে ক্ষমা করো, মা। তোমাকে এতদিন ভুল বুঝেছি আমি।'

আমি মিসেস নিমোকে তাড়া দিয়ে বললাম, 'এখন আমাদের আইনের ঘরে যেতে হবে, চলো।'

মূলঃ রস ম্যাকডোনাল্ড
রূপান্তরঃ শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ

ডেস্কের পাশে বসে হঠাৎ কান খাড়া করলেন অধ্যাপক, তাঁর সামনে পড়ে আছে দ্বিরাশিক উপপাদ্যের ওপর একটা নতুন প্রবন্ধগ্রন্থ। একটা শব্দ ধরা পড়েছে তাঁর কানে। শব্দটা খুব ক্ষীণ, তবে চমকে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। আবার যখন ভেসে এল শব্দটা, চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেলেন তিনি বন্ধ দরজার দিকে।

'কে?' জানতে চাইলেন অধ্যাপক।

'ডুইগিনস। দরজা খুলুন!'

দরজার বোল্ট নামিয়ে, গ্যাসের শিখাটা আরও একটু বাড়িয়ে দিলেন অধ্যাপক। 'একটু আগে এসে ভালই করেছ। সব ঠিক আছে তো?'

ডুইগিনসের শরীরটা ছিপছিপে, একমাথা কালো ঝাঁকড়া চুল, ঝোলানো জুলফি। প্রতিভাবান ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে নিজেকে সে নিখুঁতভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। অধ্যাপক এ ছদ্মবেশে তাকে ব্যবহার করেছেন বহু বার, কখনও কোনও সমস্যা হয়নি।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ডুইগিনস। 'আর্চিবল্ড অ্যাণ্ড্রুজের সঙ্গে দেখা করে আমার প্রয়োজনের কথা বলেছি। প্রথমটায় খানিক গাঁইগুঁই করল, তবে পারিশ্রমিকের কথা শুনে একেবারে হামলে পড়ল।'

'চমৎকার!' পকেট থেকে নোটবই বের করে তাতে একটা টিকচিহ্ন দিলেন অধ্যাপক, তারপর নামের একটা তালিকার ওপর পেন্সিলের ডগা বুলিয়ে আবার বললেন, 'আগামীকাল সন্ধ্যায় আমরা শেষ একটা আলোচনা করব। দেখো, সবাই যেন হাজির

থাকে।'

'নিশ্চয়!'

ডুইগিনস চলে যেতে লম্বা, ফ্যাকাসে চেহারার অধ্যাপক ছুটে গেলেন জানালার পাশে। ডুইগিনস ততক্ষণে পৌঁছে গেছে রাস্তার বাঁকে। তীক্ষ্ণ চোখে বাঁকের মুখের গলিটার দিকে চেয়ে রইলেন অধ্যাপক। না, কোনও পুলিশ ডুইগিনসের পিছু নেয়নি। মুচকে হাসলেন তিনি। তা হলে তাঁর মহা পরিকল্পনা সত্যিই বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে!

গ্যাসের কাঁপা-কাঁপা শিখায় দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট পাঁচটা মুখ। বিভিন্ন পেশার বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন কয়েকজন লোক পরদিন সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়েছে অধ্যাপকের কোয়ার্টারে। ডুইগিনসের পাশেই বসে আছে কুখ্যাত ব্যাঙ্ক ডাকাত কক্স, তার পাশে ছুরি চালানোয় সিদ্ধহস্ত কুইন—যার সবচেয়ে বড় গর্ব, বছর দুই আগে পুলিশ তাকে কিছু দিন খুঁজেছে জ্যাক দ্য রিপার মনে করে। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল মোরানও রয়েছে এই আলোচনা সভায়, তার পাশে জেঙ্কিনস—ঘোড়া চালনায় বিশেষজ্ঞ এক গুণ্ডা।

'এবার,' লোকগুলোর দিকে চোখ মিটমিট করে তাকিয়ে বললেন অধ্যাপক, 'আলোচনা শুরু করা যাক।'

'ঘটনাটা আগামীকাল ঘটবে?' জানতে চাইল কক্স।

মাথা দোলালেন অধ্যাপক। 'আগামীকাল, ২৩ জানুয়ারি, সিটি আর সাবার্বান ব্যাঙ্ক যথারীতি তাদের শুক্রবারের টাকা পাঠাবে শাখাগুলোয়। আগামীকাল সকাল নয়টার পরপরই দু'ঘোড়ার একটা ভ্যান ফ্যারিংডন স্ট্রিটের পাশের গলিতে ঢুকে এগোতে থাকবে ব্যাঙ্কের পেছনদিকের প্রবেশপথ অভিমুখে। জনৈক আর্চিবল্ড অ্যাণ্ড্রুজের ফ্ল্যাট গলিটার ঠিক ওপরে। আমাদের ডুইগিনস শুক্রবার সারা সকালের জন্যে অ্যাণ্ড্রুজকে অন্য কোথাও চলে যেতে রাজি করিয়েছে। ডুইগিনস, গল্পটা তুমিই আমাদের

শোনাও।'

ঝাঁকড়া-চুলো লোকটা শুরু করল তার গল্প। 'অ্যাণ্ড্রুজের সঙ্গে দেখা করলাম গতকাল বিকেলে। বললাম, অক্সফোর্ড স্ট্রিটে আমার একটা মশলার দোকান আছে। সে যদি শুক্রবার সকালে বিভিন্ন দোকান ঘুরে কয়েকটা মশলার দাম শুনে আসে, তা হলে পারিশ্রমিক হিসেবে পাবে দশ পাউণ্ড। প্রথমটায় আপত্তি করেছিল অ্যাণ্ড্রুজ, কিন্তু আমি জানতাম রাজি হবেই। হাত-পা ছেড়ে বসে থাকা বেকারদের কাছে দশ পাউণ্ড কম নয়।'

'আহা!' বললেন অধ্যাপক বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে। 'আমার মনে হয়, বেচারি অ্যাণ্ড্রুজ মশলার দাম ছাড়াও পুলিশের প্যাঁদানি কাকে বলে টের পাবে। কক্স, কুইনের সঙ্গে তুমি ফ্ল্যাটে যাবে ঠিক সাড়ে আটটায়। তোমরা দু'জন জানালার পাশে এমনভাবে বসবে, যেন গলিটা পরিষ্কার দেখা যায়। দু'ঘোড়ার ভ্যানটা টাকা নিতে এলেই জানালা খুলে তোমরা প্রস্তুত হয়ে থাকবে লাফ দেয়ার জন্যে। ডাকাতিটা সারতে হবে ভ্যান গলিতে থাকতেই। একবার জনবহুল রাস্তায় ভ্যান গিয়ে পড়লে ডাকাতি করা অসম্ভব। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে ভ্যানটা যখন ফিরতি পথ ধরবে, তখন ওটার সামনে থাকবে সশস্ত্র গার্ডদের একটা ক্যারিজ। অ্যাণ্ড্রুজের জানালা থেকে তোমরা দু'জন অনায়াসেই লাফিয়ে পড়তে পারবে ভ্যানের ওপর।'

'একটা প্রশ্ন,' বলল কক্স। 'আপনার সব কথাই বুঝতে পারলাম, কিন্তু আমরা ভ্যানের ওপর লাফিয়ে পড়েছি জানার পর কি গার্ড দু'জন চুপ করে থাকবে?'

চোখ মিটমিট করলেন অধ্যাপক, মুখে হাসির রেখা দেখা যায় কি যায় না। 'তোমার কী ধারণা, এই অতি সাধারণ ভাবনাটা আমার মাথায় আসেনি? সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। কাছেপিঠেই জেঙ্কিনস থাকবে একজন ক্যাব চালকের ছদ্মবেশে। যথাসময়ে ঘোড়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে সে, এবং ক্যাব নিয়ে এসে

পড়বে গার্ডদের ক্যারিজ আর ভ্যানের মাঝখানে। তখন কুইন খতম করে দেবে ভ্যানের চালককে, আর তুমি ভ্যান ঘুরিয়ে রওনা দেবে ফ্যারিংডন স্ট্রিটের উল্টো দিকে। তারপরেও ক্যাব পেরিয়ে যদি তোমাদের পিছু নেয় গার্ডেরা, বন্দুক নিয়ে তৈরি থাকবে মোরান।'

'আর আপনি কোথায় থাকবেন?' জানতে চাইল কুইন।

'ডুইগিনসকে নিয়ে কাছেই অপেক্ষা করব. আমি, তোমরা ভ্যান নিয়ে রওনা দিলেই অনুসরণ করব তোমাদের।' ঘুরে সাইডবোর্ড থেকে কাট-গ্লাসের একটা ডিক্যান্টার তুলে নিলেন অধ্যাপক। 'এবার এসো সবাই, আমাদের আগামীকালের নিশ্চিত সাফল্যের জন্যে অগ্রিম আনন্দ প্রকাশ করি।'

পরদিন সকালে আটটার আগে আগে যখন ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে এল আর্চিবল্ড অ্যাণ্ড্রুজ, রাস্তার উল্টো পাশে দাঁড়িয়ে তা লক্ষ করলেন অধ্যাপক আর ডুইগিনস। কনকনে বাতাস বইছে জানুয়ারির সকালে। শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ওভারকোটের কলারটা তুলে দিলেন অধ্যাপক।

'একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ হচ্ছে,' অ্যাণ্ড্রুজকে রাস্তা ধরে এগোতে দেখে মন্তব্য করল ডুইগিনস।

'বেশ, বেশ!' ভেতরের পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করে ঢাকনি খুলে ফেললেন অধ্যাপক। 'কক্স আর কুইনের তো এতক্ষণে রওনা দেয়ার কথা।'

কুইন আর কক্স অ্যাণ্ড্রুজের ফ্ল্যাটে ঢুকল ঠিক সাড়ে আটটায়। ডুইগিনস একটু এগিয়ে গিয়েছিল, ফিরে এসে বলল, 'কক্স আর কুইন পৌঁছে গেছে। ওদের দেখতে পেলাম জানালা দিয়ে।'

'আর মোরান?'

'এইমাত্র এল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, গলির ঠিক মুখে। বন্দুক লুকিয়ে রেখেছে ছড়ির মধ্যে।'

'জেঙ্কিনস?'

'পাশেই অপেক্ষা করছে ক্যাব নিয়ে।'

মাথা ঝাঁকালেন অধ্যাপক। সব ঠিক আছে।

ন'টা ছয় মিনিটে দু'ঘোড়ার ভ্যানটা এসে ঢুকল গলিতে অদ্ভুতভাবে, অবিকল সরীসৃপের মত, অধ্যাপকের মাথা ঘুরতে লাগল একপাশ থেকে আরেক পাশে।

খুব ধীর গতিতে কাটতে লাগল সময়। তীক্ষ্ণ চোখে অধ্যাপক লক্ষ করতে লাগলেন, কোথাও কোনও ঝামেলা বাধে কি না। সব ঠিকঠাকই এগোচ্ছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন অধ্যাপক-

'ডুইগিনস!'

'কী ব্যাপার!'

'ওই দেখো, একজন লোক ছুটে আসছে জনতার মাঝখান দিয়ে-আর্চিবল্ড অ্যাণ্ড্রুজ এত তাড়াতাড়ি ফিরছে কেন?'

'আরে, তা-ই তো মনে হচ্ছে!'

'চলো, ওকে থামাতেই হবে।'

দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে এল দু'জনে। চেঁচিয়ে ডুইগিনস বলল, 'এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে কেন? তোমাকে না আমি একটা কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলাম!'

থেমে গেল আর্চিবল্ড অ্যাণ্ড্রুজ, ডুইগিনস আর অধ্যাপকের দিকে পালা করে তাকিয়ে তোতলাতে লাগল, 'আমি-আমি-'

'হ্যাঁ, কী হয়েছে বলো!' ধমকে উঠল ডুইগিনস। 'ইনি আমার মশলা ব্যবসার পার্টনার। তুমি কভেন্ট গার্ডেন মার্কেট থেকে আমাদের জন্যে মশলার দাম শুনে এসেছ?'

'না, স্যর,' বিড়বিড় করে বলল অ্যাণ্ড্রুজ। 'মানে, ঘটনা ঘটে গেছে অন্যরকম। গত রাতে আমার এক বন্ধুকে বলেছিলাম আপনাদের ব্যবসার কথা, বলেছিলাম আপনি আমাকে একটা কাজ দিয়েছেন। আমার সেই বন্ধুটি, মানে ডাক্তার আবার সেই গল্প বলেছে তার এক বন্ধুকে। সে নাকি একজন বিখ্যাত

ডিটেকটিভ।'

'এখনই কেটে পড়তে হবে,' চেঁচিয়ে উঠলেন অধ্যাপক, 'সে এখানে এলে আর–'

কিন্তু তাঁরা পা বাড়াবার আগেই ঘটনা শুরু হয়ে গেল গলিতে। টাকা নিয়ে ফিরতি পথ ধরল ভ্যান, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানালা থেকে কক্স আর কুইন লাফিয়ে পড়ল ভ্যানের ছাদে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠল বাঁশি, চোখের পলকে কোত্থেকে যেন পুলিশ এসে ঘিরে ধরল ভ্যানটা। জনা বারো পুলিশ টেনে-হিঁচড়ে নামাল কক্স আর কুইনকে।

'জলদি!' আবার চেঁচিয়ে উঠলেন অধ্যাপক। 'আমাদের পালাতেই হবে!'

'আর অন্যদের কী হবে?' জানতে চাইল ডুইগিনস।

অন্যদের ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ক্যাব থেকে লাফিয়ে নেমে পালাবার চেষ্টা করল জেঙ্কিনস, কিন্তু দৌড় শুরু করার আগেই তার সামনে এসে উপস্থিত হলো লম্বা, কড়া চেহারার এক লোক, তার ধপধপে লম্বা আঙুলগুলো ইস্পাতের মত চেপে বসল জেঙ্কিনসের দুই বাহুতে।

'এখন আর তাদের পালাবার উপায় নেই,' বললেন অধ্যাপক। 'আশা করি মোরান পালাতে পারবে।'

'এত তাড়াতাড়ি পুলিশ আমাদের পরিকল্পনা টের পেল কীভাবে?'

'ওই যে লম্বা লোকটা জেঙ্কিনসকে ধরে আছে, শয়তানও ওর চেয়ে অনেক ভাল! যে মুহূর্তে ও লক্ষ করেছে, অ্যাণ্ড্রুজের ফ্ল্যাট থেকে ব্যাঙ্কের গলিটা দেখা যায়, সব বোঝা শেষ হয়ে গেছে তার।'

'কিন্তু বুঝল কীভাবে?' অধ্যাপকের পেছনে পেছনে ছোট একটা রাস্তায় ঢুকে জিজ্ঞেস করল ডুইগিনস। 'আমি অ্যাণ্ড্রুজকে

দশ পাউণ্ড দিতে চেয়েছিলাম বলে? আর লম্বা ওই লোকটাই বা কে, যার বুদ্ধির কাছে আমরা মার খেয়ে গেলাম?'

'ওটাই সারা লণ্ডনের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষ,' জবাব দিয়ে হাঁটার গতি আরও বাড়িয়ে দিলেন অধ্যাপক মরিয়ারটি। 'নাম–শার্লক হোমস।'

মূলঃ এডওয়ার্ড ডেনটিনজার হোচ
রূপান্তরঃ শাহীনা পারভীন চৌধুরী

এক হলদে কুকুরের কিছু স্মৃতি

নিম্নশ্রেণীর একটি পশুর লেখা পড়ার জন্য আপনারা নড়েচড়ে বসবেন—এমনটা আমি আশা করছি না। জঙ্গল-টঙ্গল নিয়ে লেখা বইগুলোতে ভালুক, সাপ আর বাঘের যেসব রোম খাড়া করা গল্প ছাপা হয়, আমার কাছ থেকে তেমন কিছুও আশা করবেন না দয়া করে। হলুদ রঙের একটি কুকুর, যে কি না তার পুরো জীবনই কাটিয়ে দিয়েছে নিউ ইয়র্ক শহরের সস্তা এক ফ্ল্যাটের এক কোণে পুরানো একটি সাটিনের কাপড়ের উপর, তার কাছ থেকে সু-সাহিত্যের এমন নিদর্শন আশা করা নিতান্তই বাতুলতা।

আমার জন্ম অতি সাধারণ এক নেড়ি কুকুর হিসেবে। স্বভাবতই জন্মতারিখ, জন্মস্থান, জাত, ওজন, এসব কিছুই অন্তত আমার কাছে অজ্ঞাত। আমার প্রথম স্মৃতি হচ্ছে যে এক বুড়ি একটি ঝুড়িতে করে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে এক মোটা মহিলার কাছে আমাকে বিক্রির ধান্ধা করছিল। বুড়ি আমার প্রশংসায় ছিল...যাকে বলে পঞ্চমুখ! পেমেরানিয়াম-হাম্বল টোনিয়ান-লাল আইরিশ-কোচিন-চীনা বংশলতিকার এক জাত ফক্স টেরিয়ার হিসেবে বুড়ি আমাকে গছিয়ে দিল ওই মহিলার কাছে। মোটা ওই মহিলা আমাকে তার বাজারের থলেতে পুরে বাড়ি নিয়ে গেলেন। তারপর থেকে আমি ওখানেই আছি। পাক্কা দু'শো পাউণ্ড ওজনের কোনও মহিলাকে হলদে রঙের চারপেয়ে কোনও জীবকে কোলে তুলে ওই বেচারার মুখে দুর্গন্ধ ভরা নিঃশ্বাস ছড়িয়ে যদি কখনও আদর করতে দেখেন, যদি বলতে শোনেন, 'ওরে আমার

সোনামণি', 'ওরে আমার চাঁদ'—তবে বুঝে নেবেন হলদে ওই অধমটিই হচ্ছি আমি!

আস্তে আস্তে কুলীন বংশের এক কুকুরছানা থেকে ক্রমশ আমি পরিণত হলাম এক নাম-পরিচয়বিহীন অতি সাধারণ এক কুকুরে। অবশ্য মনিব, মানে ওই মোটা মহিলা, আমার জাতপাত নিয়ে মাথা ঘামাতেন না এক বিন্দু। চেহারা-সুরতে হাউণ্ড কুকুরের লেশমাত্র না থাকলেও ম্যাডিসন স্কোয়ারে সাইবেরীয় ব্লাডহাউণ্ডদের যে প্রদর্শনী হয় সেখানেও তিনি আমার নামটা ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন! যদিও দু'জন পুলিশের ঘোরতর আপত্তির কারণে আমার নামটা শেষ পর্যন্ত তালিকাভুক্ত করা যায়নি।

এবার বলছি নিউ ইয়র্কে আমার বাসস্থানটার কথা। নিতান্ত সাদামাটা একটা ফ্ল্যাট। একটি মাত্র ঘরের মেঝে শ্বেত পাথরের, বাকিগুলো অতি সাধারণ। আমার মনিব ফ্ল্যাটটি যখন ভাড়া নেন তখন ওটা ছিল খালি, কোনও আসবাব ছিল না ওতে। কালক্রমে ফ্ল্যাটটি বোঝাই করে তোলেন নানান আসবাবপত্রে এবং অবশ্যম্ভাবী ভাবেই ওই আসবাবের ভেতর একটি ছিল—তাঁর স্বামী।

ওই দু'পেয়ে জীবটার জন্য আমার সত্যি সত্যিই ভারি মন খারাপ হত। ছোটখাট একটা মানুষ। মাথায় ধূসর চুল। আর গোঁফ জোড়া অনেকটা আমারই মত। লোকটা যাবতীয় এঁটো বাসন ধুয়ে রাখত এবং সেগুলো যত্ন করে মোছার সময় তার স্ত্রী, মানে আমার মনিবের কাছ থেকে অন্য সব ফ্ল্যাটের মহিলাদের সম্পর্কে নানা ঘটনা এবং রটনা শুনত। প্রতি সন্ধ্যায় মহিলা যখন রাঁধতে বসতেন তখন স্বামী রত্নটি আমাকে শেকলে বেঁধে বেড়াতে বের হত।

পুরুষজাতি যদি কখনও জানতে পারত তাদের অবর্তমানে তাদের স্ত্রীরা কী করে, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা কক্ষনো

বিয়ে করত না। গলায় সামান্য বাদাম তেল ঘষা, নোংরা থালা-বাসনগুলো আধোয়া অবস্থায় ফেলে রাখা, বরফওয়ালার সাথে কমপক্ষে আধ ঘণ্টা ধরে আড্ডা, পুরানো চিঠির বস্তা খুলে সেগুলোতে চোখ বুলানো আর যখন-তখন জানালার ফুটো দিয়ে পাশের ফ্ল্যাটে উঁকি মারা, এমনতর সব কাজ করেই তাদের সময় কাটে। অবশ্য স্বামীপ্রবর বাড়ি ফেরার বিশ মিনিট আগে ঘরদোর একটু গুছিয়ে দশ মিনিটের জন্য সেলাইয়ের কাজে ব্যস্ত হতে তারা কখনওই ভুলে যায় না।

এই ফ্ল্যাটেই আমার সারমেয় জীবনের দিনপাত ঘটছিল। সমস্ত দিন ঘরের কোণে শুয়ে থেকে আমার মনিব কীভাবে দিন কাটান তা দেখাই ছিল আমার প্রধান কাজ। অবশ্য কখনও কখনও ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখতাম যে আমি বেড়াল তাড়া করে বেড়াচ্ছি, অথবা যেসব বৃদ্ধ মহিলা বেড়ালের বাচ্চা কোলে করে বেড়ায় তাদের দেখে চিৎকার করছি, এবং আমার বিশ্বাস, সমস্ত কুকুর জাতিই এই করেই দিন কাটায়।

স্বামী বেচারার জন্য আমার ভারি দুঃখ হত। আমরা দুজনে ছিলাম একই রকম। বিশেষ করে আমরা যখন বেড়াতে বেরোতাম তখন সবাই আমাদের দিকে যেভাবে তাকাত, আমরা বুঝতাম আমাদের দু'জনকে একই রকম লাগছে। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। তাই সাধারণত আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে বরফ ঢাকা রাস্তায় চলে যেতাম। কেননা কে না জানে, বড় রাস্তায় চলে মোটরগাড়ি আর বরফ ঢাকা রাস্তায় চলে গরীব।

এক সন্ধ্যায় আমরা যখন বেড়াচ্ছিলাম তখন যথারীতি আমি চেষ্টা করছিলাম নিজেকে একটি উঁচু বংশের সেইন্ট বার্গার্ড কুকুরের মত দেখাতে, আর বুড়ো স্বামী বেচারাও চেষ্টা করছিলেন যেন তাঁকে আরও দুঃখী আর করুণ দেখায়। আমি মুখ তুলে তাঁর দিকে চেয়ে বললাম, 'আরে, আপনাকে এমন অসুখী দেখাচ্ছে কেন? আপনার অবশ্য কপালটাই মন্দ; বৌ-এর একটা চুমু তো

দূরের কথা, তার কোলে বসে তার মুখ থেকে দুটো প্রেমের কথা শোনার বরাত নিয়ে আপনার জন্ম হয়নি। তবে আপনি এই ভেবে তো আনন্দ করতে পারেন যে আমার মত একটা কুকুর হয়ে আপনার জন্ম হয়নি। মনে সাহস রাখুন, সাহেব; শোনেননি, দুঃখের পরেই সুখ?' বিবাহ প্রথার ওই নির্মম শিকারটি, এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যে মনে হলো তার বুদ্ধি-বৃত্তি আমার পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং সে আমার কথা দিব্যি বুঝতে পারছে। অবশ্য, আসলে আমার কথা সে মোটেও বোঝেনি। একবার মানুষ হয়ে গেলে কি আর পশুদের কথা বোঝা যায়? অবশ্য, গল্প-উপন্যাসে প্রায়ই দেখা যায় যে পশুর সাথে মানুষের কথাবার্তা তো কথাবার্তা, রীতিমত আড্ডা বসে যায়! তবে, ওই সব হচ্ছে বানানো, ডাহা মিথ্যে।

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকত এক মহিলা আর তার একটা কালো রঙের কুকুর। মহিলার স্বামী রোজ কুকুরটাকে নিয়ে বের হত এবং বাড়ি ফিরত হাসিমুখে, শিস্ বাজাতে বাজাতে। তো একদিন আমি ওই কুকুরটার নাকে নাক লাগিয়ে ওই স্বামীটার অমন আনন্দের রহস্যটা ভেদ করতে চাইলাম। বললাম, কোনও ভদ্রলোকই প্রকাশ্যে কুকুরের যত্ন করতে চান না। কিন্তু তোমার মালিকের স্বামীকে দেখছি রোজই তোমাকে নিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরছেন। তা, রহস্যটা কী? তুমি আবার বলে বোসো না যে, তিনি তোমাকে নিয়ে বেড়াতে খুব ভালবাসেন।

কালো কুকুরটা উত্তরে বলল, 'আরে না, ভালবাসা তো দূরের কথা, বলা যায় ঘৃণা করেন আমাকে। প্রথম প্রথম তিনি তো আমাকে নিয়ে বেরোতেই চাইতেন না। কিন্তু পরে যখন ওই অভ্যাসটা হয়ে গেল তখন পর পর আটটা দোকান, বুঝেছ তো...মদের দোকানে ঢোকার পর তিনি আমাকে কুকুর বলে আর চিনতেই পারেন না। আমাকে রীতিমত মানুষ মনে করে দিব্যি ব্যবহার করেন। দেখো না, আমাকে মানুষ বলে ভুল করে দরজায়

চাপা দিয়ে আমার লেজটার দু'ইঞ্চি খসিয়ে দিয়েছেন।'

কুকুরটার কথা আমার মনে ধরল এবং আমি এ বিষয়ে ভাবতে আরম্ভ করলাম।

এক সন্ধ্যায় আমার মনিব প্রতিদিনকার মত তার স্বামীকে আদেশ করল শরীরটাকে একটু নাড়াতে এবং 'লাডি'কে নিয়ে বেড়াতে বের হতে। এতক্ষণ আমার নামটা গোপন ছিল, এখন ফাঁস হয়ে গেল—আমার মনিব আমাকে ওই নামেই ডাকতেন। নামটা এক ফোঁটা পছন্দ ছিল না আমার। অন্যদের কত সুন্দর-সুন্দর নাম থাকে। যেমন আমার প্রতিবেশী কালো কুকুরটার নাম 'টুইট্‌নেস'। আহা, কী সুন্দর নাম!

তো, ধমক খেয়ে স্বামী বেচারা আমাকে নিয়ে রাস্তায় বের হলো এবং পূর্ব-পরিকল্পনা মতই হাঁটতে হাঁটতে আমি হাজির হলাম এক মদের দোকানের সামনে এবং এক ছুটে ঢুকে পড়লাম দোকানের ভেতরে। মানুষটা একটু হেসে বলল, 'আরে, এ ব্যাটা তো আমাকে মদ টানবার জন্য বলছে মনে হচ্ছে। নানাকিছু ভেবে এখানটায় আগে ঢুকিনি। আজ না হয়... ।'

এবং, যা হবার তাই হলো। একটা নিরিবিলি টেবিল বেছে আয়েস করে বসে মদের অর্ডার দিল বুড়ো। তারপর পুরো একঘণ্টা ধরে মদ গিলল। আর, আমাকেও কিন্তু না খাইয়ে বসিয়ে রাখল না—নানারকম কাবাব অর্ডার করল আমার জন্য। কে বলে মাতলামো ভাল না!

আমার খানা-দানা এবং তার 'পান-পর্ব' শেষ হলো এক সময়। তিনি আমাকে নিয়ে বাইরে এলেন। তারপর হাসিমুখে আমার গলা থেকে কলারটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। দরাজ গলায় বললেন, 'এমন ভাল মানুষ হয়েও তুমি কি না আটকে আছ তোমার ওই বিশ্রী মনিবের কাছে। স্বাধীন করে দিলাম তোমায়। গাড়িচাপা পড়ে চির মুক্তির পথটা নিজেই করে নাও, হে।'

দারুণ জমে গেল তার সাথে। তার কাছ থেকে দূরে সরে

যাওয়া দূরে থাক, পোষা কুকুরের মতই তার পাশে ঘুরঘুর করতে লাগলাম আমি। তাকে বললাম, 'তোমাকে ছেড়ে যাব না আমি, এটা জেনে নাও। আসলে আমরা তো একই পথের পথিক। পথ ভুল করে গিয়ে পড়েছি এক মহিলার খপ্পরে। স্বীকার করো আর না-ই করো, তোমার বউ তো আমাদের দু'জনকেই শেকলে বাঁধা কুকুর করে রেখেছে। এমনটা আর চলতে দেয়া যায় না। সময় এসেছে মুক্তির। সময় এসেছে শেকল ছিঁড়ে বাঘ হয়ে বেরিয়ে আসার... ।' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বুড়ো স্বামী আমার কথা বুঝল কি বুঝল না কে জানে, তবে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শোন ব্যাটা, এই দুনিয়ায় জীবন পাওয়া যায় একবারই। টেনে-টুনে তিনশো বছরের বেশি বাঁচাও যায় না। তুই শুনে রাখ, ওই ফ্ল্যাটে যদি আমি আর ফিরে যাই তবে আমি একটা গাধা। আর তুই ফিরে গেলে বুঝব, তুই হলি গাধার গাধা। এই হলো শেষ কথা। আর জানিসই তো, ভদ্রলোকের এক কথা। বাজি রাখতে পারিস তুই ইচ্ছা করলে।'

মুক্ত স্বাধীন দুই প্রাণী। হাসিমুখে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এসে পড়লাম জার্সিতে। এক লোক সেখানে দাঁড়িয়ে বনরুটি খাচ্ছিল। অপরিচিত সেই লোককে আমার 'নতুন মনিব' বলল, 'এই যে ভাই, আমাকে আর আমার এই কুকুরকে চিনে রাখুন–রকি পর্বতে যাচ্ছি আমরা, ভাল করে চিনে রাখুন আমাদের।'

তারপর আমার নতুন মনিব আদর করে আমার কান দুটো ধরে টান লাগাল। আনন্দে চিৎকার শুরু করলাম আমি। সে বলল, 'ওরে, আজ থেকে তোকে কী নামে ডাকব বল তো?'

স্বভাবতই 'লাভি' নামটাই মনে পড়ল আমার। এবং দুঃখে প্রায় কেঁদেই ফেললাম আমি। কিন্তু নতুন মনিব তখনই চিৎকার করে বলল, 'আজ থেকে তোর নতুন নাম দিলাম–সোনা মানিক। কী পছন্দ হয়েছে তো?'

শুনে খুশিতে আমি আর বাঁচি না। আমার লেজটা নাচাতে লাগলাম আনন্দে। মনে হলো, এত খুশি দেখানোর জন্য কেবল একটা লেজের নাচন যথেষ্ট নয়, কমসে কম পাঁচটা লেজ দরকার আমার!

[সুপ্রিয় পাঠক, যাঁরা মূল গল্পটি পড়েছেন অথবা পড়বেন তাঁরা লক্ষ করবেন যে মূল গল্পটি আমি হুবহু অনুবাদ করিনি। নিজের মত ভাষা ব্যবহার করে, কোথাও বাড়িয়ে, কোথাও কমিয়ে লিখেছি গল্পটা। আসলে কোনও একটা গল্প ভাল লেগে গেলে আমার সেই গল্পটা নিজের মত করে বলতে ইচ্ছে করে—এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আর, এই গল্পে 'স্ত্রী নিগৃহীত স্বামী'র যে বর্ণনা করা হয়েছে সেটি পড়ে কেউ যেন আবার না ভাবেন যে আমি নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নই। বিনয়ের সাথে বলি, নারীর প্রতি আমার শ্রদ্ধায় খাদ নেই এতটুকুও। এটা স্রেফ মজার একটা গল্প, সিরিয়াসলি কেউ যেন না নেন। কথা তো অনেক হলো, এখন পাঠকের ভাল লাগলেই বাঁচি!—আসমার ওসমান]

মূল: ও'হেনরি
রূপান্তর: আসমার ওসমান

সাদাত

গত ছ'বছর ধরে এটা ছিল আমার বৈঠকখানা। এর লাল রঙের মেঝেতে কত লোকের পায়ের ছাপ পড়েছে। তবে কারও ছাপ ফুটে নেই এতে। শুধু দরজার কাছে, মেঝেতে পরিষ্কার ফুটে আছে বেড়ালের একজোড়া পায়ের ছাপ। মেঝে যতদিন অক্ষয় থাকবে, ছাপের চিহ্নও ম্লান হবে না। মেঝে তৈরির সময় বেড়ালটা কাঁচা সিমেন্টের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার কারণে এ ছাপের সৃষ্টি। পায়ের ছাপজোড়ার দিকে তাকালে শৈশবের স্মৃতি মনে পড়ে যায় আমার–সেই বয়সটা যখন অনেক কিছুই মনের মাঝে এমনভাবে দাগ কেটে যায় যার কথা মানুষ কখনও বিস্মৃত হয় না। তখনও প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হইনি।

আমার বাবা বন বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ট্যুরে যেতেন। সঙ্গে আমাদেরকেও নিতেন।

একবার একটা পাহাড়ি এলাকায় আমাদের বেড়াতে নিয়ে গেলেন বাবা। রাস্তার পাশে, কুয়োর ধারে তাঁবু টাঙানো হলো। এ রাস্তা দিয়ে গাড়ি, ট্রাক, ঘোড়া, টোঙা আর পথচারী সবাই চলাচল করে। এ রাস্তায় এসে সবাই যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ফিতের মত চওড়া একটা পায়ে চলা পথ পাহাড় থেকে নেমে এসে নীচের উপত্যকায় মিলেছে। পাহাড়ি নারী-পুরুষরা মাঝে মাঝে দল বেঁধে হেঁটে যাচ্ছে। মহিলাদের মাথায় বস্তা, পুরুষরা পিঠে বইছে ভারী বোঝা। আরেকটা ছবি পরিষ্কার গেঁথে আছে মনে–এক লোক দু'তিনটে খচ্চর নিয়ে রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে।

কাঁধে মোটা একটা লাঠি, এক হাত একটা কানে রেখে, আকাশের দিকে মুখ তুলে গলা ছেড়ে গাইছে সে।

কতদিন ওখানে ছিলাম ঠিক মনে নেই আমার। তবে রাস্তায় আর কুয়োর ধারে বার বার শোনা বেশ কয়েকটা গান এখনও স্মৃতিতে গেঁথে রয়েছে। স্কুল এবং কলেজে পড়া ইতিহাস আর রসায়ন ভুলে গেছি আমি, তবে ওই গানগুলোর কথা মনে আছে পরিষ্কার। গুনগুনিয়ে গাইত মাঝে মাঝে।

'গোরিয়ে দা মান লাগা চম্বে দি ঘাটি'
(চম্বল উপত্যকার প্রেমে পড়ে গিয়েছে যে মেয়েটি)
'কুঞ্জা জায় পাইয়া নাদান
ঠাণ্ডে পানি তে বাঙ্কে নোহ্
পল ভার বহি লে, হো দায়ারা'
(ক্রুদ্ধ পাখিরা উড়ে এসে নামে নাদান নদীতে
ফুলবাবুরা সিনান করে ঠাণ্ডা জলে
ও দেবররে, আয় না একটু বসি এখানে)

কুয়োর ধারে ঢালে ঘন পাইন বন থেকে ভেসে আসত ঝিরঝির হাওয়া, যেন গান গাইছে, যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

একটা গাছের নীচে ছিল একটা কবর। কাছেই দুটো কুটির। কুটিরের বাসিন্দারা ভালুকের মত প্রকাণ্ড বড় বড়, কালো এক জোড়া কুকুর আর কয়েকটা মুরগি পুষত। আমি আর আমার ছোট বোন কুকুর আর মুরগিগুলোর সঙ্গে খেলা করতাম। বেশিরভাগ সময় কেটে যেত ওই কুঁড়ে ঘরে।

আমার সমস্ত স্মৃতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয় সাদাত। এত বছর পর, কত পরিবর্তন ঘটেছে আমার জীবনে, কিন্তু সাদাতকে একটুও ভুলতে পারিনি। সাদাত তার বুড়ো আঙুল আর অনামিকার মধ্যে, চেপে ধরে থাকত দোপাট্টা, মাটি ছুঁয়ে সালাম করত আমার মাকে। মার সামনে সবসময় মাটিতে বসত সাদাত– তবে শহুরে মেয়েদের মত অভিজাত ঢঙে নয়। পা ছড়িয়ে বসত

ও, হাঁটু নাচাত অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। তার নীলচে-ধূসর চোখ, চমৎকার অধর, সবসময় হাসি হাসি মুখ, সোনার মত চকচকে গায়ের রঙ এবং বাটালি দিয়ে খোদাই করা নিখুঁত নাক নিয়ে সাক্ষাৎ দেবী মূর্তি মনে হত সাদাতকে।

আমার ছোট বোন সীতাকে আদর করে মুন্নি বলে ডাকত সাদাত। সীতাও খুব ন্যাওটা ছিল সাদাতের। সাদাত আমাদের সঙ্গেই থাকত। মার সঙ্গে গল্প করত, ফাইফরমাশ খাটত। তবে ওর আসল কাজ ছিল বাচ্চা দেখাশোনা। সীতাকে দেখাশোনার জন্যই ও আমাদের সঙ্গে থাকত। সাদাতকে একবার পেলে আর কিছু চাইত না সে। এমনকী মাকেও ভুলে যেত।

আমি প্রায়ই শুনতাম মা তার বান্ধবী কিংবা প্রতিবেশীদেরকে বলছে, 'সুন্দরী কাকে বলে দেখেছিলাম একবার। ওহ্, সে যেন গোবরে এক পদ্মফুল।'

শুনেছি নারী নাকি নারীর সৌন্দর্য সহ্য করতে পারে না, ঈর্ষা করে। কিন্তু আমার মা সাদাতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতেন। 'সুন্দরী কাকে বলে দেখেছিলাম একবার,' বলতেন মা। কাঙরা থেকে নাদান যাওয়ার পথে, পীর চাদেশ্বর কবরের ধারে এক কেয়ারটেকার পরিবার বাস করত। কেয়ারটেকারের বউ সাদাত। রাজকন্যারাও অমন সুন্দরী হয় না। মেয়েটাকে এক নজর দেখলেই যে কেউ নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাবে, বন্ধ হয়ে আসবে দম। আর এত হাসিখুশি মেয়ে। বাচ্চারা কিছুতেই ওর কাছছাড়া হতে চাইত না। হ্যাঁ, বাচ্চারাও সুন্দরের মর্যাদা দিতে জানে। তারা সুন্দর কী জিনিস বুঝতে পারে। তাই ওরাও সবসময় সাদাতকে কাছে চাইত...

ছেলেবেলায় প্রায়ই শুনতাম মা বলতেন, 'ইস্, সাদাতের মত সুন্দরী একটা মেয়ে যদি পেতাম আমার ছেলের জন্য। ধুলো থেকে হলেও তাকে কুড়িয়ে আনতাম ছেলেবউ করার জন্য।' আমি মার কথা শুনে হাসতাম।

এরপর যখনই গল্প কিংবা কবিতায় সুন্দরী নারীর বর্ণনা পড়েছি, তাকে শকুন্তলা অথবা জুলেখার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে সাদাতের অনিন্দ্য মুখখানা ভেসে উঠত মানসপটে। বাবা-মা আমার বিয়ের কথা বললেও সাদাতের কথাই মনে পড়ত শুধু।

বাবা-মা হয়তো এখন সাদাতের কথা ভুলে গেছেন কিন্তু সে আমার কাছে প্রতিদিন আরও বাস্তব হয়ে ফুটে ওঠে। আমার কাছে সুন্দর মানেই সাদাত। তবে ওর কথা ভেবে মনে মনে হাসিও। কারণ জানি সাদাতের রূপ এখন অতীত মাত্র। কুড়ি বছর দীর্ঘ সময়। সময় এতদিনে নিশ্চয় সাদাতের সৌন্দর্যে নিষ্ঠুর থাবা বসিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকল আমার, ডক্টরেট ডিগ্রী নেয়ার পর লেকচারারের পদে চাকরিও জুটে গেল। জীবনে প্রথমবারের মত উপার্জনক্ষম হয়ে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস অনুভব করলাম। এবার বিয়ের কথা ভাবতে লাগলাম। নিজের একটা বাড়ি, ভবিষ্যৎ বধূ আর সন্তানের স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম। সেই সঙ্গে খুব ইচ্ছে জাগল সেই পাহাড়ি উপত্যকায় একবার ঢুঁ মেরে আসতে। দেখতে ইচ্ছে করছে সৌন্দর্যের সেই দেবী এখন কেমন আছে। সেই সাদাত যাকে এতদিন ধরে সৌন্দর্যের একমাত্র প্রতীক বলেই জানি। কিন্তু সাদাত কি আর আগের মত আছে? কুড়ি বছর পরেও সে কি একই রকম থাকবে? তাকে আগের চেহারায় দেখতে পাবার আশা কি বোকার মত হয়ে যাচ্ছে না? এমন কোনও ফুল কি দুনিয়ায় আছে যা শুকিয়ে যায় না? সময়ের ভয়ঙ্কর চাকার নীচে দলিত হয়ে অপরিবর্তিত কেই বা থাকতে পারে? সবই বুঝতে পারছি আমি। তবু মন বলছে সাদাতকে একটিবার দেখে আসতে। সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে গরমের ছুটিতে রওনা হয়ে গেলাম আমার সৌন্দর্যের দেবীকে দেখার জন্য।

কাঙরায় পৌঁছে গেলাম। এখানে এতদিনে রাস্তা হয়েছে। কাঙরা থেকে সোজা চলে গেছে নাদান পর্যন্ত। বাস যাতায়াত

করে। আমি বাসে চড়ে রানিতাল চলে এলাম। পাহাড়ের কাঁধে ছোট একটি হ্রদ, চারপাশে দেবদারু আর পাইনের সবুজ অরণ্য সব আগের মত আছে। স্বপ্নের মত।

সাদাতকে দেখার জন্য এসেছি বটে। তবে কুড়ি বছর পরে সে বেঁচে আছে কি না জানি না। তাই তাকে দেখার আশা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে। যদিও শৈশবের চেনা এই জায়গাটির সৌন্দর্য আগের মতই মুগ্ধ করল আমাকে। পীর চামোলার কেয়ারটেকারও বেঁচে আছে কি না জানি না।

পীর চামোলার সমাধির দিকে পা বাড়ালাম। কানের কাছে ফিসফিস করছে পাইনের বন থেকে ভেসে আসা বাতাস, মাটিতে পাইনের শুকনো লাল পাতা গড়াগড়ি খাচ্ছে, উপত্যকার নীচে আমের বন–সব যেন স্বপ্ন সত্যি হয়ে ওঠার মত। কয়েক হাত দূরে, কতগুলো পাইন গাছের নীচে পীর চামোলার সাদা চুনকাম করা কবর চোখে পড়ল। সমাধির ঠিক পেছনেই কেয়ারটেকারের সেই কুটির। বাতাসের ফিসফিসানি যেন বেড়ে গেল আরও। আমার মন কেমন করতে লাগল।

কুয়োটাকে দেখেই চিনতে পারলাম। আসলে এটা মিষ্টি জলের একটা ঝর্না, টলটলে একটা নদী এর উৎস। ঝর্নার চারপাশে সবুজ ঝোপের ঝাড় আগের চেয়ে ঘন লাগল। ছায়ায় গজিয়েছে বেগুনি রঙের ফুল। সবকিছু আগের মতই আছে, ভাবলাম আমি, শুধু আমি ছাড়া। আর আগের মত নেই এখানকার মানুষজন। সাদাতের এখানে এখন থাকার কথা নয় আর যদি থাকেও সে, এতদিনে গোলাপের শুকনো পাপড়ির মত সুবাসহীন হয়ে গেছে। মানুষের রূপ এত ক্ষণস্থায়ী কেন?

নীচে, ঝর্নার ধারে লেংটি পরে বসে আছে এক বুড়ো। বগলে ছোট একটা হুক্কা, তার সামনে দুটো মাটির কলসি। হুক্কা টানতে টানতে ছোট একটা পাত্র থেকে কলসিতে জল ঢালল বুড়ো।

ফুটপাত থেকে নেমে এলাম আমি, পা বাড়ালাম কুয়োর দিকে। কেয়ারটেকারের সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু কিছু বলার আগেই নীরবতা ভাঙল সে।

চমকে উঠলাম দারুণ। নিজের কানকে বিশ্বাস হলো না। বুড়ো ডাক দিল আবার, 'সাদাত, ও সা-দা-ত।' শব্দটা প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড়ে।

এবার সাদাতকে দেখতে পাব, ভাবলাম আমি। সাদাতও নিশ্চয় এ বুড়োর মত হয়ে গেছে, লোলচর্ম, শুকনো, বিধ্বস্ত। ওরা দু'জনে দুটো কলসি নিয়ে এখন বাড়ি যাবে।

সাদাত তা হলে এখনও বেঁচে আছে–সৌন্দর্যের দেবী। তাকে আবার দেখতে পাব, এ আবেগে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল আমার।

'আসছি, আব্বা,' এক মুহূর্ত পর জবাবটা প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড়।

যেদিক থেকে কণ্ঠটা ভেসে এসেছে সেদিকে তাকালাম চোখ তুলে। সমাধিস্তম্ভের ওদিকে দেখতে পেলাম না কাউকে। অথচ তারুণ্যদীপ্ত, কলকলে কণ্ঠটা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছি আমি। গলাটা ঝর্নার জলের মত মিষ্টি, কোকিল পাখির মত সুরেলা। এ কি সত্যি সাদাতের গলা? নিজেকে প্রশ্ন করলাম। সাদাত কি মানেকা কিংবা উর্বশীর মত অনন্ত যৌবনা? সে কি চির যৌবনের অবিনশ্বর প্রতিমূর্তি?

তারপর এক তরুণী বেরিয়ে এল সমাধিস্তম্ভের আড়াল থেকে, পাহাড়ি এক কন্যা, ঝলমল করছে যৌবনের আলোয়। পরনে গাঢ় নীল রঙের ঘাগরা, মাথায় একটা কলস, নেমে আসছে ঢাল বেয়ে। তার হাঁটার ছন্দে আশ্চর্য জাদু আর মাদকতা মেশানো।

আমার সামনে সকল সৌন্দর্য নিয়ে হাজির হলো রক্তমাংসের সাদাত। মুক্তোর মত ঝলমলে ত্বক, নীলচে-ধূসর বড় বড় চোখ,

সেই নিটোল নাক, হাসি হাসি অধর, উদ্ধত এক জোড়া বক্ষ, হাঁটার তালে দারুণ ছন্দে ঝাঁকি খাচ্ছে। আমার দিকে তাকাল সে। দৃষ্টিতে পূর্ণ কৌতূহল। আমি তার দিকে প্রবল আগ্রহ নিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে আছি দেখে লজ্জা পেল সে। সংকুচিত হলো। ঘুরে দাঁড়াল।

কুয়োর চত্বরে হালকাভাবে কলসি নামিয়ে রাখল তরুণী। বুড়োকে ফিসফিস করে কী যেন বলল। তারপর উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হলো তার চেহারা, জল ভরা কলসিটা দু'হাতে তুলে নিল। আরেকবার তাকাল আমার দিকে। নিতম্বে ঢেউ তুলে পাহাড়ে উঠতে লাগল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে উত্তেজনা আর আনন্দে কাঁপতে লাগলাম।

শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে নিলাম, বুড়ো কেয়ারটেকারকে সালাম দিয়ে বললাম, 'ঝর্নায় তো জল তেমন নেই দেখছি।' ঝর্নায় সত্যি জল কম। কলসি ডোবানো যায় না।

কপালে হাত রেখে বুড়ো বলল, 'জী, সার। গরমের সময় আমাদের এখানে পানির খুব অভাব হয়।'

আমি এবার বুড়োকে নিজের পরিচয় দিলাম। কুড়ি বছর আগের কথা মনে করিয়ে দিলাম তাকে। ঘোলাটে চোখে আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিল বুড়ো। তারপর বলল, 'জী, সার। এক হিন্দু অফিসার বন বিভাগে কাজ করতেন। বছর কুড়ি আগে এখানে দু'মাসের জন্য এসেছিলেন। খুব ভাল মানুষ ছিলেন তিনি।'

'আমার মা এক সাদাত বিবির গল্প বলেন। এখানে থাকত সে। তাকে মা সালাম জানিয়েছেন।'

'জী, সার,' বুড়ো বলল শান্ত গলায়। 'সে এই মেয়েটার মা। সাদাত এখন খুব বুড়ো হয়ে গেছে। হাঁটতে চলতে পারে না। ঢাল বেয়ে এক কলসি পানি আনার ক্ষমতা আমাদের দু'জনের কারোরই নেই। এই মেয়েটা না থাকলে যে কী দশা হত! ওর

নামও আমরা সাদাত রেখেছি।' স্নেহভরা গলায় যোগ করল সে, 'মেয়েটা অবিকল তার মায়ের মত দেখতে হয়েছে। ওর মা তরুণ বয়সে এমনই সুন্দরী ছিল।'

তরুণী সাদাত আবার নেমে আসছে ঢাল বেয়ে। বাবার সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখে লজ্জা কেটে গেল তার। দ্বিতীয় কলসিটা তুলে নিতে এল। আহ্, কলসিটা যখন কাঁখে তুলল ও, কী চমৎকার ছন্দে গোটা শরীর একটা ঝাঁকি খেল। আমার বুকে অদৃশ্য একটা তীর বিঁধল, আমি ওর অপরূপ সৌন্দর্যে বাকরুদ্ধ।

বুড়োর সঙ্গে তার কুটিরে চললাম প্রথম সাদাতকে দেখতে। আমার পরিচয় জেনে বৃদ্ধা আমাকে আদর করল। আমার মার কথা জিজ্ঞেস করল বার বার। কুড়ি বছর আগের গ্রীষ্মের সেই দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করল। আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকল নতুন সাদাত। ওর চোখে চোখ পড়তে লাল হয়ে উঠল আমার গাল। তরুণী সাদাত আমাকে ডুমুর, স্ট্রবেরি আর দুধ খেতে দিল।

আমার সামনে বসল সে, যেভাবে তার মা আমার মার সামনে বসত। চঞ্চলা এক হরিণী। আমার মন চাইলেও ওর দিকে চোখ তুলে চাইতে সাহস পাচ্ছিলাম না। আমার বার বার মনে পড়ল মা এই সাদাতের মত মেয়েকে আমার বউ করে ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি জানি এ কখনওই সম্ভব নয়। আমার অসহায়ত্ব আমার হৃদয় দুমড়ে মুচড়ে দিল।

সেদিন বিকেলের বাসে আমার কাঙরা ফেরার কথা। তাই ওদেরকে বিদায় জানিয়ে চলে এলাম। নিজেকে হতাশ এবং পরাজিত লাগছে। যে রূপের পূজা করে এসেছি তাকে দেখতে পাব না ভেবেই এখানে এসেছিলাম। এ সাদাতকে এতদিন মন্দিরের মত পবিত্র ভেবে বুকে স্থান দিয়ে এসেছি। তবে অপ্রত্যাশিত বাস্তবতা আমার মানসিক ভারসাম্য টলিয়ে দিয়েছে।

সৌন্দর্য শুধু পূজা করাই যায় না; একে ধরা-ছোঁয়া যায়, এ হৃদয় ভেঙে দেয়।

আমি সাদাত এবং তার রূপের কথা ভুলতে পারিনি। যদিও তার জন্য কামনার মৃত্যু ঘটেছে অনেক আগেই। আমি এখন বুঝতে পারছি নারীর সৌন্দর্য তার শরীরের মত নশ্বর নয়। এ চির সত্যের মত চিরন্তন।

মূলঃ যশপাল
অনুবাদঃ অনীশ দাস অপু

ভবঘুরে

ধীরে ধীরে বরফের শক্ত চূড়ার ওপর উঠে এল সূর্য, তুষার রাজ্যে অদ্ভুত সোনালি রশ্মি ছড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করল সকাল হয়েছে। সারারাত বরফ পড়েছে, পাখিরা, যারা সারাদিন লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বেড়ায় এখানে-ওখানে, রুপোলি পেভমেন্টে তাদের পায়ের ছাপও পড়েনি তুষারপাতের কারণে। খাদের পাশে গজিয়ে ওঠা ঝোপ-ঝাড় বরফ মেখে সাদা হয়ে আছে, সূর্যের আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠল গা, যেন বর্ণালী রঙ ছড়াল। কমলা আকাশে শুরু হলো রঙের খেলা। কমলা গলে গিয়ে ধারণ করল গভীর নীল রঙ, সেখান থেকে ক্রমে ম্লান নীলে পরিণত হলো। সমতল মাঠের ওপর দিয়ে বয়ে গেল ঠাণ্ডা বাতাস, নীরবে। গাছের গায়ে ধরল কাঁপন, তুষারের ঝিরঝিরে ধুলো উড়ল। তবে বরফের মুকুট পরে দাঁড়িয়ে থাকা ঝোপগুলোর মাঝে কোনও আলোড়ন তুলল না। মাথার ওপর সূর্য ক্রমে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে, তার উষ্ণ উত্তাপ মিশে গেল ঠাণ্ডা বাতাসে।

উত্তাপ আর শীতলতার অদ্ভুত পরিবর্তন বিরক্তির উদ্রেক করল ভবঘুরের স্বপ্নের মাঝে, জেগে গেল সে সারা গায়ে বরফ নিয়ে। কয়েক মুহূর্ত রীতিমত ধস্তাধস্তি করতে হলো তাকে বরফ সরাতে। উঠে বসল সে, চোখ বিস্ফারিত, প্রশ্ন সে চোখে, 'ঈশ্বর! আমি ভেবেছিলাম আমি বিছানায় ঘুমিয়ে আছি।' বিশাল ল্যাণ্ডস্কেপের দিকে তাকিয়ে আপন মনে যেন নিজেকেই কথাটা শোনাল সে। 'অথচ সারাদিন এখানেই পড়ে থেকেছি।'

আড়মোড়া ভাঙল সে, সাবধানে পা মুড়ল, বৃষ্টিভেজা কুকুরের মত ঝাড়া দিল গা, ঝুরঝুর করে বরফ শরীর থেকে ছিটকে পড়ল। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ছুঁয়ে গেল তাকে, শিউরে উঠল সে।

যাক, তবু ঘুমোবার পর শরীরটা ঝরঝরে লাগছে একটু, ভাবল ভবঘুরে। 'ভাগ্যিস জেগে গিয়েছিলাম। নাকি দুর্ভাগ্যই বলব–কারণ, আরও চল্লিশ মাইল রাস্তা আমাকে হাঁটতে হবে,' আল্পস পর্বতমালার দিকে তাকাল সে। আকাশের গায়ে বরফ মোড়া আল্পসকে ঠিক ছবির মত লাগছে। হিসেব করে দেখল সে গতকাল ব্রাইটন থেকে মাত্র বারো মাইল রাস্তা হেঁটে আসতে পেরেছে।

'শালার বরফ! শালার ব্রাইটন! শালার সবকিছু!' নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসছে সে। সূর্য আরও ওপরে উঠে গেছে। পাহাড়টাকে পেছনে রেখে ভবঘুরে রাস্তা ধরে আবার হাঁটা দিল। হাঁটতে তার ভালই লাগছে। রাস্তায় পায়ের আওয়াজ উঠছে। থপ্ থপ্। তিনটে মাইল স্টোন পার হবার পর ছেলেটাকে দেখতে পেল সে। সিগারেট ধরাচ্ছে। পরনে ওভারকোট নেই, বরফের রাজ্যে ভীষণ ভঙ্গুর আর দুর্বল মনে হলো হালকা-পাতলা কাঠামোটাকে।

'আপনি ওদিকে যাচ্ছেন নাকি, সার?' ছেলেটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল সে। 'হুম.' সংক্ষিপ্ত জবাব ভবঘুরের।

'চলুন। আমিও আপনার সঙ্গে যাই। আমিও ওদিকেই যাচ্ছি। একা হাঁটতে ভাল লাগে না। সঙ্গী পেলে মন্দ হয় না' আপন মনে বকবক করে যেতে লাগল ছেলেটা। জবাবে ভবঘুরে শুধু মাথা দোলাল।

'আমার বয়স আঠারো ' বলল ছেলেটা কথায় কথায়। 'কিন্তু আমাকে দেখলে আরও কম বয়সী মনে হয়, তাই না?'

'ভেবেছিলাম পনেরো।'

'ভুল ভেবেছেন। আমি রাস্তায় পড়ে আছি ছ'বছর ধরে। ছোটবেলায় বাড়ি পালিয়েছি অন্তত পাঁচবার। প্রতিবারই পুলিশ ধরে নিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে বাড়িতে। পুলিশ সবসময় আমার প্রতি সদয় ছিল। এখন আর আমার বাড়িটারি নেই যে পালিয়ে বেড়াব।'

'আমারও,' নিরুত্তাপ শোনাল ভবঘুরের কণ্ঠ।

'হ্যাঁ, আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি,' বলল ছেলেটা। 'তবে আপনাকে দেখে ভদ্রলোক মনে হয়। আমার মত মনে হয় না।' ভবঘুরে রোগাটে কাঠামোটার দিকে একবার তাকাল, কমিয়ে আনল হাঁটার গতি।

'তোমার মত অতদিন ধরে রাস্তায় পড়ে নেই আমি,' বলল সে।

'তা আপনাকে দেখে বোঝা যায়। আপনাকে দেখে তেমন ক্লান্তও মনে হচ্ছে না। রাস্তার শেষ মাথায় কিছু আশা করছেন নাকি?'

কী যেন ভাবল ভবঘুরে, তারপর বলল, 'জানি না। তবে সব সময়ই আমি কিছু না কিছু আশা করি।'

'বেশি আশা করে লাভ নেই,' মন্তব্য করল ছেলেটা, 'বেশি আশা করলে কিছুই পাওয়া যায় না।'

'তবু আশা ছেড়ে দেয়া ভাল নয়। একদিন হয়তো এমন কারও সাথে দেখা হয়ে যাবে, যে বুঝতে পারবে–'

'শহরের মানুষ কিছু বুঝতে চায় না,' বাধা দিল ছেলেটা। 'ওদের চেয়ে গ্রামের মানুষ অনেক ভাল। কাল রাতে আমি একপাল গরুর সাথে গোয়াল ঘরে ঘুমিয়েছি। আজ সকালে খামারবাড়ির চাষী লোকটা আমাকে চা খেতে দিয়েছে। শহরের লোকদের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না। দেখেছি তো লণ্ডনে–'

'কাল রাতে আমি হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ি,' বলল ভবঘুরে। 'ভেবেছিলাম মারাই যাব। কীভাবে যে বেঁচে আছি সেটাই অবাক লাগে।' ছেলেটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

'আপনি যে মারা যাননি বুঝলেন কীভাবে?'

'মারা যে যাইনি বুঝতেই তো পারছি,' সামান্য বিরতির পরে বলল ভবঘুরে।

'শুনুন,' কর্কশ গলায় বলল ছেলেটা, 'আমাদের মত লোকেরা চাইলেই এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে না। সবসময় আমাদের কুকুরের মত ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকতে হবে। ছয় বছর ধরে আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে। আপনার কি ধারণা আমি বেঁচে আছি? না, আমি মরে গেছি অনেক আগেই। মারগেটে গোসল করার সময় আমি একবার মরেছি, আমাকে দ্বিতীয়বার হত্যা করেছে এক জিপসি ধারাল স্পাইক দিয়ে। দু'বার আপনার মত আমি বরফে জমে গেছি, আরও একবার একটা গাড়ি উঠে গিয়েছিল আমার গায়ে। তারপরও আমি হেঁটে বেড়াচ্ছি। হেঁটে চলেছি লণ্ডনের দিকে। কারণ এ আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আপনাকে আবারও বলছি, চাইলেই আমরা এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাব না।'

হঠাৎ বেদম কাশতে শুরু করল ছেলেটা, কাশি না থামা পর্যন্ত ওর পাশে দাঁড়িয়ে রইল ভবঘুরে।

'তুমি আমার কোটটা ধার নিতে পার, ছোকরা,' বলল সে। 'খুব ঠাণ্ডা লেগেছে দেখছি।'

'দয়া দেখাতে হবে না!' খেপে উঠল ছেলেটা, জোরে জোরে টান দিতে লাগল সিগারেটে। 'আমি ঠিকই আছি। আপনি রাস্তা খুঁজছেন। এখনও ওটার সন্ধান পাননি। তবে পেয়ে যাবেন শীঘ্রি। আমরা আসলে সবাই মৃত। আপনিও তাই। আমরা সবাই ক্লান্ত। বেজায় ক্লান্ত। কিন্তু তারপরও এই পথ ত্যাগ করতে পারি

না আমরা।' বলতে বলতে আবার কাশি শুরু হলো ছেলেটার, কাশির দমকে বাঁকা হয়ে গেল শরীর। তাকে ধরে রইল ভবঘুরে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সাহসের আশায়। নির্জন রাস্তায় বাড়ি-ঘর বা মানুষজন কোনও কিছুর চিহ্ন নেই। হঠাৎ কোত্থেকে একটা মোটর কার উদয় হলো রাস্তার মাঝখানে। থামল ওদের সামনে। 'কী হয়েছে?' ড্রাইভার নেমে এল গাড়ি থেকে। 'আমি একজন ডাক্তার।' ছেলেটার দিকে তাকাল মস। ছেলেটা মুখ হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে।

'নিউমোনিয়া,' মন্তব্য করল ডাক্তার। 'ওকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। ইচ্ছে করলে আপনিও আসতে পারেন।'

মাথা নাড়ল ভবঘুরে। 'না। আমি হেঁটেই যাব।'

ডাক্তার আর সে ছেলেটাকে ধরাধরি করে গাড়িতে তুলল।

'আপনার সাথে আমার রেইলগেটে দেখা হবে,' বলল সে বিড়বিড় করে। তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল। গাড়িটা একটু পরে অদৃশ্য হয়ে গেল সাদা রাস্তার বাঁকে।

সারাটা সকাল বরফ ভেঙে পথ চলল ভবঘুরে, দুপুর নাগাদ এক গৃহস্থের কুটিরের সামনে থামল। দু'টুকরো রুটি ভিক্ষা চাইল। নির্জন এক গোলাঘরে ঢুকে রুটি খেল সে। এখানে বেশ গরম। সারাদিন সে খড়ের গাদার ওপর ঘুমিয়ে রইল। যখন জাগল, ততক্ষণে ঘনিয়ে এসেছে সাঁঝের আলো। আবার বরফ আর কাদায় ঢাকা পিচ্ছিল রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করল সে।

রেইলগেট ছাড়িয়ে মাইল দুয়েক আসার পর, অন্ধকারে এক লোককে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। ভীষণ দুবলা শরীর।

'ওদিকে যাচ্ছেন নাকি, সার?' কর্কশ গলায় বলল সে। 'কিছু মনে না করলে আপনার সাথে যেতে পারি। একা হাঁটতে ভাল লাগে না। সঙ্গী পেলে মন্দ হয় না।'

'তোমার না নিউমোনিয়া হয়েছে?' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ভবঘুরে।

'জী। আজ সকালে নিউমোনিয়াতেই মারা গেছি আমি।' জবাব দিল ছেলেটা। 'এবার সত্যি সত্যি।'

মূলঃ রিচার্ড মিলটন
রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

খুনে কাকাতুয়া

বিয়ের উপহারের ক্ষেত্রে সাধারণত সবাই ঘর সাজানো উপকরণ কিংবা সাংসারিক ব্যবহারোপযোগী জিনিসপত্র বাছাই করে থাকেন। কিন্তু পশুপাখি উপহার দেয়ার মধ্যে একটা অভিনবত্ব আছে, নিঃসন্দেহে। আর এরকম একটা অভিনব উপহার জ্যাক আর এডনাকে দিয়েছিলেন স্প্যান্ডিং দম্পতি, তা হলো একটি কাকাতুয়া পাখি। তবে অন্যসব দামি-কমদামি উপহারের মাঝে জ্যাক-এডনা দম্পতিকে বাড়তি খুশি করেছিল ওই কাকাতুয়াটি।

কাকাতুয়াটার অনেক বয়স হয়েছিল। তবে মেজাজ ভাল থাকলে সে মনের আনন্দে শিস্ দিত, আর শেখানো বুলি আউড়াত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যেত, পাখিটার কথাগুলো পরিস্থিতির সঙ্গে চমৎকার ভাবে খাপ খেয়ে যেত। পাখিটাকে এডনা আর জ্যাক খুবই ভালবাসত। তারা পাখিটার নাম রেখেছিল, ডিক। ডিক, জ্যাকের বাড়ি, জ্যাকের সহকর্মীরা আর ওদের দাম্পত্য জীবনের সবকিছুই এডনার কাছে স্বপ্নের মত সুন্দর মনে হত।

একরাতে বারান্দায় হঠাৎ ঝটপট আওয়াজে এডনার ঘুম ভেঙে গেল। এডনা তখন জ্যাককে ঘুম থেকে ডেকে বলল, 'জ্যাক, তাড়াতাড়ি ওঠো, মনে হচ্ছে কোনও বেড়াল আমাদের ডিককে ধরেছে।'

এডনা তাড়াহুড়ো করলেও কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠতে জ্যাকের একটু দেরি হলো। ওদিকে ডিক সমানে ডানা ঝাপটাচ্ছে আর

চিৎকার করছে। কিন্তু জ্যাক উঠে দরজা খুলে রান্নাঘরের বারান্দায় যেতেই সব কেমন চুপচাপ হয়ে গেল। জ্যাকের মনে হলো, বড় আকৃতির একটি পাখির অবয়ব মুহূর্তের জন্য দেখতে পেল অস্পষ্ট চাঁদের আলোয়। ওদিকে মেঝের উপর বসে বুড়ো পাখিটা হাঁপাচ্ছে, দম নিতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। তার ডানা থেকে আলগা হয়ে যাওয়া কয়েকটা পালক আশপাশে পড়ে আছে, এ ছাড়া তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আলোচনায় বসল, কে আক্রমণ করতে পারে ওদের প্রিয় কাকাতুয়াকে। জ্যাক বলল, 'ঈগল বা চিল হতে পারে না, কারণ এ অঞ্চলে তাদের দেখতে পাওয়া যায় না, তা ছাড়া এরা নিশাচর নয়। পেঁচা হতে পারে, তবে আমার মনে হলো পাখিটা পেঁচার চেয়ে আকারে অনেক বড় হবে।'

এডনা কিন্তু জ্যাকের কথা উড়িয়ে দিল, 'ওসব তোমার কল্পনা, কোনও পাখিই ডিককে আক্রমণ করেনি। আমার ধারণাই ঠিক, আসলে বেড়ালেই আক্রমণ করেছিল।'

এর বেশ কয়েকদিন পর দেখা গেল কাকাতুয়াটা পালক, টুকরো কাপড় আর শুকনো ডালপালা দিয়ে বাসা বাঁধছে। 'তার মানে ও ডিম পাড়বে,' জ্যাক বলল, 'আর এতে বোঝা গেল পাখিটা পুরুষ নয়, মেয়ে কাকাতুয়া, কাজেই আজ থেকে ওর নাম ডিক নয়, ডিকি। সেরাতে আমি ঠিক দেখেছিলাম। ওটা ছিল একটা বুনো কাকাতুয়া, তাই আমার কাছে অস্বাভাবিক বড় মনে হয়েছিল।'

এরপর একদিন দেখা গেল, জ্যাকের ধারণাই সঠিক, পাখিটা ডিম পেড়েছে। ডিমটা আকারে অস্বাভাবিক বড়। ডিকি ঝিমুতে ঝিমুতে ডিমে তা দেয়, তার ঘাড় এলিয়ে পড়ে। কাকাতুয়াটা দুর্বল হয়ে পড়ছে। তারপর একদিন ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলো আর ওদিকে কাকাতুয়াটা মরে গেল। কাকাতুয়ার বাচ্চাটা লালন পালনের ভার পড়ল এডনার উপর। এডনা তুমুল উৎসাহে

বাচ্চাটাকে লালনপালন করে বড় করে তুলতে লাগল। এ ব্যাপারে জ্যাক সাধ্যমত সময় ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করল। তবে এডনা সবচেয়ে বেশি সাহায্য-সহযোগিতা পেল চার্লির কাছ থেকে। চার্লি, জ্যাকের সহকর্মী, বয়সে জ্যাকের থেকে অনেক ছোট হবে। চটপটে, সুদর্শন এবং মিশুক স্বভাবের ছেলে।

ধীরে-ধীরে কাকাতুয়ার বাচ্চাটা বড় হতে লাগল। পাখিটার পালক গজাতে শুরু করল। কিন্তু দেখতে সেটা মোটেই তার মায়ের মত হয়নি। রঙ তার কুচকুচে কালো। দেখতে কদাকার। এডনা মন্তব্য করল, 'কাকাতুয়ার বাচ্চাটা মোটেই ডিকির মত সুন্দর নয়, বরং কুৎসিত। তবে মনে হয় ও খুব চালাক হবে, এখন থেকেই শিস্ দেয়া শিখে গেছে। আর হাসতেও পারে। তবে হাসির শব্দটা ভয়ঙ্কর রকমের।'

'তাই নাকি,' জ্যাক কৌতূহল প্রকাশ করে, 'তা হলে তো মনে হয় পাখির বাচ্চাটা খুব তাড়াতাড়ি কথাও বলতে পারবে।'

'আমারও তাই মনে হয়।' এডনা বলে, 'জানো, জ্যাক, বাচ্চাটার ভয়ঙ্কর হাসি শুনে চার্লি নাকি খুব মজা পায়।'

শুনে ম্লান হয় জ্যাকের মুখ। 'চার্লি এসেছিল, তুমি আমাকে বলোনি তো!'

'কেন, ও যে প্রায় এখানে আসে তুমি তো জানো। বাচ্চাটার পরিচর্যায় চার্লি আমাকে খুব সহযোগিতা করে।' এডনা বলে।

জ্যাক অন্যমনস্কভাবে বলল, 'হতে পারে। তবে ওর বদলি হওয়ার কথা ছিল।' এই সময় পাখিটা বিকট স্বরে হেসে উঠল। চমকে উঠল জ্যাক। মন্তব্য করল, 'কী ভয়ঙ্কর হাসি, মনে হয় যেন প্রেতাত্মার উল্লাস ধ্বনি। অথচ এই ভয়ঙ্কর হাসিটা চার্লির নাকি ভাল লাগে। আমার মনে হয় ও তোমাকে খুশি রাখার জন্যই এমন উদ্ভট কথা বলে।'

'ওহ্, জ্যাক, তুমি চার্লি সম্পর্কে অযথাই ঈর্ষা পোষণ করছ,' এডনা বলল।

এর কিছুদিন পর সত্যি সত্যি চার্লি বদলি হয়ে গেল। জ্যাকও মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

এক রাতে এডনা বিরক্ত হয়ে বলল, 'জানো, জ্যাক, পাখিটাকে এখন আমার কাছে ভীষণ অসহ্য লাগে। ওই কুৎসিত পাখিটাকে এখন আমি আর পছন্দ করতে পারছি না। আর তা ছাড়া, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, যে আসছে, তার মানসিক শান্তির জন্য পাখিটার ভয়ঙ্কর হাসিটা ক্ষতিকর হতে পারে। কাজেই পাখিটাকে বিদায় করে দেয়া ভাল।'

জ্যাক খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠল, বিশেষ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম প্রসঙ্গে। বলল, 'তোমার মত আমিও কাকাতুয়াটাকে অপছন্দ করতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু পাছে তুমি কষ্ট পাও, তাই বলতে পারিনি। এখন আর পাখিটাকে বিদায় করতে কোনও বাধা নেই।'

পরদিন জ্যাক পাখির খাঁচা খুলে দিতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, 'তুমি কি আমাদের সুখবর শুনেছ? আমি বাবা হতে চলেছি। তোমাকে আর আমাদের দরকার হবে না, তোমাকে চলে যেতে হবে।'

জ্যাকের কথা শুনে পাখিটা শিস দিয়ে উঠল। তারপর হুবহু চার্লির গলা নকল করে আশঙ্কা মেশানো স্বরে বলে উঠল, 'তাই নাকি! কিন্তু, এডনা, তুমি মা হতে যাচ্ছ, খবরটা শুনে জ্যাক কী বলবে?' পরক্ষণে পাখিটা এডনার গলা নকল করে বলল, 'কেন, জ্যাক ভাববে ওরই সন্তান। আমি তো ওকে চিনি, ও এত বোকা যে, সত্যি-মিথ্যে সবকিছুই খুব সহজে বিশ্বাস করে নেবে। তুমি ওসব নিয়ে ভেবো না, ডার্লিং, কিস্ মি প্লিজ।'

কিছুক্ষণের জন্য পাথর হয়ে গেল জ্যাক। তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়ে থমথমে মুখে স্টাডিরুমে ঢুকল। ডেস্কের ড্রয়ার খুলে পিস্তলটা বের করে হাতে নিয়ে শয়নকক্ষের দিকে পা বাড়াল, যেখানে এডনা বিশ্রাম নিচ্ছে। 'ও এত বোকা যে, সত্যি-মিথ্যে

সবকিছুই খুব সহজে বিশ্বাস করে নেবে...' কাকাতুয়ার বলা কথাটি মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল জ্যাকের। 'সত্যিই কি আমি বোকা?' জ্যাক নিজেকে প্রশ্ন করল এবং শেষমুহূর্তে একটা অদ্ভুত কাজ করে বসল। নিজের মুখে পিস্তলের নল ঢুকিয়ে আচমকাই টিপে দিল ট্রিগার। জমাট বাঁধা গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করার ঠিক পূর্বমুহূর্তে যে চিন্তার ঝিলিক জ্যাককে তৃপ্ত করল, তা হলো, 'এবার নিশ্চয় আমি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছি।'

মূলঃ জন কোলিয়ার
অনুবাদঃ শাহনেওয়াজ খান

গুপ্তচর

মোড়ের সাইনবোর্ডবিহীন ছোট্ট দরজির দোকানটার কাউন্টারে বসা ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশ না পঞ্চান্ন আন্দাজ করা মুশকিল। চোখে কালো ফ্রেমের পুরু লেন্সের চশমা। তাই চোখগুলো দেখায় ইয়া বড় বড়। চেহারার সঙ্গে বেমানান। কাউন্টারের পাশেই একটি ছোট্ট দরজা। এটা অবশ্য এখন তালামারা। প্রায়ই তালাবদ্ধ থাকে।

রাস্তা পেরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোট-প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন সাইনবোর্ডবিহীন ছোট্ট দরজির দোকানটায়। কাউন্টারের ভদ্রলোক এগিয়ে এসে একগাল হাসি মুখে বললেন, 'আপনার জন্য কী করতে পারি, স্যার?'

খোঁড়া, কোট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোকের বয়স ৩৫/৪০ হবে। দেখেই বোঝা যায় বেশ শক্তসমর্থ। এক পা শুধু খুঁড়িয়ে হাঁটেন। খোঁড়া লোকটি কিছু না বলে হাতের প্যাকেটটা কাউন্টারে রেখে বললেন, 'আপনি বোধহয় ভুল করে প্যাকেটটা আমাকে দিয়ে দিয়েছেন।'

প্যাকেটটা দেখেই কাউন্টারের লোকটির চেহারা মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। পরিবর্তনটা খোঁড়া লোকটির নজর এড়াল না। কাউন্টারের লোকটি দ্রুত নিজেকে সামলে বললেন, 'আমি খুবই দুঃখিত, সার। এটা নিছক ভুল করেই হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' ব্যস্ত হয়ে বললেন খোঁড়া লোকটি। 'এবার আমার প্যাকেটটা আমাকে দিন।'

কাউন্টারের লোকটি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' দ্রুত একটা প্যাকেট কাউন্টারে রেখে একগাল হেসে বললেন, 'নিন, সার, আপনার প্যাকেট।'

খোঁড়া ভদ্রলোক কাউন্টারের প্যাকেটের দিকে ফিরেও তাকালেন না। গম্ভীরভাবে বললেন, 'ভুলে যে প্যাকেটটা আমাকে দিয়েছেন, সেটা আমি খুলে দেখেছি।'

কথাটা শুনে কাউন্টারের লোকটির হাসি মিলিয়ে গেল। অবিশ্বাসের সুরে বললেন, 'সার, আপনি এটা খুলে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, দেখেছি,' বললেন খোঁড়া ভদ্রলোক।

'কী দেখলেন?' ঢোক গিলে প্রশ্ন করলেন কাউন্টারের লোকটি।

'সোয়েটারটা দেখলাম। ইয়া বড় একটা সোয়েটার, তার আবার পাঁচটা হাতা।'

কাউন্টারের ভদ্রলোক ভারি অবাক হবার ভান করে বললেন, 'পাঁচটা হাতা, যাহ্...হয়তো কেউ ঠাট্টা করে এটা বানিয়েছে।'

'এরকম ঠাট্টার কোনও মানে হয় না,' বললেন খোঁড়া লোকটি। 'এরকম উৎকট ঠাট্টা কেনই বা কেউ করতে যাবে।'

কাউন্টারের ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিকই বলেছেন, সার, এটা ঠাট্টা হতে পারে না। হয়তো...হয়তো আমার দর্জি ভুলে এটা বানিয়ে ফেলেছে।'

খোঁড়া ভদ্রলোক এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে বললেন, 'প্রথমে আমিও ভেবেছিলাম এটা হয়তো আপনার দর্জির ভুল। কিন্তু প্যাকেটটার ভিতর আরও যা দেখলাম, তাতে বুঝলাম এটা আপনার দর্জির ভুল নয়।'

'প্যাকেটটায় আরও কী দেখলেন?' নিজের ক্রোধ চেপে কোনওমতে বললেন কাউন্টারের লোকটি।

'প্যাকেটটার ভিতর দেখলাম একটা তিন কাপওয়ালা ব্রা, আর এক পায়াওয়ালা একটা পাজামা। এতগুলো জিনিস নিশ্চয়ই

আপনার দর্জি ভুল করে বানায়নি।'

'এমনও তো হতে পারে, সার,' উৎসাহের সুরে বললেন কাউন্টারের লোকটি, 'যার জন্য এগুলো তৈরি তার হয়তো বিকৃত অঙ্গ, যে মহিলাটির জন্য ব্রাটা তৈরি করা হয়েছে তার বোধহয় আরেকটা অঙ্গ গজিয়েছে।'

খোঁড়া ভদ্রলোক এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে বললেন, 'অসম্ভব, এ শহর বা তার আশপাশে এরকম কোনও নর-নারী থাকলে আমি নিশ্চয়ই শুনতে পেতাম।'

তবুও শেষ চেষ্টা করলেন কাউন্টারের ভদ্রলোক। 'হয়তো সার্কাস দলের কোনও জোকারের জন্য তৈরি এসব,' হাসতে হাসতে বললেন।

খোঁড়া ভদ্রলোক সামান্য একটু হেসে বললেন, 'না, সাহেব, এই শহর বা শহরের আশপাশে কোনও সার্কাস পার্টি আসলে আমি জানতে পারতাম। কোন সার্কাস পার্টি আসেনি।'

'সার্কাস পার্টিও আসেনি?' হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ে বললেন কাউন্টারের ভদ্রলোক।

খোঁড়া ভদ্রলোক কাউন্টারে ঝুঁকে আস্তে করে বললেন, 'নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনও গোপন রহস্য আছে, যা আপনি বলতে চাচ্ছেন না আমাকে।'

কাউন্টারের ভদ্রলোক অবাক হবার ভান করে বললেন, 'কী সব বলছেন, সাহেব, এর পিছনে কোনও রহস্য নেই।'

'আছে,' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন খোঁড়া ভদ্রলোক। 'রহস্য একটা আছেই। কারা এগুলো বানাতে দিয়েছিল সে রহস্য আমি শুনতে চাই। কারা আপনাকে এগুলো বানাতে দিয়েছে?'

কাউন্টারের ভদ্রলোক স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'আপনি খুব কৌতূহলী মানুষ, সার,' তারপর সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে বললেন, 'রহস্য সম্পর্কে শুনতে চান?'

খোঁড়া ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন, 'তা হলে আমার

সন্দেহই সত্যি। এর পিছনে কোনও রহস্য আছে। ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে চাই। বলুন–বলুন,' তাগাদা দিলেন তিনি।

নিজের পুরু লেন্সের চশমাটা খুলে পরিষ্কার করে বলতে শুরু করলেন কাউন্টারের ভদ্রলোক, 'আলমার নামে একটি গ্রহ। তার নাম কি আপনি কখনও শুনেছেন?'

খোঁড়া ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আলমার গ্রহ! জন্মেও শুনিনি। ...তা কোথায় এই গ্রহটি?' শেষ কথাটা ব্যঙ্গের সুরে বললেন তিনি।

কাউন্টারের লোকটি তাঁর কথায় কান না দিয়ে বলতে লাগলেন, 'এই আলমার গ্রহ, আপনাদের পৃথিবী গ্রহ থেকে এতদূরে যে, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিয়েও দেখা যাবে না। যাক...যা বলছিলাম, আলমার গ্রহের শাসক একজন স্বৈরাচারী। তার শাসনে জনগণ অতিষ্ঠ। যদিও প্রকাশ্যে মহানায়কের বিরোধিতা করা যেত না, কিন্তু তবুও গোপনে গোপনে আন্দোলনের দানা বুনতে লাগল আলমারবাসী। ঠিক হলো মহানায়কের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে এই আন্দোলন গড়তে হবে। কিন্তু আলমার গ্রহে এসব পরিকল্পনা করতে গেলেই মহানায়কের গুপ্তচরবাহিনীরা টের পেয়ে যাবে। তাই আলমারবাসী ঠিক করল, এমন একটা গ্রহ খুঁজে বের করবে, যেখানে স্বৈর মহানায়কের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তোলা যায়। কিন্তু গ্রহ খুঁজতে গিয়ে সমস্যা দেখা দেয় দুটো। একটা হলো: সেই গ্রহের আবহাওয়া আলমারবাসীদের পক্ষে অনুকূল হতে হবে। দ্বিতীয়ত, সেই গ্রহের মানুষদের সাথে আলমারবাসীদের কিছুটা হলেও সাদৃশ্য থাকতে হবে।' এ পর্যন্ত বলে আবার চোখের চশমা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

'দারুণ ইন্টারেস্টিং তো,' রসিকতা করে বললেন খোঁড়া ভদ্রলোক। একটা হাত কাউন্টারে ঠেস দিয়ে আরেকটা হাত কোটের পকেটে ঢুকিয়ে আরাম করে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বলে

যান...বলে যান...' চশমা পরিষ্কার করে আবার শুরু করলেন কাউন্টারের লোকটি।

'তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না এরকম একটা গ্রহ। শেষমেশ যখন অন্যগ্রহে যাবার পরিকল্পনা বাতিল হবে হবে ভাব ঠিক তখনই কিছু আলমারবাসী সন্ধান পায় এই পৃথিবী নামের গ্রহটির। আলমার গ্রহের পুরুষরা দেখতে পৃথিবীর পুরুষদের মতই। যেটুকু পার্থক্য আছে তা সামান্য ছদ্মবেশেই ঢাকা যায়। কিন্তু আলমারগ্রহের মেয়েরা পৃথিবীর মেয়েদের মত নয়। তাদের মধ্যে এত বিরাট পার্থক্য যে তা যে কোনও ছদ্মবেশেই ঢাকা অসম্ভব।'

পকেটের যন্ত্রটার ঠাণ্ডা স্পর্শ নিতে নিতে খোঁড়া ভদ্রলোক বললেন, 'এই প্যাকেটের জামাকাপড়গুলো তা হলে আলমার গ্রহের মহিলাদের?'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন,' বললেন কাউন্টারের ভদ্রলোক। 'এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, পৃথিবীর আর আলমার গ্রহের মেয়েমানুষের কত পার্থক্য।'

'হুম, তারপর?' বললেন খোঁড়া ভদ্রলোক।

'তারপর একদল আলমারবাসী গোপনে গ্রহ ত্যাগ করে একমাস আগে এসে পৌঁছে এই পৃথিবীতে। অবশ্য পৃথিবীর প্রতি তাদের কোনও বিদ্বেষ নেই। আন্দোলনের প্রস্তুতি শেষ হলেই তারা চলে যাবে পৃথিবী ছেড়ে, নিজ গ্রহের উদ্দেশে। তারপর সেখানে তারা আন্দোলন শুরু করবে স্বৈর মহানায়কের বিরুদ্ধে।' এটুকু বলে পকেটে হাত ঢোকালেন কাউন্টারের ভদ্রলোক। পকেট থেকে বের করলেন অদ্ভুত এক মারণাস্ত্র। সেটা খোঁড়া ভদ্রলোকের দিকে তাক করে কৃত্রিম সহানুভূতির সুরে বললেন, 'আপনাকে খুন করতে হবে, এজন্যে আমি খুবই দুঃখিত, সার। কোনও সূত্রে আলমারবাসীদের খবর বাইরের কারও কাছে চলে যাওয়া মানেই আলমারবাসীদের মহা সর্বনাশ...কাজেই...'

'কাজেই কী? আলমার-এর গুপ্তচরেরা তো আর জানছে না,' বাজখাঁই গলায় বললেন খোঁড়া ভদ্রলোক।

কাউন্টারের লোকটা বাঁকা একটু হেসে বললেন, 'সারা আলমারে মহানায়কের গুপ্তচরবাহিনী সতর্ক ও তৎপর। এই সুদূর পৃথিবী গ্রহেও যে আলমারবাসীরা সম্পূর্ণ নিরাপদ তা বলা যায় না। কে জানে, হয়তো আমাদের পিছু পিছু আলমার গ্রহ থেকে তারা এসেছে...'

কাউন্টারের লোকটির কথায় বাধা দিয়ে খোঁড়া ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি এতসব জানলেন কী করে?'

'সে উত্তর দেয়ার প্রয়োজন নেই নিশ্চয়ই,' বাঁকা হেসে বললেন কাউন্টারের লোকটি। 'আপনি বুদ্ধিমান, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন?

'তবে হ্যাঁ,' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বলতে শুরু করলেন কাউন্টারের লোকটি, 'আপনি এটা ভেবে সান্ত্বনা পেতে পারেন যে, গোটা একটা গ্রহের মুক্তির জন্য আপনি প্রাণ দিচ্ছেন। এ ছাড়া আর কোনও ব্যবস্থা নেই...বিশ্বাস করুন...আপনাকে মারতে আমার খুবই খারাপ লাগছে...' কথা শেষ করে হাতের অদ্ভুতদর্শন মারণাস্ত্রটা একটু উঁচিয়ে ধরলেন...

'না, আর তো সময় দেয়া যায় না,' মনে মনে বললেন খোঁড়া ভদ্রলোক। পকেটে ঢোকানো হাতটা দ্রুত একবার টিপে দিলেন। ছোট্ট যন্ত্রটা থেকে রে-গান গিয়ে লাগল ঠিক কাউন্টারে বসা লোকটার হৃৎপিণ্ডে। দু'চোখে অবিশ্বাস নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড হাঁ করে চেয়ে রইলেন কাউন্টারের ভদ্রলোক। তারপর মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল হতবাক বিপ্লবীর প্রাণহীন দেহটা।

খোঁড়া ভদ্রলোক দেরি না করে দ্রুত কাউন্টার টপকে প্রাণহীন বিপ্লবীর পকেট সার্চ করে একটা চাবি পেলেন। চাবিটা কাউন্টারের পিছনে ছোট্ট দরজাটার ফুটোতে ঢোকাতেই দরজাটা খুলে গেল। দরজা খুলতেই দেখা গেল কয়েকটা বেঞ্চ আর একটা

টেবিল। টেবিলের উপর রাখা ফাইলটা পড়ে বোঝা গেল এটা আলমারবাসীদের একটা গোপন ঘাঁটি। এখন খোঁড়া ভদ্রলোকের একমাত্র কাজ হলো তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের খবর পাঠিয়ে এখানে আসার কথা বলা। নিজের ছদ্মবেশ খুলে ফেললেন খোঁড়া। কতক্ষণ আর ছদ্মবেশে থাকা যায়...আর ছদ্মবেশে থাকাও একটা বিরক্তির ব্যাপার...কোটের পকেট থেকে অদ্ভুত একটা যন্ত্র বের করলেন খোঁড়া। এটা দিয়ে তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের জানাবেন এখানে আসার জন্য।

'এখানেই অপেক্ষা করব,' ভাবলেন খোঁড়া ওরফে আলমার গ্রহের গুপ্তচর। 'সবাই এখানে আসবে...তখন হাতেনাতে ধরা যাবে সবাইকে।'

কাউন্টারে বসা বিপ্লবী ঠিকই বলেছিল, মহানায়কের গুপ্তচর বাহিনী সবসময়ই সতর্ক ও সক্রিয়। স্বৈরাচারী মহানায়ক গুপ্তচর বাহিনীকে ভাল করেই শিক্ষা দিয়েছেন। এইসব শখের বিপ্লবীরা সুশিক্ষিত গুপ্তচর বাহিনীর সঙ্গে পারবে কেমন করে? ...মহানায়কের বিরুদ্ধাচরণ করার ফল যে কত ভয়াবহ, এবার তা বুঝতে পারবে এইসব শখের বিপ্লবীরা।

মূল: লরেন্স এম. জেনিফার
রূপান্তর: মোঃ আবুল কালাম আজাদ আকাশ

দ্য স্নাইপার

জুনের দীর্ঘ গোধূলিবেলা বিবর্ণ হয়ে রাত নেমে এল। গাঢ় আঁধারে ডুবে আছে ডাবলিন। কিন্তু ভেড়ার লোমের মত নরম মেঘদল চুইয়ে আসা চাঁদের ফ্যাকাসে আলোয় মনে হচ্ছে রাস্তা এবং লিফি'র কালো জলের ওপর যেন বা ভোরের আলো ফুটে উঠছে। অবরুদ্ধ 'ফোর কোর্টস'-এর চারদিকে ভারী আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল। শহরের এখানে-সেখানে মেশিন গান এবং রাইফেল নিঃসঙ্গ খামারে কুকুরের ঘেউ ঘেউ-এর মত থেকে থেকে গর্জে উঠে রাতের নীরবতা ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে। রিপাবলিকান এবং ফ্রি স্টেটার্সরা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে।

ও'কনেল ব্রিজ-এর কাছে এক বাড়ির ছাদের ওপর শুয়ে লক্ষ্য রাখছে এক রিপাবলিকান স্নাইপার। রাইফেলটা পাশে শুইয়ে রেখেছে সে, তার কাঁধের ওপর ঝুলে আছে একজোড়া ফিল্ড গ্লাস। তার চেহারাটা একজন ছাত্রের মত, পাতলা এবং তপস্যাপরায়ণ, কিন্তু চোখজোড়ায় রয়েছে ধর্মোন্মাদদের মত ঠাণ্ডা আভা। চোখ দুটো গভীর এবং চিন্তাযুক্ত, মৃত্যু খুঁজে বেড়ানো একজন মানুষের চোখ।

ক্ষুধার্তভাবে একটা স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছে সে। সকাল থেকে কিছুই খায়নি। গোগ্রাসে খাচ্ছে সে। স্যাণ্ডউইচ খাওয়া শেষ করে পকেট থেকে হুইস্কির একটা ফ্লাস্ক বের করে ছোট্ট একটা চুমুক দিল। এক মুহূর্ত থমকে চিন্তা করল সিগারেট খাওয়ার ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে কি না। অন্ধকারে আলো দেখা যেতে পারে। লক্ষ রাখছে

শত্রুরা। ঝুঁকি নেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

দু'ঠোঁটের মাঝে একটা সিগারেট গুঁজল সে, দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে দ্রুত ধোঁয়া গিলেই আগুন নিভিয়ে ফেলল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছাদের প্যারাপিটে এসে লাগল একটা গুলি। দ্রুত আরেক টান দিয়ে সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলল স্নাইপার। তারপর মৃদুস্বরে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বুকে হেঁটে বাঁ দিকে সরে গেল।

সাবধানে উঠে দাঁড়িয়ে প্যারাপিটের উপর দিয়ে উঁকি দিল সে। আগুনের ঝলক দেখা গেল, শোঁ শোঁ শব্দ তুলে তার মাথার উপর দিয়ে গুলি চলে গেল একটা। ঝট করে শুয়ে পড়ল সে। আলোর ঝলকানিটা দেখেছে। রাস্তার উল্টো দিক থেকে এসেছে ওটা।

ছাদের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পেছন দিকের একটা চিমনির কাছে চলে গেল সে। ওটার আড়ালে ধীরে-ধীরে সোজা যেতে শুরু করল যতক্ষণ না তার চোখ প্যারাপিটের উপরিভাগের সমান্তরালে আসে। নীল আকাশের পটভূমিতে উল্টো দিকের বাড়িটার উপর দিকের অস্পষ্ট কাঠামো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। আড়ালে লুকিয়ে আছে তার শত্রু।

ঠিক এর পরপরই সেতুর ওপর একটা আর্মার্ড কার দেখা গেল, রাস্তার দিকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল ওটা। পঞ্চাশ গজ এগিয়ে রাস্তার উল্টো দিকে গিয়ে থামল। মোটরের ক্ষীণ শব্দ শুনতে পাচ্ছে স্নাইপার। হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে তার। গাড়িটা শত্রুপক্ষের। গুলি করতে চাইল সে, কিন্তু জানে তা হবে অহেতুক। ধূসর দানবটাকে ঘিরে থাকা স্টিল কখনওই ভেদ করতে পারবে না তার গুলি।

তারপর একটা সাইড স্ট্রিটের কোনার দিকে এগিয়ে এল এক বৃদ্ধা। ছেঁড়া একটা শাল দিয়ে মাথা ঢাকা। গাড়ির টারেটে বসা লোকটার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল সে। ছাদের যেদিকটায়

স্নাইপার শুয়ে আছে সেদিকটায় আঙুল তুলে দেখাচ্ছে সে। একজন চর।

টারেট খুলে গেল। একজন মানুষের মাথা আর কাঁধ দেখা গেল, তাকিয়ে আছে স্নাইপারের দিকে। রাইফেল তুলে গুলি করল স্নাইপার। টারেটের দেয়ালে খুব জোরে আছড়ে পড়ল মাথাটা। সাইড স্ট্রিটের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল মহিলা। আবারও গুলি করল স্নাইপার। চরকির মত পাক খেল মহিলা, তীক্ষ্ণ এক চিৎকার দিয়ে রাস্তার পাশে নর্দমায় পড়ে গেল।

হঠাৎ উল্টো দিকের ছাদ থেকে শব্দ তুলে একটা গুলি ছুটে এল, অভিসম্পাত দিয়ে হাত থেকে রাইফেল ফেলে দিল স্নাইপার। ছাদের ওপর সশব্দে পড়ল রাইফেল। স্নাইপার ভাবল, শব্দটা মড়াকে জাগিয়ে তুলবে। রাইফেল তুলতে ঝুঁকল সে। তুলতে পারল না। অবশ হয়ে আছে তার বাহুমূল। 'লেগেছে আমার,' বিড়বিড় করে বলল সে।

ছাদের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে থেকে বুকে হেঁটে ছাদের রেলিং-এর কাছে ফিরে গেল সে। বাঁ হাত দিয়ে ডান বাহুমূলের ক্ষতস্থান স্পর্শ করল। কোটের হাতা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। কোনও ব্যথা নেই–কেমন একটা বিবশ অনুভূতি, যেন বাহুটা কেটে ফেলা হয়েছে।

দ্রুত পকেট থেকে ছুরিটা বের করল সে। ছাদের রেলিং-এর উপর দিকে চাপ দিয়ে ওটা খুলল। চিরে ফেলল হাতাটা। গুলিটা যেখান দিয়ে ঢুকেছে সেখানে ছোট্ট একটা গর্ত। উল্টো দিকে কোনও গর্ত নেই। হাড়ে আটকে গেছে গুলি। ফ্র্যাকচার সৃষ্টি করবে এটা নিঃসন্দেহে। ক্ষতের নীচ দিকে বাহু বাঁকা করল সে। সহজে পেছন দিকে বেঁকে গেল বাহু। ব্যথা সহ্য করতে দাঁতে দাঁত চাপল।

এরপর ফিল্ড ড্রেসিং বের করে ছুরি দিয়ে প্যাকেটটা কেটে ফাঁক করল। আয়োডিন বোতলের ঘাড় ভেঙে বোতলের ঝাঁঝাল

তরল পদার্থটুকু ক্ষতের ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় ফেলতে শুরু করল। ব্যথার তীব্র এক প্রবাহ বয়ে গেল তার মধ্য দিয়ে। তুলার পুঁটলিটা ক্ষতস্থানের ওপর বসিয়ে এর ওপর ড্রেসিং করল। ড্রেসিং-এর দুই প্রান্ত দাঁত দিয়ে শক্ত করল।

এবার সে প্যারাপিট ঘেঁষে স্থির হয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে ব্যথাটা সইয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

নীচের রাস্তায় নিথর হয়ে আছে সবকিছু। ব্রিজের ওপর দিয়ে দ্রুত গতিতে চলে গেছে আর্মার্ডকার, সঙ্গে নিয়ে গেছে টারেট থেকে ঝুলে থাকা মেশিন গান চালকের প্রাণহীন মাথাটা। এখনও রাস্তার পাশের নর্দমায় পড়ে আছে মহিলার মৃতদেহ।

অনেকক্ষণ ধরে স্থির হয়ে শুয়ে আছে স্নাইপার, আহত বাহুর পরিচর্যা করতে করতে পালানোর পরিকল্পনা করছে। সকালে যেন কিছুতেই তাকে আহত অবস্থায় ছাদের ওপর না পায়। তার পালানোর পথ রুদ্ধ করে রেখেছে উল্টোদিকের ছাদে অবস্থানকারী শত্রু। ওই শত্রুকে তার মেরে ফেলা উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে সে নিজের রাইফেল ব্যবহার করতে পারবে না। কাজটা সারার জন্য শুধু একটা রিভলভার সম্বল তার। একটা পরিকল্পনার কথা ভাবল সে।

ক্যাপ খুলে রাইফেলের নলের ওপর বসিয়ে দিল সে ওটা। এবার রাইফেলটা ধীরে-ধীরে প্যারাপিটের উপর দিকে ঠেলতে শুরু করল–যতক্ষণ না ক্যাপটা রাস্তার উল্টো দিক থেকে দেখা যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ শোনা গেল, ক্যাপের কেন্দ্র ভেদ করে চলে গেল গুলিটা। রাইফেল সামনের দিকে ঝোঁকাল স্নাইপার। রাস্তায় খসে পড়ল ক্যাপটা। এবার রাইফেলের মাঝখানটা ধরে বাঁ হাত ছাদের বাইরে বের করে নির্জীবভাবে ঝুলিয়ে রাখল। কয়েক মুহূর্ত পর রাইফেলটা রাস্তায় পড়ে যেতে দিল। এরপর সে ধপ করে ছাদের ওপর পড়ল, নিজের সঙ্গে হাতটাকে টেনে নিতে শুরু করল।

দ্রুত পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো সে, ছাদের কোনা দিয়ে উঁকি দিল। তার কৌশল সার্থক। ক্যাপ আর রাইফেল পড়ে যেতে দেখে অন্য স্নাইপার ভেবেছে, সে তার শত্রুকে মেরে ফেলেছে। এ মুহূর্তে একসারি চিমনি পটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। তাকিয়ে আছে আড়াআড়িভাবে। পশ্চিম আকাশের পটভূমিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার ছায়া-মাথা।

হাসল রিপাবলিকান স্নাইপার। প্যারাপিটের উপরে তুলল তার রিভলভার। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরত্ব—মৃদু আলোয় তীব্র একটা গুলি। তার ডান বাহু এমন ব্যথা করছে, যেন হাজারো শয়তান কষ্ট দিচ্ছে তাকে। ধীরে-সুস্থে লক্ষ্যস্থির করল সে। থরথর করে হাত কাঁপছে তার। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নাক দিয়ে লম্বা একটা শ্বাস টেনে গুলি করল। গুলির প্রচণ্ড শব্দে প্রায় কালা হয়ে গেল সে, তীব্র ঝাঁকি খেল বাহু।

এরপর ধোঁয়া সরে গেলে সামনে উঁকি দিয়ে আনন্দে চিৎকার দিল সে। গুলি খেয়েছে তার শত্রু। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে প্যারাপিটের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। পাদুটো ছাদের ওপর রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে, কিন্তু ধীরে-ধীরে সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছে, যেন স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে ব্যাপারটা। তার মুঠো থেকে খসে গেল রাইফেলটা, প্যারাপিটে বাড়ি খেয়ে পড়ে নীচের নাপিতের দোকানের খুঁটিতে লেগে ঠাস করে রাস্তায় পড়ল!

এবার ছাদের মৃত্যুপথযাত্রী লোকটা সামনের দিকে ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল। দেহটা শূন্যে পাক খেতে খেতে থপ করে আছড়ে পড়ল রাস্তায়। তারপর স্থির হয়ে গেল দেহটা।

শত্রুকে পড়ে যেতে দেখল স্নাইপার, ভয়ে শিউরে উঠল সে। মরে গেছে তার ভেতরের যুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা। দুঃখে যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে সে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে। ক্ষতস্থানের কারণে, গ্রীষ্মের লম্বা একটি দিনে কিছুই পেটে না

পড়ায় এবং ছাদে উঠে লক্ষ্য রাখতে রাখতে দুর্বল হয়ে পড়ায় শত্রুর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ থেকে জোর করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। কাঁপুনির চোটে দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে, বিড়বিড় করতে শুরু করল সে নিজের সঙ্গে, যুদ্ধকে অভিশাপ দিচ্ছে, অভিশাপ দিচ্ছে নিজেকে, প্রত্যেককে।

হাতের ধোঁয়া ওঠা রিভলভারের দিকে তাকাল সে। শপথ নিয়ে পায়ের কাছে ছাদের ওপর সজোরে ছুঁড়ে মারল ওটা। ছাদের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে গুলি বেরিয়ে গেল ওটা থেকে; শোঁ শোঁ শব্দ তুলে স্নাইপারের মাথা ঘেঁষে চলে গেল। শকের ফলে ভয়ে দিশেহারা অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল সে। স্থির হয়ে এল তার স্নায়ু। ভয়ের মেঘ দূরীভূত হয়ে গেল তার মন থেকে, হেসে উঠল সে।

পকেট থেকে হুইস্কির ফ্লাস্ক বের করে পুরোটাই খালি করে ফেলল সে। স্পিরিটের প্রভাবে বিচার-বুদ্ধি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তার। এখনই ছাদ থেকে নেমে গিয়ে কোম্পানি কমাণ্ডারকে রিপোর্ট করার সিদ্ধান্ত নিল। চারদিকে সুনসান নীরবতা। রাস্তা দিয়ে গেলে তেমন কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই। রিভলভারটা তুলে পকেটে ভরল। এরপর স্কাইলাইট দিয়ে বুকে হেঁটে নীচের বাড়িটায় নামতে শুরু করল।

স্নাইপার যখন রাস্তায় ওঠার গলিপথে পৌঁছুল, যে শত্রু-স্নাইপারকে সে খুন করেছে তার পরিচয় জানার জন্য হঠাৎ করেই কৌতূহল অনুভব করল সে। লোকটা যে-ই হোক না কেন, কেউকেটা গোছের কেউ হবে–সিদ্ধান্তে পৌঁছুল সে। লোকটা পরিচিত কেউ কি না জানতে উৎসুক হয়ে উঠল। এমনও হতে পারে সেনাবাহিনী দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার আগে তার কোম্পানিতেই ছিল লোকটা। ঝুঁকি নিয়ে তাকে দেখে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। ও'কনেল স্ট্রিট-এর চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর বোলাল সে কোণে দাঁড়িয়ে। রাস্তার ভাটিতে প্রচণ্ড গোলাগুলি

হচ্ছে, কিন্তু এখানে সব শান্ত।

রাস্তার ওপর দিয়ে তীরবেগে ছুটল স্নাইপার। একটি মেশিনগান থেকে শিলার মত গুলি ছুটে এসে তার চারপাশের মাটি ক্ষত-বিক্ষত করে দিচ্ছে। তবে একটা গুলিও তার গায়ে লাগল না। মুখ নিচু করে মৃতদেহটার পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। থেমে গেল মেশিনগান।

এবার স্নাইপার মৃতদেহটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে, তাকাল তার ভাইয়ের মুখের দিকে।

মূলঃ লিয়াম ও'ফ্ল্যাহার্টি
রূপান্তরঃ হাসান মোস্তাফিজুর রহমান

লাইকা

ঘুমের মধ্যে লাইকার গলা শুনলাম। ঘেউ ঘেউ করছে। সজাগ হতেই মনে পড়ে গেল। লাইকা মারা গেছে। পাঁচ বছর আগে পৃথিবীর মাটিতে কবর দেয়া হয়েছে ওকে। আমি এখন রয়েছি চাঁদে, আমাদের অবজার্ভেটরিতে, নিজের কামরায়।

বহু বছর আগে লাইকাকে খুঁজে পাই আমি। প্যালোমারে, অবজার্ভেটরিতে যাওয়ার পথে, রাস্তায় পড়ে পাই ওকে। এতটুকু ছিল বেচারী, আতঙ্কে থরহরিকম্প। গাড়িচাপা পড়ে মরবে ভয় হয় আমার। কাজেই তুলে নিই ওকে। কুকুর-বেড়াল বিশেষ পছন্দ করতাম না। ভাবি কোনও বন্ধু-বান্ধবকে দিয়ে দেব। এমনি সময় চোখ মেলে পিটপিট করে আমার দিকে চাইল ও। আর অমনি ভালবেসে ফেললাম পিচ্চিটাকে।

কাজেই আমার কাছেই রয়ে গেল লাইকা। চমৎকার এক অ্যালসেশিয়ান এবং অসম্ভব বুদ্ধিমতী। কাজে গেলে আমার সঙ্গে সঙ্গে ও-ও যেত। প্যালোমারে প্রকাণ্ড টেলিস্কোপ নিয়ে আমি যখন ব্যস্ত থাকতাম, ও চুপচাপ শুয়ে থাকত এক কোণে।

একদিন, বার্কলিতে যেতে হলো আমাকে। লাইকাকে ছেড়ে যেতে মন চাইল না, ফলে ওকেও তুলে নিলাম গাড়িতে। আমার বন্ধুরা কুকুর পছন্দ করে না, কিন্তু তারা লাইকাকে সিটিংরুমে শুতে দিতে আপত্তি করল না।

'ও খুব লক্ষ্মী মেয়ে,' বলি আমি। 'দেখো, রাতে একটুও ডিস্টার্ব করবে না।'

কিন্তু বললাম এক হলো আর। মাঝরাতে এমনই শোরগোল তুলল লাইকা, তিষ্ঠানো যায় না। ব্যাপারটা কী? সিটিংরুমে গিয়ে দেখি, দরজা আঁচড়াচ্ছে আর তারস্বরে চেঁচামেচি করছে ও।

'অ্যাই, চোপ!' ধমকে বললাম। 'বাইরে যেতে চাস যা। কিন্তু পাড়া মাথায় করছিস কেন?'

দরজা মেলে ধরতেই ছুটে বেরিয়ে গেল ও। তারপর আবার ফিরে এল, আমাকেও যেতে হবে। অগত্যা বেরোতে হলো।

হঠাৎই অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল। মাটি কাঁপতে শুরু করল থরথর করে। চারপাশ থেকে কেবল ভাঙচুরের শব্দ কানে আসছে। ভূমিকম্প। আশপাশের বাড়ি-ঘর সব ধসে পড়ছে সশব্দে। আমার বন্ধুর বাসাটাও ভেঙে পড়ল। বলা বাহুল্য, বেঘোরে মারা পড়ল ওরা। আমি বেঁচে গেলাম। ভূমিকম্পের খবর পেয়ে উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার এল। কিন্তু আমি ওতে উঠলাম না।

'আমার কুকুরটাকে আগে খুঁজে নিই,' বললাম। পাইলট ভাবল, লোকটার মাথাটাথা খারাপ। তবে শেষমেশ ঠিকই খুঁজে বের করলাম লাইকাকে।

এ ঘটনার পর থেকে, লাইকা আমার ছায়াসঙ্গীতে পরিণত হলো। কিছুদিন পর আমার ভাগ্যও গেল খুলে—চাঁদের অবজার্ভেটরিতে চিফ অ্যাস্ট্রোনমারের চাকরি জুটে গেল। চাঁদে লাইকাকে নিয়ে যেতে দেবে না। লাইকা কিংবা চাকরি—যে-কোনও একটাকে বেছে নিতে হবে। কাজটা খুবই কঠিন সন্দেহ নেই।

শেষমেশ, এক বন্ধুর জিম্মায় লাইকাকে রেখে চাঁদে পাড়ি জমালাম। এক মাস বাদে, খবর পেলাম মারা গেছে ও। এতটাই ভালবেসে ফেলেছিলাম, ওর অভাব ভীষণভাবে অনুভব করতাম আমি। প্রথমদিকে, প্রায়ই স্বপ্নে দেখতাম ওকে কিন্তু সময় যতই গড়াল, ততই কমে এল ব্যাপারটা।

শেষ যেবার ওকে স্বপ্নে দেখি, তারপর এক বছর পেরিয়ে

গেছে। কাজেই আজ ওর গর্জন শুনে ভয়ানক চমকে গেলাম।

হঠাৎ কেন মনে পড়ে গেল ওর কথা?

বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসে মনে করার চেষ্টা করলাম। ঠিক সে মুহূর্তে, আশপাশ থেকে ভাঙচুরের শব্দ উঠল। আমার কেবিনের ধাতব দেয়াল ফেড়ে হাঁ হয়ে গেল। হিস-হিস শব্দে বাতাস ধেয়ে যাচ্ছে। বিনা ভাবনায়, অ্যালার্ম বাটন টিপে দিয়ে, স্পেস হেলমেট মাথায় চড়ালাম। ভূমিকম্প।

অনেক বছর আগে, পৃথিবীর মাটিতে লাইকা একবার আমাকে রক্ষা করেছিল, ভূমিকম্পের কবল থেকে। আর আজ চাঁদের বুকে, স্বপ্নে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছে ও। আবারও আমার জীবন বাঁচিয়েছে লাইকা। কিন্তু কাজটা ও করল কীভাবে? এর জবাব জানা নেই আমার। কিন্তু আমি ওর প্রতি কৃতজ্ঞ, এবং কোনওদিন ওকে ভুলতে পারব না।

মূল: আর্থার সি. ক্লার্ক
রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

আলীবাবার গুহা

ল্যামবেথের সরু, বিশ্রী একটা বাড়ির সামনের ঘরে বসে আছে একজন লোক, হেরিং মাছের শুঁটকি চিবাতে চিবাতে চোখ বুলাচ্ছে মর্নিং পোস্টে। লোকটার উচ্চতা মাঝারি, মাথায় ঢেউ খেলানো বাদামি চুল, বাদামি দাড়ি। পরনে ডাবল-ব্রেস্টেড নেভি-ব্লু সুট। মোজা, টাই আর রুমাল নিখুঁতভাবে ম্যাচ করা, জুতোজোড়া উজ্জ্বল বাদামি। দেখে দুর্দান্ত কোনও ভদ্রলোক বলে মনে হয় না, তবে চেহারায় এমন একটা কিছু আছে যাতে মনে হয়, অভিজাত পরিবারের সাথে ওঠাবসার অভ্যেস তার আছে।

শুঁটকির পর যথেষ্ট পরিমাণে হ্যাম খেয়ে কফিতে চুমুক দিতে দিতে আগের পড়া প্যারাগ্রাফটাই আবার পড়ল সে দারুণ মনোযোগ দিয়ে।

'লর্ড পিটার উইমজের উইল

'দাতব্য প্রতিষ্ঠানে ১০০০০ পাউণ্ড।

'গত ডিসেম্বরে ট্যাঙ্গানিকায় শিকার করতে গিয়ে বন্যজন্তুর হাতে নিহত হয়েছেন লর্ড পিটার উইমজে। পরশু জানা গেছে, তাঁর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে ৫০০০০০ পাউণ্ড। এর মধ্যে ১০০০০ পাউণ্ড তিনি দান করেছেন বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে। (এখানে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা তালিকা।) তাঁর ভ্যালেট মারভিন বাণ্টার পাবে বাৎসরিক ৫০০ পাউণ্ড আর পিকাডিলির একটা ফ্ল্যাট। (এরপর নগদ টাকা দানের জন্যে মনোনীত আত্মীয়স্বজনদের একটা তালিকা।) বাদবাকি সম্পত্তি এবং

মূল্যবান পেইন্টিং আর বই পাবেন ১১০-এ, পিকাডিলিতে বসবাসরত উইলকারীর মা–ডেনভারের ডাচেস।

'মৃত্যুর সময় লর্ড পিটার উইমজের বয়স হয়েছিল সাঁইত্রিশ। ইউনাইটেড কিংডমের সবচেয়ে ধনাঢ্য ডিউক–ডেনভারের বর্তমান ডিউকের তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা। লর্ড পিটার ছিলেন একজন বিখ্যাত অপরাধ-বিশেষজ্ঞ, অনেক রহস্যের সমাধানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পেইন্টিং এবং দুষ্প্রাপ্য বইয়েরও তিনি ছিলেন এক বিখ্যাত সংগ্রাহক।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লোকটা।

'কোনও সন্দেহ নেই,' গলা চড়িয়ে বলল সে। 'মারা গেছেন লর্ড পিটার উইমজে। আমি মুক্ত।'

দ্রুত কফিটা শেষ করে, টেবিল মুছে, একটা বোলার হ্যাট মাথায় চাপিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল লোকটা।

বাসে করে এসে নামল বারমণ্ডজিতে। তারপর মিনিট পনেরো ধরে বিভিন্ন গলি পেরিয়ে, জীর্ণ একটা পাবলিক হাউসে পৌঁছে অর্ডার দিল ডাবল হুইস্কির।

হাউসটা এইমাত্র খুলেছে, অথচ এরই মধ্যেই তা খদ্দেরে ভর্তি। তাড়াতাড়ি গ্লাসের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে ল্যামবেথের লোকটার জোর কনুইয়ের গুঁতো লাগল চেক সুট আর বিশ্রী টাই পরা এক ভদ্রলোকের পাঁজরে।

'এসবের অর্থ কী!' ধমকে উঠলেন ভদ্রলোক। 'বেরোও এখান থেকে! যত্তোসব বাজে লোকের আমদানি!' আরও দু'চারটে বকুনি ঝেড়ে জোর একটা ধাক্কা দিলেন তিনি লোকটার বুকে।

'বার সবার জন্যেই খোলা, তাই না?' পাল্টা ধাক্কা মারল ল্যামবেথের লোকটা।

'ভদ্রলোক আপনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা দেননি, মি. জুক্স,' বলল বারমেইড।

'তাই নাকি?' বললেন মি. জুক্স। 'বেশ, আমি ধাক্কাটা কিন্তু ইচ্ছাকৃতই দিয়েছি।'

'সেজন্যে আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত,' গলা চড়াল তরুণীটি। 'বারে কোনওরকম ঝামেলা আমি বরদাস্ত করব না–বিশেষ করে এই সকালবেলা।'

'ঝামেলার মধ্যে আমি কখনওই নেই, কিন্তু কেউ যদি গায়ে পড়ে ঝামেলা পাকাতে আসে–'

'বেশ, বেশ, এখানেই শেষ হোক ব্যাপারটা,' বললেন চেক সুট পরিহিত মি. জুক্স। 'যা হবার হয়েছে। এবার বলুন, কোন্ ড্রিঙ্ক আপনার পছন্দ?'

'না, না, সেকী! ড্রিঙ্ক তো আমারই আপনাকে অফার করা উচিত। ধাক্কা দেয়ার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত।'

'বাদ দিন তো এই প্রসঙ্গ,' হাসলেন মি. জুক্স। 'আরেকটা ডাবল হুইস্কি, মিস। চলুন, এই ভিড়ের মধ্যে না থেকে কোণের একটা টেবিলে গিয়ে বসি।'

'চমৎকার অভিনয় করেছি আমরা,' বসার পর বললেন জুক্স। বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেনি কেউ। তবে সবসময় সাবধানতা অবলম্বন করা খুব সহজ নয়। এবার আপনার কথা বলুন, মি. রজার্স। সত্যি যোগ দিতে চান আমাদের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ,' ঝট করে পেছনটা একবার দেখে নিয়ে বলল রজার্স। 'যোগ দিতে চাই। অবশ্য সব দিক বিবেচনা করে যদি মনে ধরে। ঝামেলার মধ্যে আমি নেই। আপনাদের তথ্য জোগাতে আপত্তি নেই আমার, কিন্তু সক্রিয় কোনও ভূমিকা নিতে চাই না।'

'সক্রিয় ভূমিকা দেয়া হবেও না আপনাকে। মূল অপারেশন বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করান এক নম্বর। আপনি শুধু তথ্য জোগাবেন, বাকি কাজ আমাদের। আপনি জানতেও পারবেন না, কীভাবে শেষ হচ্ছে কাজটা, করছেই বা কে। এখানকার কেউই আপনাকে চিনতে পারবে না, আপনিও কাউকে নয়। অবশ্য এক

নম্বর ছাড়া, তিনি আমাদের সবাইকে চেনেন।'

'আর আপনি?' জানতে চাইল রজার্স।

'হ্যাঁ, আমিও চিনতে পারব। তবে আমাকে বদলি করে দেয়া হবে অন্য জেলায়। আজকের পর শুধু জেনারেল মিটিং ছাড়া আর কখনও দেখা হবে না আপনার সঙ্গে। তা ছাড়া, সেসময় আমরা সবাই মুখোশ পরে থাকব।'

'তারপর?' চোখ বড় বড় হয়ে উঠল রজার্সের।

'আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে এক নম্বরের কাছে। তিনি আপনাকে দেখবেন, কিন্তু আপনি তাঁকে দেখতে পাবেন না। তারপর যদি আপনাকে তাঁর পছন্দ হয়, নাম নথিভুক্ত করে তিনি আপনাকে জানাবেন, কোথায় রিপোর্ট করতে হবে। পাক্ষিক বিভাগীয় মিটিং হয় আমাদের, আর জেনারেল মিটিং হয় তিন মাস পর পর। প্রত্যেক সভ্যকে সেখানে নম্বর ধরে ডেকে মিটিয়ে দেয়া হয় ভাগের টাকা।'

'কিন্তু একই কাজের ভার যদি পড়ে দুই সভ্যের ওপর?'

'দিনের কাজ হলে এমন ছদ্মবেশ দেয়া হয় তাদের, আপন মা-ও চিনতে পারবে না। তবে রাতের কাজই আমাদের বেশি।'

'হুঁ। কিন্তু কেউ যদি আমাকে বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করে খবর দেয় পুলিশে, সেক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা?'

'কোনও ব্যবস্থা নেই। কিন্তু যদি জানতে পারি কারও অনুসরণ করার ইচ্ছে জেগেছে, তাকে নিষেধ করব আমি। শেষ যে লোকটা অনুসরণ করেছিল আমাদের এক সভ্যকে, ক'দিন পর তার লাশ ভেসে ওঠে রথারহিদ নদীতে, সারা মুখ খুবলে খেয়ে ফেলেছে মাছে। বুঝতেই পারছেন, কেমন করে যেন শেষ পর্যন্ত সবকিছু জেনে ফেলেন এক নম্বর।'

'তো—এই এক নম্বরটা কে?'

'সে-কথা জানার জন্যে অনেকে কাঁচা পয়সা খরচ করতেও এক পায়ে খাড়া।'

'কেউই তাঁকে চেনে না?'

'না। শুধু এটুকু জেনে রাখুন, তিনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, চোখ রয়েছে মাথার চারপাশে, আর ক্ষমতার হাতটি অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। না, দুই নাম্বার ছাড়া কেউই তাঁকে চেনে না, অ্যাণ্ড আই অ্যাম নট ইভেন শিওর অ্যাবাউট হার।'

'আপনাদের মধ্যে তা হলে মহিলাও আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। আজকালকার দিনে তাদের সাহায্য ছাড়া সব কাজ করে ওঠা যায় না। তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই আপনার। দুটো কথা বললেই এখানকার মহিলারা ঝুলে পড়তে চায় না।'

'এবার টাকা-পয়সার কথা বলুন, জুক্স। যে টাকা দেয়া হয়, তা কি ঝুঁকি নেয়ার পক্ষে যথেষ্ট?'

'শুধু যথেষ্ট?' ছোট্ট মার্বেল-টপ্‌ড্ টেবিলটার ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে আরও কী সব বললেন জুক্স।

দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল রজার্সের। 'ওই টাকার কতটা এখন পাব?'

'অন্য আর সবাই যতটা পাবে, ঠিক ততটা। সবসুদ্ধ পঞ্চাশজন সভ্য আছেন এখানে। একটি কাজ সুসম্পন্ন হলে, সে-কাজে আপনি জড়িত থাকুন বা না থাকুন, এক নম্বর যা পাবেন, তা-ই পাবেন আপনিও।'

'সত্যি? ঠাট্টা করছেন না?'

'সে আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। বলুন, এর চেয়ে বেশি আর পাবেন কোথাও?' হাসলেন জুক্স। 'সত্যি, এক নম্বরের তুলনা নেই।'

'এর মধ্যেই অনেক কাজ করেছেন আপনারা?'

'অনেক? শুনুন। ক্যারাথার নেকলেস চুরির কথা নিশ্চয় মনে আছে আপনার, কিংবা গরলেস্টন ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথা? ফেভারশ্যামে সিঁদ? ন্যাশনাল গ্যালারি থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিল

বড় একখানা রুবেন্স, মনে পড়ে? আর ফ্রেনশ্যাম মুক্তো? সব আমাদের কাজ। এখন পর্যন্ত একটা কেসের কিনারা করার সাধ্যও পুলিশের হয়নি। হবেও না।'

ঠোঁট চাটল রজার্স।

'মনে করুন আমি একজন স্পাই, এখান থেকে যদি সোজা চলে যাই পুলিশ স্টেশনে?'

'পথের মাঝেই ঘটে যাবে মারাত্মক দুর্ঘটনা।'

'আপনি কি বলতে চান, নজর রাখা হয়েছে আমার ওপর?'

'হ্যাঁ, সে-ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন। কিন্তু ধরুন, নিরাপদেই আপনি পৌঁছে গেলেন পুলিশ স্টেশনে। শয়তানগুলোকে নিয়ে খোঁজ করার জন্যে আবার আসবেন এই পাবে, তাই না?'

'যদি আসি?'

'আমাকে পাবেন না। ততক্ষণে আমি গিয়ে উপস্থিত হব পাঁচ নম্বরের কাছে।'

'কে এই পাঁচ নম্বর?'

'জানি না। কিন্তু তিনি জানেন, কীভাবে বদলাতে হয় মানুষের চেহারা। প্লাস্টিক সার্জারি। শুধু চেহারাই নয়, বদলে যাবে আঙুলের ছাপ। আমি রূপান্তরিত হব সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষে।'

শিস দিয়ে উঠল রজার্স।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইলেন জুক্স।

'অনেক কিছু জেনে ফেলেছি আমি। এখন যদি আপনাদের সঙ্গে যোগ না দিই, জীবন কাটাতে পারব নিরাপদে?'

'নিশ্চয় পারবেন—অবশ্য যদি আমাদের জন্য কোনও চিন্তার কারণ হয়ে না দাঁড়ান।'

'হুঁ। আর যদি যোগ দিই?'

'ধনী হয়ে যাবেন চোখের পলকে। হেসে-খেলে কাটিয়ে দিতে পারবেন বাকি জীবনটা।'

চুপ করে বিষয়টা ভাবতে লাগল রজার্স।

'আমি রাজি!' বলল শেষমেশ।

'চমৎকার। মিস, আরেকটা ডাবল হুইস্কি। রজার্স, প্রথম দেখাতেই আপনাকে পছন্দ করেছিলাম আমি। চলুন, আজ রাতেই দেখবেন এক নম্বরকে।'

'কোথায় আসতে হবে আমাকে? এখানে?'

'না। আজই এই পাবে আমাদের শেষ আসা। আজ রাত ঠিক দশটায় ল্যামবেথ ব্রিজ পেরিয়ে হাঁটতে থাকবেন উত্তরে। দেখবেন, হলুদ একটা ট্যাক্সির ওপর ঝুঁকে পড়ে এঞ্জিন পরীক্ষা করছে ড্রাইভার। বলবেন, "তোমার গাড়ি এখন রওনা দিতে পারবে?" জবাবে সে বলবে, "নির্ভর করছে আপনি কোথায় যেতে চান তার ওপর।" এবার আপনি বলবেন, "আমাকে নিয়ে চলো এক নম্বরে।" ওই নামে একটা দোকান আছে, কিন্তু লোকটা আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবে না। গাড়ির জানালা ঢাকা থাকবে, আশা করি কিছু মনে করবেন না। প্রথমবার ওভাবেই নিয়ে যাওয়া হয় সবাইকে। পরে আপনি যখন নিয়মিত সভ্য হবেন, জানিয়ে দেয়া হবে জায়গাটার ঠিকানা। ওখানে পৌঁছে যা বলার সত্যি বলবেন। মিথ্যে বললে কিন্তু টের পেয়ে যাবেন এক নম্বর। আর তা হলে কী ঘটবে, বুঝতেই পারছেন?'

'হুঁ।'

'ভয় পাচ্ছেন?'

'মোটেই না।'

'চলুন, এবার ওঠা যাক। গুড বাই, আর আপনার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে না। গুড বাই—অ্যাণ্ড গুড লাক!'

সুইং-ডোর ঠেলে দু'জন বেরিয়ে এল পাব থেকে।

রজার্স সভ্য হবার পর কেটে গেছে দুটো বছর। এর মধ্যে বেশকিছু অঘটন ঘটেছে লণ্ডনের বিভিন্ন জায়গায়। চুরি হয়ে গেছে ডেনভারের ডাচেসের বিখ্যাত হীরের টায়রা; মরহুম লর্ড পিটার

উইমজের বাড়ি থেকে উধাও হয়েছে আনুমানিক ৭০০০ পাউণ্ডের সোনা আর রূপোর প্লেট; সিঁদ পড়েছে কোটিপতি থিয়োডোর উইট্রিপের ম্যানসনে; কভেন্ট গার্ডেনে 'ফাউস্ট' অভিনীত হবার সময় ছিনতাই হয়েছে ডিঙলউডের মারশেনিসের সুবিখ্যাত আট সারির মুক্তোর নেকলেস। পরে অবশ্য জানা যায়, নেকলেসটা ছিল ইমিটেশন। আসলটা বন্ধক দিয়েছেন মহিলা স্বামীর এক দারুণ বিপদে।

জানুয়ারি মাস। শনিবারের এক বিকেলে ল্যামবেথে নিজের ঘরে বসে আছে রজার্স, এমন সময় একটা শব্দ ভেসে এল তার কানে। ছুটে গিয়ে সামনের ঘরের দরজাটা খুলে ফেলল সে। পড়ে আছে ফাঁকা রাস্তা। তবু ফেরার সময় সিটিংরুমে একটা খাম পেল সে, এসেছে একুশ নম্বরের নামে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে খামটা খুলে ফেলল রজার্স। পুরো চিঠিটা সঙ্কেতে লেখা, ধীরে-সুস্থে অর্থোদ্ধার করার পর দাঁড়াল এরকম:

'একুশ নম্বর–আজ রাত সাড়ে এগারোটায় এক নম্বরের বাড়িতে বসবে অসাধারণ এক জেনারেল মিটিং। আপনি অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। পাশওয়ার্ড—চূড়ান্ত।'

এক মিনিট দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবল রজার্স, তারপর এল বাড়ির পেছন দিকের এক ঘরে। সেখানে দেয়ালের গায়ে বসানো লম্বা একটা সিন্দুক। কমবিনেশন ঘুরিয়ে সিন্দুকের ভেতর ঢুকে পড়ল সে। ভেতরটা বেশ লম্বা, ঠিক স্ট্রং-রুমের মত। 'করেসপণ্ডেন্স' ছাপ মারা একটা ড্রয়ার টেনে সদ্য পাওয়া খামটা সেখানে রেখে দিল রজার্স।

কয়েক মুহূর্ত পর বেরিয়ে এসে, নতুন একটা কমবিনেশন সেট করে, আবার সিটিংরুমে ফিরে এল সে।

'চূড়ান্ত,' বিড়বিড় করে বলল রজার্স। 'হ্যাঁ, আমারও তা-ই মনে হয়।' হাত বাড়াল সে টেলিফোনের দিকে–কী ভেবে আবার গুটিয়ে নিল হাতটা।

তারপর সে এসে উপস্থিত হলো ওপরতলার এক চিলেকোঠায়, দেয়াল বেয়ে উঠে ঢুকে পড়ল ছাদসংলগ্ন ছোট্ট একটা কুঠুরিতে। বরগাগুলোর ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে সে এসে পৌঁছুল কুঠুরিটার অন্য প্রান্তে। বরগার গায়ের একটা বোতামে সাবধানে চাপ দিতেই খুলে গেল একটা চোরা-দরজা। সেই দরজা দিয়ে সামান্য এগোতেই সে এসে হাজির হলো পাশের বাড়ির একটা কুঠুরিতে। স্কাইলাইটের নীচে তিনটে খাঁচা, প্রত্যেকটায় একটা করে কবুতর।

পকেট থেকে নোটবুকের একটা পাতা নিয়ে দ্রুত একটা চিঠি লিখে ফেলল সে, তারপর সবচেয়ে কাছের খাঁচার কবুতরটাকে বের করে চিঠিটা আটকে দিল তার ডানায়। কবুতরটাকে ছেড়ে দিতে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল পাখিটা, তারপর ডানা মেলে হারিয়ে গেল অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে।

ঘড়ি দেখে নীচতলায় নেমে এল রজার্স। ঠিক এক ঘণ্টা পর সে ছেড়ে দিল আরেকটা কবুতর, আরও এক ঘণ্টা পর তৃতীয়টা। তারপর চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল।

সাড়ে ন'টায় আবার উঠে এল সে ওপরে। জবাব এসেছে। মেঝে থেকে কবুতরটাকে তুলে নিয়ে ডানায় আটকানো কাগজটা খুলে নিল সে। কিন্তু চিঠি পড়ার আগে কবুতরটাকে ভালভাবে খাইয়ে ঢোকাল খাঁচায়, দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে কী ভেবে নিরস্ত করল নিজেকে।

'যদি আমার ভাগ্যে তেমন কিছু ঘটে যায়,' বলল সে ফিসফিস করে। 'তোদের না খাইয়ে মারার কোনও মানে হয় না।' খাঁচার দরজা হাট করে খুলে দিয়ে নেমে এল নীচে।

মাত্র দুটো অক্ষর চিঠিটাতে–O.K., সে-ও লেখা হয়েছে খুব তাড়াহুড়োয়। কাগজটা পুড়িয়ে রজার্স এল রান্নাঘরে, পেট পুরে খেল ডিম আর কর্নড বিফ। তারপর শোবার ঘরে এসে একটা ড্রয়ার খুলে বের করল রিভলভারটা। ভালভাবে নেড়েচেড়ে দেখল,

সচল আছে কি না, তারপর নতুন একটা প্যাকেট ভেঙে বুলেট ভরল। আবার অপেক্ষার পালা।

পৌনে এগারোটায় সে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে, ধীরে-ধীরে হেঁটে বড় রাস্তার মোড়ে এসে উঠে পড়ল একটা বাসে। কয়েকবার বাস বদল করে সে এসে পৌঁছল হ্যাম্পস্টেডের অভিজাত এক আবাসিক এলাকায়। বাস থেকে নেমে রওনা দিল হীথ অভিমুখে।

আকাশে চাঁদ নেই, তবু অন্ধকার প্রকৃতিকে পুরো গ্রাস করেনি। হীথের নির্জন দিকটায় পৌঁছার পর রজার্স লক্ষ করল, বিভিন্ন দিক থেকে এগিয়ে আসছে বেশ কয়েকটা গাঢ় মূর্তি। বড় একটা গাছের পেছনে দাঁড়িয়ে মুখোশ পরল রজার্স, ঢেকে গেল ভ্রূ থেকে চিবুক পর্যন্ত। কালো ভেলভেটের মুখোশটার গোড়ায় জ্বলজ্বল করছে সাদা সুতোয় তোলা নম্বরটা—২১।

হীথের একেবারে প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ বাড়িটা। আলো জ্বলছে একটা জানালায়। দরজার কাছে যেতে মুখোশ পরা আরও কয়েকজন এগিয়ে এল তার চারপাশ থেকে। রজার্স গুনল, সবসুদ্ধ ছ'জন।

দরজায় টোকা দিল সবচেয়ে সামনের লোকটা। এক মুহূর্ত পর সামান্য ফাঁক হলো দরজা, লোকটা মাথা গলিয়ে দিল সেই ফাঁক দিয়ে। বিড়বিড় করে কী যেন বলল সে, খুলে গেল পুরো দরজা। লোকটা ভেতরে পা দিতেই দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

তিনজন ঢোকার পর এল রজার্সের পালা। টোকা দিল সে, প্রথম তিনবার জোরে, তারপর দু'বার ধীরে। মাত্র দু'তিন ইঞ্চি ফাঁক হলো দরজাটা, একটা কান শুধু দেখা গেল সে-ফাঁকে। ফিসফিস করে রজার্স বলল, 'চূড়ান্ত।' তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হলো কান, খুলে গেল দরজা।

ভেতরে ঢুকে রজার্স এগোল বামহাতি একটা ছোট্ট ঘরের দিকে। ঘরটা অনেকটা অফিসের মত, একটা ডেস্ক, একটা সিন্দুক আর একজোড়া চেয়ার রয়েছে সেখানে। ডেস্কে বসে আছে

বিশালদেহী এক মানুষ, সামনে একখানা লেজার। রজার্সের পরে ঢোকা লোকটা ডেস্কের দিকে এগিয়ে এসে ঘোষণা করল, ‘একুশ নম্বর, স্যর,’ তারপর অপেক্ষা করতে লাগল সম্ভ্রমভরে। মুখ তুলল বিশালদেহী, কালো ভেলভেটের ওপর ঝিকমিক করছে ১ নম্বর। গাঢ় একজোড়া নীল চোখ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল রজার্সকে। তারপর তার এক ইশারায় রজার্স খুলে ফেলল মুখোশ। আবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল নীল চোখজোড়া। পুঙ্খানুপুঙ্খ এই পরীক্ষায় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রজার্স, মাথা নামিয়ে ফেলল নিজের অজান্তেই। অবশেষে সন্তুষ্ট হয়ে, ২১ নম্বরটা লেজারভুক্ত করে, হাতের ঝাপটায় তাকে যাবার নির্দেশ দিল প্রেসিডেন্ট। একটা শ্বাস চেপে, মুখোশটা পরে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এল রজার্স। তৎক্ষণাৎ তার স্থান দখল করল পরের জন।

বিশাল একটা ঘরে মিলিত হয়েছে সভ্যরা। পরিষ্কার আলোয় ঝলমল করছে সারা ঘর। এক কোণে রাখা একটা গ্রামোফোনে তারস্বরে বেজে চলেছে জ্যাজ রেকর্ড, আর সেই সুরের তালে-তালে নাচছে দশ জোড়া মুখোশধারী নরনারী, কারও কারও পরনে সান্ধ্য পোশাক, অন্যদের টুইড আর জাম্পার।

ঘরের আরেক কোণে একটা আমেরিকান বার। যে লোকটা বারের দায়িত্বে আছে, তার কাছে গিয়ে একটা ডাবল হুইস্কি চাইল রজার্স। তারপর ধীরে-ধীরে তাতে চুমুক দিতে লাগল বারের গায়ে হেলান দিয়ে। হঠাৎ কে যেন গিয়ে বন্ধ করে দিল গ্রামোফোনটা। ঘুরে দাঁড়াল রজার্স। ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে এক নম্বর, পাশে দাঁড়ানো কালো পোশাক পরিহিতা চমৎকার শরীরের এক মহিলা। মুখোশের ওপর দেখা যাচ্ছে তার নম্বর—২।

‘লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন,’ গমগম করে উঠল এক নম্বরের কণ্ঠ। পাশের মহিলাটি মাথা নিচু করে থাকলেও টানটান হয়ে আছে তার সারা শরীর।

‘লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন। আজ এখানে আমাদের দু’জন

সভ্য অনুপস্থিত।' গোনার জন্যে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল মুখোশগুলো। 'কোর্ট-উইণ্ডলশ্যাম হেলিকপ্টার প্ল্যানটা সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে। আমাদের দুঃসাহসী এবং নিবেদিতপ্রাণ দুই কমরেড–পনেরো আর আটচল্লিশ নম্বরকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশে।'

অস্বস্তির একটা গুঞ্জন উঠল ঘর জুড়ে।

'শঙ্কিত হবার কোনও কারণ নেই। যথাযথ নির্দেশ আমি দিয়ে রেখেছিলাম। আজ সন্ধ্যায় রিপোর্ট পেলাম, তাদের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আপনারা জেনে নিশ্চয় সুখী, এমন চমৎকার দু'জন মানুষকে সর্বসমক্ষে কাঠগড়ায় ওঠা কিংবা দীর্ঘ কারাভোগের মত অসম্মানের মুখোমুখি হতে হলো না।'

চেপে রাখা শ্বাস ছাড়ল সবাই একযোগে।

'তাঁদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। এই দায়িত্ব নিতে আমি অনুরোধ করছি বারো এবং চৌত্রিশ নম্বরকে। মিটিং-এর পর যথাযথ নির্দেশ লাভের জন্যে তাঁরা উপস্থিত হবেন আমার অফিসে। যে দুটো নম্বর বললাম, তাঁরা কি দয়া করে জানাবেন, দায়িত্বটা নিতে তাঁরা রাজি আছেন কি না?'

দুটো হাত ওপরে উঠল। ঘড়ি দেখে নিয়ে প্রেসিডেণ্ট বলল, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, পরবর্তী নাচের জন্যে দয়া করে সঙ্গী বেছে নিন।'

আবার চালু হলো গ্রামোফোন। রজার্স তাকাল লাল পোশাক পরা একটি মেয়ের দিকে। মাথা হেলিয়ে মেয়েটি সম্মতি জানাতে দু'জনে নাচতে লাগল ফক্স-ট্রট। এদিক-সেদিক জোড়ায়-জোড়ায় সবাই চক্রাকারে ঘুরছে।

'কী ব্যাপার?' ফিসফিস করে বলল মেয়েটি। 'ভয় লাগছে আপনার? মনে হচ্ছে, ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে চলেছে!'

'ওই দু'জনকে না মেরে কোনও উপায় ছিল না,' বলল রজার্স। 'নিরাপত্তার খাতিরেই প্রেসিডেণ্টকে এটা করতে হয়েছে।'

'আহা, বেচারারা–'

নাচতে নাচতে পেছন থেকে একজন কাঁধ ছুঁল রজার্সের। 'প্লিজ, কথা বলবেন না।' রজার্সের হাতের মধ্যে থরথর করে কেঁপে উঠল মেয়েটি।

গ্রামোফোন থেমে গেছে। চারপাশ থেকে ভেসে আসছে হাততালির শব্দ। সবাই গিয়ে আবার জমায়েত হলো প্রেসিডেন্টের আসনের সামনে।

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন। আপনারা হয়তো ভেবে অবাক হচ্ছেন, কী কারণে ডাকা হয়েছে এই অসাধারণ মিটিং। কারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সাম্প্রতিক প্ল্যান অযথা বিফল হয়নি। সেই রাতে পুলিশের হঠাৎ আবির্ভাব নিছক কোনও দুর্ঘটনা নয়। আমাদের মাঝে রয়েছে একজন বিশ্বাসঘাতক।'

সরে গেল যে যার সঙ্গীর কাছ থেকে। সবার চোখে এখন থিকথিক করছে সন্দেহ।

'ডিঙলউডের দুঃখজনক ঘটনাটার কথা নিশ্চয় মনে আছে আপনাদের। এমনি আরও অনেক প্ল্যান অল্পের জন্যে ব্যর্থ হয়েছে। তবে সব ঝামেলার মূল কারণ পাওয়া গেছে। আমাদের বুক এখন হালকা। আসল বিশ্বাসঘাতককে এবং তাকে যে এখানে নিয়ে এসেছে, উভয়েরই হবে চরম শাস্তি।'

প্রত্যেকটি চোখ ইতস্তত ঘুরতে লাগল বিশ্বাসঘাতক আর তার হতভাগ্য স্পনসরের সন্ধানে। ওইসব মুখোশের নীচে কোনও একটা মুখ নিশ্চয় হয়ে গেছে কাগজের মত সাদা; কালো ওই ভেলভেটের নীচে কোনও একটা ভ্রূ ভিজে উঠেছে ঘামে, যে ঘাম বেরোয়নি উদ্দাম নৃত্যের ফলে। কিন্তু মুখোশ আড়াল করে রেখেছে যাবতীয় রহস্য।

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, পরবর্তী নাচের জন্যে দয়া করে সঙ্গী বেছে নিন।'

গ্রামোফোনে এবার বাজতে লাগল এক পুরানো, অর্ধবিস্মৃত

সুর: *আমাকে ভালবাসার কেউ নেই*। লাল পোশাক পরা মেয়েটি এখন নাচছে সান্ধ্য পোশাকে সজ্জিত এক লম্বা লোকের সঙ্গে। কাঁধে একটা হাত এসে পড়ায় চমকে উঠল রজার্স। কখন যেন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সবুজ জাম্পার পরা ছোটখাট এক স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল দু'জনে।

আবার থেমে গেল গ্রামোফোন, তুমুল হাততালির পর ভেসে এল প্রেসিডেন্টের স্বর।

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, স্বাভাবিক আচরণ করুন। এটা নাচ, জনসভা নয়।'

রজার্স তার সঙ্গিনীকে বসিয়ে দিল একটা চেয়ারে।

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, চরম এই উত্তেজনা নিশ্চয় আর সহ্য হচ্ছে না আপনাদের। এই মুহূর্তে আমি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ঘোষণা করছি। সাঁইত্রিশ!'

লাফিয়ে উঠল একজন লোক, গলা চিরে বেরিয়ে এল তীব্র আতঙ্কের এক চিৎকার।

'সাইলেন্স!'

হাঁসফাঁস করতে লাগল লোকটা।

'আমি কখনও...শপথ করে বলছি...আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

'সাইলেন্স। হিসেবে ভুল হয়েছে আপনার, তার ব্যবস্থা নেয়া হবে। স্বপক্ষে যদি কিছু বলার থাকে, পরে শুনব। বসুন।'

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সাঁইত্রিশ নম্বর, মুখোশের ভেতর রুমাল ঢোকাল মুখ মোছার জন্যে। দু'পাশে এসে দাঁড়াল লম্বা দু'জন লোক।

ঝাঁ ঝাঁ করে আবার বেজে উঠল গ্রামোফোন।

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, এবার আমি খুলে দেব বিশ্বাসঘাতকের মুখোশ। একুশ নম্বর, এদিকে আসুন।'

রজার্স এগোল। প্রচণ্ড ঘৃণা ঝরে পড়তে লাগল আশপাশের আটচল্লিশ জোড়া চোখ থেকে। গুঙিয়ে উঠলেন জুক্স।

'হায় ঈশ্বর!'

'সাইলেন্স! একুশ নম্বর, আপনার মুখোশ খুলে ফেলুন।'

মুখোশ টেনে নামিয়ে দিল বিশ্বাসঘাতক। ঘৃণামিশ্রিত চোখগুলো যেন তাকে গিলে খেতে চাইল।

'সাঁইত্রিশ নম্বর। আপনিই এই বিশ্বাসঘাতককে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। নাম জোসেফ রজার্স, ডেনভারের ডিউকের ভূতপূর্ব ফুটম্যান, চাকুরি যায় ছিঁচকে চুরির দায়ে। এসব তথ্য আপনি ভালভাবে যাচাই করে দেখেছিলেন?'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়! ঈশ্বর সাক্ষী–যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করেছি আমি।'

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, পরবর্তী নাচের জন্যে...'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল একুশ নম্বর, এর মধ্যেই তার হাতে পরানো হয়েছে হাতকড়া। চারপাশে শুরু হলো ধ্বংসের নৃত্য। বহু যুগ পরে যেন শেষ হলো তা, ঘর ভেঙে পড়ল হাততালির শব্দে।

'একুশ নম্বর, আপনার নাম দেয়া আছে–জোসেফ রজার্স। এটা কি আপনার আসল নাম?'

'না।'

'কী নাম আপনার?'

'পিটার ডেথ ব্রেডন উইমজে।'

'আমরা ভেবেছিলাম, আপনি মারা গেছেন।'

'স্বাভাবিক। আপনাদের তেমনটাই ভাবানো হয়েছিল।'

'আসল জোসেফ রজার্সের কী খবর?'

'তিনি বিদেশে মারা যান। তাঁর স্থান দখল করি আমি। আমার পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে না পারার জন্যে আপনার সভ্যদের খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। আমি শুধু রজার্সের স্থানই দখল করিনি, হয়ে উঠেছিলাম পুরোদস্তুর রজার্স। একা থাকলেও আমি রজার্সের মত হাঁটতাম, রজার্সের মত বসতাম, বই পড়তাম রজার্সের, পরতাম তার কাপড়। শেষের দিকে আমি

এমনকী চিন্তাভাবনাও করতাম রজার্সের মত।'

'হুঁ। আপনার ফ্ল্যাটে ডাকাতিটা তা হলে সাজানো?'

'অবশ্যই।'

'ডেনভারের ডাচেসের বাড়ির ডাকাতিটাও কি সংঘটিত হয়েছিল আপনার সম্মতিতে?'

'হ্যাঁ, টায়রাটা বিশ্রী—অমন একটা জিনিস হারিয়ে যাওয়া রুচিসম্পন্ন কোনও মানুষের জন্যেই বিশেষ ক্ষতির বিষয় নয়। যাই হোক, আমি কি ধূমপান করতে পারি?'

'না। লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন...'

বন্দির মনে হলো, নেচে চলেছে অসংখ্য দম দেয়া পুতুল। তাকিয়ে রইল সে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে।

'পনেরো, বাইশ, এবং ঊনপঞ্চাশ নম্বর। বন্দির ওপর নজর রাখার দায়িত্ব ছিল আপনাদের। উনি কি কখনও কারও সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন?'

'না,' বলল বাইশ নম্বর। 'সবসময় তাঁর ওপর নজর রেখেছি আমরা, চিঠি আর পার্শেল খুলে দেখেছি, টেলিফোনও ট্যাপ করা ছিল।'

'যা বলছেন, নিশ্চিত হয়ে বলছেন?'

'অবশ্যই।'

'বন্দি, এই ব্যাপারটার সঙ্গে কি আপনি একা জড়িত? সত্য বলুন, তা ছাড়া দুর্ভোগ আরও বাড়বে।'

'হ্যাঁ, আমি একা। অহেতুক কাউকে জড়ানোর ঝুঁকি নিইনি।'

'হতে পারে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ওই লোকটার মুখ অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে। কী যেন নাম?—পার্কার। বন্দির ভ্যালেট—মারভিন বাণ্টার—তারও ব্যবস্থা করা দরকার। হয়তো তার মা এবং বোনেরও। ভাইটা বোধহয় খানিকটা হাবা টাইপের, তবু লক্ষ করতে হবে তার কার্যকলাপ।'

প্রথমবারের মত সামান্য অস্থিরতা প্রকাশ পেল বন্দির মধ্যে।

'স্যর, আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আপনাদের বিপদ হতে পারে এমন কোনও তথ্য আমার মা বা বোন জানে না।'

'তাঁদের কথা আপনার আগেই ভাবা উচিত ছিল। লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, পরবর্তী নাচের...'

'না-না!' চেঁচিয়ে উঠল বেশ কিছু সভ্য। 'না! বন্দির একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করুন। ভেঙে দিন মিটিং। এ ধরনের মিটিং অত্যন্ত বিপজ্জনক। যে-কোনও সময় পুলিশ—'

'সাইলেন্স!'

চারপাশে একটা দৃষ্টি বোলাল প্রেসিডেণ্ট। মুখোশের ভেতর ধকধক করছে জোড়া-জোড়া চোখ। 'বেশ। বন্দিকে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দিন। তার ওপর প্রয়োগ করবেন ৪ নম্বর ট্রিটমেণ্ট। আর হ্যাঁ, প্রয়োগের আগে বিশদভাবে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে ভুলবেন না।'

'আহ্!'

জান্তব স্বস্তির শ্বাস পড়ল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কঠিন দুটো হাত চেপে বসল উইমজের বাহুতে।

'ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে শান্তিতে মরতে দিন।'

'এসব কথা আপনার আগেই ভাবা উচিত ছিল। নিয়ে যান ওকে। লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, নিশ্চিত থাকুন–খুব সহজে উনি মরবেন না।'

'থামুন!' মরিয়া স্বর ধ্বনিত হলো উইমজের গলায়। 'আমার কিছু বলার আছে। আমি জীবন ভিক্ষা চাই না–চাই দ্রুত মৃত্যু। তার বিনিময়ে আমি একটা জিনিস দেব।'

'জিনিস?'

'হ্যাঁ।'

'শত্রুর সঙ্গে কোনও কথা নেই আমাদের।'

'তবু শুনুন। আপনি কি মনে করেন, এরকম পরিণতির কথা আমি কখনও ভাবিনি? মানুষ অত পাগল হয় না। এখানে আসার

আগে আমি একটা চিঠি রেখে এসেছি।'

'চিঠি? কার উদ্দেশে লেখা?'

'পুলিশের। যদি আগামীকাল না ফিরি তা হলে–'

'তা হলে?'

'চিঠিটা খোলা হবে।'

'স্যর,' বলে উঠল পনেরো নম্বর। 'কথাগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যে। বন্দি কাউকে কোনও চিঠি পাঠাননি। গত কয়েক মাস ধরে তাঁর ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে।'

'চিঠিটা আমি রেখেছি ল্যামবেথে আসার আগে।'

'তা হলে সেটাতে মূল্যবান কোনও তথ্য নেই।'

'আছে।'

'কী?'

'আমার সিন্দুকের কমবিনেশন।'

'বন্দির সিন্দুকে তল্লাশি চালানো হয়েছে?'

'জী, স্যর।'

'কী আছে সেখানে?'

'তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, স্যর। আমাদের সংগঠনের একটা খসড়া–এই বাড়ির নাম–স্যর, কোনওটাই আগামীকাল সকালের আগে পরিবর্তন করা যাবে না।'

উইমজে হাসল।

'আপনি কি সিন্দুকের ভেতরের খোপটা দেখেছিলেন?'

জবাব নেই।

'উনি কী বললেন, শুনতে পেয়েছেন নিশ্চয়,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল প্রেসিডেন্টের গলা। 'ভেতরের খোপটা খুঁজে পেয়েছিলেন?'

'ভেতরে কোনও খোপ নেই। উনি আমাদের ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছেন, স্যর।'

'না,' শান্ত স্বরে উইমজে বলল, 'ভেতরের খোপটা আপনাদের চোখেই পড়েনি।'

'বেশ,' বলল প্রেসিডেন্ট। 'সেরকম খোপ যদি থেকেই থাকে, কী আছে তার ভেতর?'

'আপনার সংগঠনের প্রত্যেকটি সভ্যের নাম, ঠিকানা, ফোটো আর আঙুলের ছাপ।'

'কী?'

মুখোশের ভেতরের চোখগুলোতে এবার ভর করল আতঙ্ক। শুধু উইমজে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল প্রেসিডেন্টের দিকে।

'কীভাবে ওসব সংগ্রহ করলেন?'

'সামান্য গোয়েন্দাগিরি করতে হয়েছে।'

'কিন্তু সবসময় নজর রাখা হয়েছে আপনার ওপর।'

'তা ঠিক। তবে যাঁরা নজর রেখেছেন, তাঁদের আঙুলের ছাপ রয়েছে আমার সংগ্রহের প্রথম পৃষ্ঠায়।'

'আপনার বিবৃতি প্রমাণ করতে পারবেন?'

'নিশ্চয়। প্রমাণ আমি এখনই করে দিচ্ছি। যেমন ধরুন, পঞ্চাশ নম্বরের আসল নাম হলো–'

'থামুন!'

গুঞ্জন উঠল সারা ঘর জুড়ে। হাতের এক ইশারায় তা থামিয়ে দিল প্রেসিডেন্ট।

'যদি নাম উল্লেখ করেন, অনুগ্রহ পাবার কোনও সম্ভাবনাই আর আপনার থাকবে না। ৫ নম্বর একটা ট্রিটমেণ্ট আছে–যারা নাম উল্লেখ করে, বিশেষভাবে তাদের জন্যে। বন্দিকে আমার অফিসে নিয়ে আসুন। নাচ চলুক।'

ডেস্কের ওপারে বসে পকেট থেকে একটা অটোমেটিক বের করে বন্দির দিকে তাকাল প্রেসিডেন্ট। 'এবার বলুন!'

'আপনার জায়গায় আমি থাকলে ওই অস্ত্রটি হাতেই নিতাম না,' বলল উইমজে। 'পাঁচ নম্বর ট্রিটমেণ্টের তুলনায় ওটার গুলি খাওয়া অনেক ভাল।'

'কথাবার্তায় আপনি একটু বেশি পাকা। এবার বলুন, কতটুকু

জানেন আমাদের সম্বন্ধে।'

'বললে কি আমার কষ্ট লাঘব হবে?'

'কথা দিতে পারছি না। বলুন শিগ্‌গির।'

হাতের বাঁধন আর কাঁধ ঝাঁকাল উইমজে। 'হ্যাঁ, নিশ্চয় বলব। যথেষ্ট হলে থামাবেন আমাকে।' ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় কথা বলতে লাগল উইমজে। মাথার ওপরের মাইক্রোফোনে ভেসে আসা গ্রামোফোন আর স্টেপিং-এর শব্দে বোঝা যাচ্ছে, নাচ চলছে। এখন এদিক দিয়ে যদি কোনও পথচারী যায়, ভাববে মহোৎসব চলছে নিঃসঙ্গ বাড়িটাতে।

'আর বলব?' জানতে চাইল উইমজে।

প্রেসিডেন্টের মুখোশের নীচ থেকে এমন একটা শব্দ ভেসে এল, যেন হেসে উঠল সে।

'আপনার কথা শুনে আফসোস হচ্ছে যে, আপনি আমাদের একজন নন। উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস আর শ্রম আমাদের সংগঠনের পক্ষে জরুরি। কিন্তু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বোধহয় আপনাকে দলে টানা সম্ভব নয়, তাই না?' একটা বেল বাজাল প্রেসিডেন্ট। একজন মুখোশধারী ঢুকতে বলল, 'সভ্যদের অনুরোধ করুন, তাঁরা যেন সবাই সাপার-রুমে যান।'

সাপার-রুমটা নীচতলায়, পর্দা দিয়ে ঘেরা। লম্বা একটা টেবিল ঘরের মাঝখানে, দু'পাশে সারি-সারি চেয়ার। কিন্তু খাবার-দাবারের কোনও চিহ্ন নেই কোথাও।

'মহাভোজের আয়োজন দেখছি,' খোঁচা মারল উইমজে। এর আগে কখনও এই ঘরে সে আসেনি। এক প্রান্তে, মেঝেতে একটা চোরা-দরজা মুখ ব্যাদান করে আছে।

প্রেসিডেন্ট এসে দাঁড়াল টেবিলের মাথায়।

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, ঘটনা অত্যন্ত গুরুতর। বন্দি আমাদের বিশজনেরও বেশি সভ্যের নাম এবং ঠিকানা বলেছেন

অথচ এতদিন ধারণা করা হত, সভ্যদের পরিচয় আমি ছাড়া আর কেউ জানেন না। মারাত্মক একটা ভুল হয়ে গেছে কোথাও, যে ভুল আমাদের শোধরাতে হবে। আঙুলের ছাপও আছে বন্দির কাছে। সিন্দুকের ভেতরের খোপটাই বা আমাদের অনুসন্ধানকারীদের নজর এড়িয়ে গেল কেন, সে ব্যাপারেও ভালভাবে খোঁজ নেয়া দরকার।'

'আপনার অনুসন্ধানকারীদের দোষ দেবেন না,' বলল উইমজে। 'সিন্দুকটা তৈরিই করা হয়েছে এমনভাবে, যাতে ভেতরের খোপটা নজর এড়িয়ে যায়।'

উইমজের কথাগুলোকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে আবার বলে চলল প্রেসিডেন্ট, 'বন্দি আমাকে জানিয়েছেন, সভ্যদের নাম, ঠিকানা, আঙুলের ছাপের ফোটোগ্রাফ সব আছে ভেতরের খোপে। আমার বিশ্বাস, তিনি সত্য কথাই বলেছেন। তো, সিন্দুকের কমবিনেশনের বিনিময়ে তিনি চান দ্রুত, শান্তিপূর্ণ মৃত্যু। আমার মনে হয়, তাঁর এই প্রস্তাব বিবেচনা করা উচিত। আপনাদের কী মত?'

'ওই কমবিনেশন আমরা জানি,' বলল বাইশ নম্বর।

'মূর্খ! বন্দি আমাকে বলেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, তিনি লর্ড পিটার উইমজে। আপনার কি ধারণা, তিনি এতই বোকা যে আসার আগে কমবিনেশনটাও পরিবর্তন করেননি? তো, আজ তিনি যদি না ফেরেন আর পুলিশ ঢোকে তাঁর বাড়িতে–'

'আমি বলি কী,' ভেসে এল এক মহিলার মিষ্টি কণ্ঠ, 'প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাঁর কমবিনেশনটা ব্যবহার করা হোক। তাড়াতাড়ি। সময় বয়ে যাচ্ছে।'

সম্মতির গুঞ্জন উঠল টেবিলের চারপাশ থেকে। 'শুনলেন তো,' প্রেসিডেন্ট তাকাল উইমজের দিকে। 'কমবিনেশন এবং ভেতরের খোপের গোপন কাগজপাতির বিনিময়ে সংগঠন আপনাকে দ্রুত, শান্তিপূর্ণ মৃত্যুর সুযোগ দিচ্ছে।'

'আপনিও কথা দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ধন্যবাদ। আমার মা-বোন?'

'আপনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। যদি এ নিশ্চয়তা দেন যে, আমাদের সংগঠনের পক্ষে ক্ষতিকর কিছু আপনার মা-বোন জানেন না, স্পর্শও করা হবে না তাঁদের।'

'ধন্যবাদ, স্যর। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, তারা কিছুই জানে না। মহিলাদের এমন ভয়ঙ্কর তথ্য দেয়ার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না-বিশেষ করে প্রিয়জনদের।'

'বেশ। তা হলে আপনারা সবাই রাজি?'

আবার উঠল সম্মতির গুঞ্জন।

'কাগজপাতিগুলো আপনাদের হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপারে আমার আর কোনওরকম আপত্তি নেই। সিন্দুকের কম্বিনেশন হলো-আনরিলায়াবিলিটি (UNRELIABILITY)।'

'ভেতরের খোপ?'

'পুলিশ এলে ওটা নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হতে পারে ভেবে খোপটা খুলেই রেখে এসেছি।'

'গুড! আপনার বাড়িতে আমাদের অনুসন্ধানকারী ঢোকার পর যদি পুলিশ এসে উপস্থিত হয়-'

'এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই, তাই না?'

'ঝুঁকিটা মারাত্মক,' চিন্তিত স্বরে বলল প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু এ ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। বন্দিকে সেলারে নিয়ে যান। ৫ নম্বর ট্রিটমেন্টের যন্ত্রপাতিগুলো দেখে আনন্দ লাভ করতে পারবেন উনি। ইতিমধ্যে বারো আর ছেচল্লিশ নম্বর-'

'না, না!'

তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ পেল সভ্যদের মধ্যে।

'না,' বলল মিষ্টভাষী এক লম্বা লোক। 'না-কোনও সভ্যকে এই কাজে পাঠানো কি ঠিক হবে? আজ রাতে আমরা এক বোকা

আর এক বিশ্বাসঘাতকের দেখা পেয়েছি। বারো আর ছেচল্লিশ নম্বর যে বোকা আর বিশ্বাসঘাতক নয়, তা আমরা কীভাবে বুঝব?'

হিংস্র ভঙ্গিতে বারো আর ছেচল্লিশ ঘুরল বক্তার দিকে। হঠাৎ বিরক্তি ঝরে পড়ল এক মহিলার কণ্ঠে। 'ঠিকই বলেছেন উনি। আমাদের নিরাপত্তা কোথায়? সম্পূর্ণ অপরিচিত কারও মুখে আমরা নিজের নাম-ঠিকানা শুনতে চাই না। যথেষ্ট হয়েছে, এ সংগঠনে আর নয়। এরা আমাদের সবাইকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারে।'

'আমিও একমত,' বলল আরেক সভ্য। 'এখানকার কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, কাউকে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল প্রেসিডেন্ট। 'তা হলে, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আপনাদের কী পরামর্শ?'

সামান্য বিরতির পর আবার কথা বলে উঠল সেই মহিলা:

'প্রেসিডেন্টের নিজেরই যাওয়া উচিত। একমাত্র উনিই আমাদের সবার নাম-ঠিকানা জানেন, সুতরাং বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্ন উঠবে না। তা ছাড়া, সব ঝুঁকি আমরা নেব, আর উনি শুধু বসে বসে টাকা গুনবেন, তা-ই বা কেন হবে?'

সায় দেয়ার ভঙ্গি দেখা গেল সভ্যদের মাঝে।

'আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি,' বলল সোনার বোতাম পরা এক শক্ত-সমর্থ লোক।

চারপাশে একবার নজর বোলাল প্রেসিডেন্ট। 'আপনারা কি তা হলে সত্যিই চান যে আমিই যাই?'

পঁয়তাল্লিশটা হাত ওপরে উঠল, শুধু দুই নম্বর গম্ভীর হয়ে বসে রইল চুপচাপ।

'রায় তা হলে সর্বসম্মত?' জানতে চাইল প্রেসিডেন্ট।

মাথা তুলল দুই নম্বর। 'যেয়ো না,' বলল চাপা স্বরে।

'শুনলেন তো, এই মহিলা আমাকে যেতে নিষেধ করছে।'

'দুই নম্বরের কথায় কোনও যুক্তি নেই,' বলল মিষ্টভাষী লম্বা

লোকটা। 'তা ছাড়া, ম্যাডামের মত সুবিধেজনক অবস্থানে থাকলে আমাদের মহিলারাও আমাদের নিষেধ করত।'

'এটা একটা গণতান্ত্রিক সংগঠন!' চেঁচিয়ে উঠল আরেকজন। 'সুবিধেপ্রাপ্ত শ্রেণীতে আমরা বিশ্বাস করি না।'

'বেশ,' বলল প্রেসিডেন্ট। 'দুই নম্বর, সভ্যদের মত তোমার বিপক্ষে। মতের স্বপক্ষে কোনও যুক্তি আছে তোমার?'

'এক শ'টা। প্রেসিডেন্ট শুধু আমাদের প্রধানই নয়, সংগঠনের প্রাণ। তাঁর কিছু হলে আমাদের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা একবার ভেবে দেখেছেন? মারাত্মক ভুল করতে যাচ্ছেন আপনারা। এ যাবত যা কিছু ঘটেছে, তার জন্যে আমাদের অসাবধানতাই দায়ী। ভুল শুধরে দেয়ার জন্যে যদি প্রেসিডেন্ট কাছে না থাকে, পাঁচ মিনিটও কি আপনারা নিরাপদ থাকতে পারবেন?'

'তাঁর কথায় যুক্তি আছে,' বলল এক সভ্য।

'পরামর্শ দিচ্ছি বলে কেউ কিছু মনে করবেন না,' উপহাসের সুরে বলল উইমজে। 'এত যুক্তি দেখানোর চেয়ে দুই নম্বর নিজে গেলেই তো পারেন।'

'তার যাওয়া চলবে না,' দুই নম্বর কোনও জবাব দেয়ার আগেই বলে উঠল প্রেসিডেন্ট। 'সভ্যদের সবার যখন ইচ্ছে, আমিই যাচ্ছি। বাড়ির চাবি দিন।'

এক সভ্য চাবি নিয়ে এল উইমজের পকেট থেকে।

'প্রহরা নেই বাড়িতে?' প্রেসিডেন্ট তাকাল উইমজের দিকে।

'না।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

প্রেসিডেন্ট এগোল দরজার দিকে। 'দু'ঘণ্টার মধ্যে যদি আমি না ফিরি, নিরাপত্তার পদক্ষেপ নেবেন আপনারা, আর যা খুশি করবেন বন্দিকে নিয়ে। আমার অবর্তমানে নির্দেশ দেবে দুই

নম্বর।'

বেরিয়ে গেল প্রেসিডেন্ট। নিজের আসন ছেড়ে উঠে এগিয়ে এল দুই নম্বর। 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, সাপার এখানেই শেষ। আবার নাচ শুরু করুন আপনারা।'

পাঁচ নম্বর ট্রিটমেন্টের যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে তাকিয়ে উইমজের অত্যন্ত ধীর সময় কাটছে সেলারে। গোঙাতে গোঙাতে ক্লান্ত হয়ে থেমে গেছেন জুক্স। প্রহরারত চার সভ্য মাঝে-সাঝে ফিসফিস করে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

'প্রেসিডেন্টের যাওয়ার দেড় ঘণ্টা হলো,' বলল একজন।

বক্তার দিকে একবার তাকিয়ে আবার ঘরটায় নজর বোলাতে লাগল উইমজে। অদ্ভুত সব জিনিস আছে এখানে, এগুলোর কথা সে মনে রাখতে চায়।

হঠাৎ খুলে গেল চোরা-দরজাটা। 'বন্দিকে ওপরে নিয়ে এসো!' চিৎকার করে বলল কে যেন। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল উইমজে, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

আবার সভ্যরা বসল টেবিল ঘিরে। প্রেসিডেন্টের আসনে বসা দুই নম্বরের স্থির চোখ উইমজের ওপরে নিবদ্ধ। আর সে-চোখে বাঘিনীর দৃষ্টি। কিন্তু এত শান্ত স্বরে কথা বলে উঠল দুই নম্বর, তার আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশংসা না করে উইমজে পারল না।

'দু'ঘণ্টা হলো প্রেসিডেন্ট বাইরে গেছে। বিশ্বাসঘাতক, বলুন, কী ঘটেছে তার ভাগ্যে?'

'তা আমি কীভাবে জানব?' বলল উইমজে। 'হয়তো এই সুযোগে কেটে পড়েছেন!'

প্রচণ্ড ক্রোধের একটা চাপা চিৎকার ছেড়ে চোখের পলকে ছুটে এল দুই নম্বর।

'মিথ্যুক! জানোয়ার!' আঘাত হানল মহিলা উইমজের মুখে। 'সে কখনও এ কাজ করতে পারে না। সঙ্গীদের ফেলে পালানো

তার পক্ষে সম্ভব নয়। বলুন, তাকে কোন্ ফাঁদে ফেলেছেন? বলুন–তা ছাড়া আপনাকে বলাব। আপনাদের মধ্যে দু'জন যান তো–লোহা নিয়ে আসুন। বন্দিকে আমি কথা বলাব!'

'আমি শুধু একটা ধারণা করতে পারি, ম্যাডাম,' জবাব দিল উইমজে। 'আর লোহার ছ্যাঁকা দিলে সে ধারণা বাড়বে না। শান্ত হন, বলছি আমার ধারণার কথা। ভয় হচ্ছে, সিন্দুকে ঢোকার পর ভেতরের খোপের কাগজপাতিগুলো দেখতে-দেখতে অসাবধানতাবশত প্রেসিডেন্ট বন্ধ করে ফেলেছেন দরজাটা। সেক্ষেত্রে–' অতি কষ্টে প্রায় অসাড় কাঁধটা সামান্য ঝাঁকাল উইমজে, তারপর শান্ত চোখ মেলে ধরল দুই নম্বরের ওপর।

'কী বলতে চান আপনি?'

সভ্যদের ওপর একটা দৃষ্টি বোলাল উইমজে। 'মনে হয়, গোড়া থেকে না ব্যাখ্যা করলে সিন্দুকের মেকানিজমটা আপনারা বুঝতে পারবেন না। সিন্দুকটা চমৎকার। আইডিয়াটা আমার। তাই বলে ভাববেন না, সিন্দুকের যন্ত্রপাতিগুলো কাজ করবে কীভাবে, সেসবও আমার আবিষ্কার–ওটা বৈজ্ঞানিকদের ব্যাপার। আমি শুধু তাঁদের আইডিয়াটা দিয়েছিলাম।

'যে কমবিনেশন আমি আপনাদের দিয়েছি, তাতে কোনও খুঁত নেই। তালাটা বান অ্যাণ্ড ফিসেটের তৈরি–সেট করতে হবে যে-কোনও তেরো বর্ণের শব্দে। বাইরের দরজাটা খোলে খুব সহজে, ঢুকলেই আপনি পাবেন সাধারণ একটা স্ট্রং-রুম। ওখানে আমি রাখি টাকা-পয়সা এবং নানারকম টুকিটাকি জিনিস। কিন্তু ভেতরের খোপে রয়েছে দুটো দরজা, যেগুলো খোলার কৌশল সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুই দরজার ওপরেরটা দেয়ালের সঙ্গে একই সমতলে এমনভাবে বসানো, দেখলে যে কেউ ভাববে, ওটাই বুঝি সিন্দুকের পেছন দিক। আমি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি, ভেতরের খোপের দুটো দরজাই ছিল হাট করে খোলা।

'আপনি কী ভেবেছেন,' বাঁকা হাসি দুই নম্বরের কণ্ঠে,

'আমাদের প্রেসিডেন্ট পা দেবে এত সহজ একটা ফাঁদে? অনায়াসে চলে যাবে সে ভেতরের খোপে।'

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই, ম্যাডাম। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ভেতরের খোপের দ্বিতীয় দরজাটা নিয়ে। প্রথম দরজাটার ঠিক পেছনে, দেয়ালের গায়ে ওটা এমনভাবে বসানো, অজানা থাকলে যার অস্তিত্ব কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। তো, ওই দরজাটাও যেহেতু খোলা ছিল, আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট গটগট করে গিয়ে ঢুকেছেন ভেতরের খোপে। আশা করি ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি সবাইকে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলে যান। তাড়াতাড়ি শেষ করুন গল্প।'

বো করে আগের চেয়ে স্বচ্ছন্দে শুরু করল উইমজে:

'এই সংগঠনের সভ্যদের নাম, ঠিকানা, কার্যকলাপ আমি লিখে রেখেছি বিরাট এক খাতায়—সত্যি বলতে কি খাতাটা নীচতলায় রক্ষিত আপনাদের প্রেসিডেন্টের লেজারের চেয়েও বড়। ম্যাডাম, এ কথাটা আপনার মনে নিশ্চয় দোলা দিয়েছে যে, লেজারটা নিরাপদ স্থানে রাখা উচিত। কৌতূহলী পুলিশ অফিসারদের তরফ থেকেই শুধু নয়, এই লেজার সংগঠনের কোনও জুনিয়র সভ্যের হাতে পড়লেও আপনাদের সবার নিরাপত্তার পক্ষে তা হতে পারে হুমকির বিষয়।'

'ওটা নিরাপদ স্থানেই আছে,' দ্রুত বলল দুই নম্বর। 'গল্প শেষ করুন।'

'ধন্যবাদ। ভেতরের খোপের শেষ মাথায় রয়েছে ইস্পাতের একটা আলমারি, আর তার ভেতরে প্রকাণ্ড সেই খাতাটা। এক মিনিট। ভেতরের খোপটার বর্ণনা আমি আপনাদের দিইনি। ওটা ছয় ফুট উঁচু, তিন ফুট চওড়া। একজন লোক ওখানে খুব আরামে দাঁড়াতে পারে, অবশ্য সে যদি খুব বেশি লম্বা না হয়। আমি পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি, ফলে অনায়াসে চলাফেরা করতে পারি ওখানে। প্রেসিডেন্ট আমার চেয়ে বেশি লম্বা, তাঁর পায়ে একটু

খিল ধরতে পারে। তবে বেশি অসুবিধে হলে উবু হবার মত যথেষ্ট জায়গা ওখানে আছে। যাই হোক, টের পেয়েছেন কি না জানি না, আমাকে কিন্তু আপনারা বেঁধেছেন খুব কষে।'

'আরও কষে বাঁধব, যাতে হাড়ে-হাড়ে জোড়া লেগে যায়। সেই সাথে চালাব চাবুক। কৌশলটা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আপনারা, বন্দি সময় নষ্ট করতে চাইছেন।'

'চাবুক চালাবেন? কথা বলাই ভুল হয়েছে দেখছি,' বলল উইমজে। 'শান্ত হন, ম্যাডাম। রাজা যখন মাত হওয়ার মুখে, তাড়াতাড়ি চাল দেয়া ভাল দাবাড়ুর লক্ষণ নয়।'

'শেষ হয়েছে আপনার গল্প?' পা ঠুকল মহিলা।

'কোথায় যেন ছেড়েছিলাম? ও হ্যাঁ, ভেতরের খোপ। ওখানে আলো-বাতাস যাবার কোনও রাস্তা নেই। আচ্ছা, আমি কি বলেছিলাম, খাতা রয়েছে ইস্পাতের একটা আলমারিতে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। ইস্পাতের আলমারিটা দাঁড়িয়ে আছে লুকোনো একটা স্প্রিং-এর ওপর। ভারী খাতাটা তুলে নেয়ার সাথে সাথে সামান্য আলগা হয়ে যাবে স্প্রিং! খুব ধীরে, দৃষ্টির প্রায় অগোচরে, ইঞ্চিখানেক ওপরে উঠে যাবে আলমারিটা। আর যেই উঠবে, চোখের পলকে ঘটবে এক বৈদ্যুতিক যোগাযোগ। দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করুন, ম্যাডাম। গটগট করে ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট, চোখে পড়তেই তুলে নিলেন খাতাটা। এই খাতাটাই যে আসল খাতা, তা বোঝার জন্যে উল্টে গেলেন তিনি পাতার পর পাতা। পড়লেন। তারপর খুঁজতে লাগলেন আঙুলের ছাপ। ওদিকে স্প্রিং আলগা হতেই—কল্পনা করতে পারছেন নিশ্চয়, তাই না? উঠে দাঁড়াল আলমারিটা, ঘটে গেল বৈদ্যুতিক যোগাযোগ, তৎক্ষণাৎ চিতাবাঘের মত নিঃশব্দে লাফ দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। তুলনাটা বোধহয় একটু নীরস হলো, তবে যথাযথ, ঠিক না?'

'ঈশ্বর! হায় ঈশ্বর!' মুখের কাছে এমনভাবে হাত উঠে গেল মহিলার, যেন মুখোশটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। 'আপনি–আপনি একটা শয়তান! কী বললে ভেতরের দরজাটা খোলে? তাড়াতাড়ি বলুন, নইলে আপনার কলজে ফেড়ে বের করে আনব শব্দটা!'

'শব্দটা মনে রাখা মোটেই কঠিন নয়, ম্যাডাম–যদিও আধুনিক মানুষ সেটা ভুলতে বসেছে। যখন শিশু ছিলেন, শুনেছেন কারও মুখে "আলীবাবা আর চল্লিশ চোর"-এর গল্প? সিন্দুকটা তৈরির সময় হঠাৎ করে কেন যেন আমার মনে ভিড় জমিয়েছিল শৈশবের হাজারও স্মৃতি। ভেতরের ওই দরজা খুলতে গেলে বলতে হবে–চিচিং ফাঁক।'

'আপনার ওই শয়তানী ফাঁদে একজন মানুষ বড়জোর কতক্ষণ বাঁচতে পারে?'

'কয়েক ঘণ্টা তিনি ওখানে বেশ আরামেই থাকতে পারবেন, যদি না অহেতুক চেঁচামেচি আর ধাক্কাধাক্কি করে অক্সিজেনটা ফুরিয়ে ফেলেন। আমার মনে হয়, এই মুহূর্তে রওনা দিলে প্রেসিডেন্টকে বহাল তবিয়তেই পাওয়া যাবে।'

'আমি নিজে যাব। বন্দিকে নিয়ে যান আপনারা, যা খুশি করুন। শুধু লক্ষ রাখবেন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত জীবনটা যেন থাকে। শয়তানটার মৃত্যু আমি স্বচক্ষে দেখতে চাই!'

'একটু দাঁড়ান,' অবিচলিত স্বরে বলল উইমজে। 'যদি যেতে চান, মনে হয়, আমাকে সঙ্গে নেয়াই ভাল।'

'কেন?'

'আমি ছাড়া ওই দরজা আর কেউ খুলতে পারবে না।'

'কিন্তু শব্দটা আপনি বলে দিয়েছেন। মিথ্যে বলেছেন?'

'না–শব্দ ঠিকই আছে। কিন্তু দরজাটা নতুন ধরনের, একেবারে লেটেস্ট মডেল। আমি ওটার জন্যে গর্ব বোধ করি। "চিচিং ফাঁক" বললে দরজাটা খোলে ঠিকই–কিন্তু শুধুমাত্র আমার

স্বরে।'

'আপনার স্বরে? কী বলতে চান আপনি? গলা টিপে ওই স্বর আমি বের করে নেব।'

'উঁহুঁ, ওভাবে গলা টিপে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না। সিন্দুকের যন্ত্রপাতিগুলো স্বরের ব্যাপারে বেজায় খুঁতখুঁতে। একবার সর্দি লেগে গলা বসে যাওয়ায় সপ্তাহখানেক আমাকে ওটা খুলতে হয়েছে কর্কশ স্বরে ফিসফিস করে।'

পাশে দাঁড়ানো একজন খাটো, গাট্টাগোট্টা লোকের দিকে ঘুরল দুই নম্বর।

'এটা কি সত্যি? সম্ভব?'

'জী, ম্যাডাম, সম্পূর্ণ সম্ভব,' জড়সড় হয়ে জবাব দিল লোকটা। গলা শুনে মনে হয়, সে একজন উচ্চমানের কারিগর–এঞ্জিনিয়ার হওয়াও বিচিত্র নয়।

'বৈদ্যুতিক কোনও কৌশল? ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন?'

'জী, ম্যাডাম। খুদে একটা মাইক্রোফোন বসানো রয়েছে সিন্দুকটার কোথাও, যেটা স্বরকে কম্পনে রূপান্তরিত করে, আর সেই কম্পন আবার নিয়ন্ত্রণ করে ইলেকট্রিক একটা নিডল। তো, নিডলটা যেই স্বরকম্পনের নিখুঁত নকশাটা খুঁজে পায়, সম্পূর্ণ হয় সার্কিট, এবং দরজা খুলে যায়।'

'যন্ত্রপাতি দিয়ে আপনি ওটা খুলতে পারবেন না?'

'জী, ম্যাডাম। সময়সাপেক্ষ, তবে পারা যাবে। ভাঙতে হবে মেকানিজমটা। কিন্তু ওটা সম্ভবত খুব সুরক্ষিত জায়গায় আছে।'

'সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন,' বলল উইমজে।

মাথায় হাত দিল মহিলা

'আমরা বোধহয় ফেঁসে গেছি,' বলল এঞ্জিনিয়ার।

'না–দাঁড়ান! কারও না কারও নিশ্চয় জানা আছে–যে কারিগর সিন্দুকটা তৈরি করেছে, সে কোথায় থাকে?'

'জার্মানিতে।'

'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়–হ্যাঁ–একমাত্র তাঁর স্বরেই সিন্দুকটা খোলে, তাই না? সুতরাং তাঁর স্বর রেকর্ড করে নিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। যান, জলদি ব্যবস্থা করুন।'

'সম্ভব নয়, ম্যাডাম। রোববারের ভোরে–এই রাত সাড়ে তিনটেয় কোথায় পাবেন আপনি টেপরেকর্ডার? আর পাওয়া যদি যায়ও, প্রেসিডেন্ট ততক্ষণে–'

নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল ঘরে। দূর থেকে ভেসে এল মোটরের হর্নের শব্দ। দিন জাগছে।

'বন্দিকে আমাদের যেতে দিতে হবে,' বলল মহিলা অবশেষে। 'বাঁধন খুলে দিন। বন্দিকে আপনারা সবাই ছেড়ে দেবেন। নিশ্চয়, দেবেন না?' মহিলা এবার ঘুরল উইমজের দিকে। 'শয়তান আপনি নিঃসন্দেহে কিন্তু নিশ্চয় এত বড় শয়তান নন যে, আপনাকে মুক্ত করে দেয়া সত্ত্বেও গিয়ে প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করবেন না।'

'বন্দিকে ছেড়ে দেব? অসম্ভব!' বলল একজন। 'আপনি বুঝতে পারছেন না, এখান থেকে বেরিয়েই উনি সোজা যাবেন পুলিশের কাছে। প্রেসিডেন্টের তো যা হবার হয়েছে! হয়েই গেছে, এখন আমাদের সবার উচিত হবে সময় থাকতে গা ঢাকা দেয়া। বন্দিকে আপনারা নিয়ে গিয়ে ফেলে আসুন সেলারে, আমি ততক্ষণে লেজারগুলো ধ্বংস করি। আমার ওপর যদি আপনাদের সন্দেহ থাকে, ফিরে এসে ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখবেন। তিরিশ নম্বর, আপনি জানেন সুইচ কোথায় আছে। পনেরো মিনিট সময় বরাদ্দ করুন আমাদের চলে যাবার জন্যে, তারপর উড়িয়ে দিন বাড়িটা।'

'না! যাবেন না আপনারা–নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে তাকে আপনারা ঠেলে দিতে পারেন না। সে আপনাদের প্রেসিডেন্ট, আপনাদের নেতা, আমার না, এটা আমি ঘটতে দিতে পারি না। বন্দিকে মুক্ত করে দিন। আসুন, তাঁর বাঁধন খোলায় আপনাদের একজন

সাহায্য করুন আমাকে।'

'না, ওসব চলবে না,' ঝট করে তার একটা কব্জি ধরে ফেলল এক সভ্য। নিজেকে ছাড়ানোর জন্যে ধস্তাধস্তি করতে লাগল মহিলা।

'মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবুন সবাই,' অনেকক্ষণ পর আবার কথা বলল মিষ্টভাষী। 'ভোর হয়ে আসছে। আর দু'এক ঘণ্টা পরেই আলো ফুটবে। যে-কোনও মুহূর্তে এখন হাজির হতে পারে পুলিশ।'

'পুলিশ!' প্রচণ্ড শক্তি খাটিয়ে যেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল দুই নম্বর। 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। একজন মানুষের জন্যে সবার নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ করা চলবে না। চলুন, শয়তানটাকে সেলারে ফেলে রেখে সময় থাকতে থাকতেই কেটে পড়ি আমরা।'

'আরেক বন্দি?'

'উনি একজন বোকা, আমাদের জন্যে কোনও হুমকির কারণ নন। তা ছাড়া এমন কিছু জানেনও না। সুতরাং ওনাকে এখন ছেড়ে দেয়াই ভাল।'

হাত-পা বাঁধা [illegible] সেলারে পড়ে থাকতে থাকতে মাথায় অনেক চিন্তা ভিড় করে [illegible] উইমজের। নানা দিক বিবেচনা করেই সে ঝুঁকিটা নিয়েছিল। এক নম্বরের জীবনের বিনিময়েও এরা তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হলো না, ব্যাপারটা প্রথমটায় আশ্চর্য মনে হয়েছিল তার কাছে। কিন্তু এখন আর হচ্ছে না। সমস্ত হদিস জানা একজন মারাত্মক সাক্ষীকে কেউ ছেড়ে দিতে পারে না।

দু'জন লোক এসে তার বাঁধনটা পরীক্ষা করে, আলো নিবিয়ে পা বাড়াল যাবার জন্যে।

'হাই, কমরেড!' বলল উইমজে। 'অন্ধকারে একা থাকতে ভাল লাগবে না। আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে যান।'

'বেশিক্ষণ অন্ধকারে থাকতে হবে না, বন্ধু, প্রচুর আলো

পাবেন,’ হেসে উঠল একজন হো হো করে।

তার সঙ্গীও যোগ দিল হাসিতে। ওরা চলে যাবার পর আবার ভাবতে লাগল উইমজে। তা হলে বাড়িসুদ্ধ তাকে উড়িয়ে দেয়ার প্ল্যান করছে সবাই। সেক্ষেত্রে এরা গিয়ে উদ্ধার করার আগেই মারা যাবে প্রেসিডেন্ট। ধাড়িটাকে আইনের হাতে তুলে দেয়া গেল না বলেই উদ্বেগ অনুভব করল উইমজে। ছ'বছর ধরে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড কুখ্যাত এই দলটাকে ভাঙার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ মাথার ওপর থেকে ভেসে এল ক্ষীণ পদশব্দ। সচকিত হয়ে উঠল উইমজে।

ক্যাঁচ করে শব্দ তুলে খুলে গেল চোরা-দরজা। সন্তর্পণে কেউ একজন নেমে আসছে সেলারে।

‘চুপ!’ একটা কণ্ঠ ফিসফিস করে উঠল কানের কাছে। নরম একজোড়া হাত হাতড়াতে লাগল তার সারা শরীর। কব্জির কাছে ইস্পাতের শীতল স্পর্শ অনুভব করল উইমজে। পরমুহূর্তেই ঢিলে হয়ে গেল হাত-পায়ের বাঁধন। ক্লিক করে খুলে গেল হাতকড়া।

‘তাড়াতাড়ি! বাড়িতে মাইন বসানো হয়েছে! অলঙ্কার ফেলে এসেছি বলে ফিরে এসেছি আমি। কথা অবশ্য সত্যি। ইচ্ছে করে ছেড়ে গিয়েছিলাম। তাকে বাঁচাতেই হবে। তাড়াতাড়ি! এ কাজ একমাত্র আপনার দ্বারাই সম্ভব।’

প্রায় অসাড় হাত-পা নিয়ে টলতে টলতে এগোল উইমজে। ওপরে উঠেই শাটার খুলে দিল মহিলা।

‘যান! মুক্ত করুন ওকে! কথা দিচ্ছেন?’

‘হ্যাঁ। সাবধান, ম্যাডাম, বাড়ির চারপাশ ঘিরে ফেলা হয়েছে। সিন্দুকের ভেতরের খোপের দরজাটা বন্ধ হতেই ওটা একটা সঙ্কেত পাঠিয়েছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে।’

‘যান! সময় ফুরিয়ে আসছে!’

‘আপনিও আসুন!’

মহিলার একটা হাত চেপে ধরে উইমজে ছুটল বাগানের ভেতর দিয়ে। হঠাৎ জ্বলে উঠল একটা টর্চ।

'পার্কার?' চেঁচিয়ে উঠল উইমজে। 'তোমার সাঙ্গোপাঙ্গদের এখনই সরে যেতে বলো। খুব শিগ্‌গির! দু'এক মিনিটের মধ্যেই উড়ে যাবে বাড়িটা।'

সারা বাগান মুখরিত হয়ে উঠল দৌড়াদৌড়ি আর চেঁচামেচিতে। গাঢ় অন্ধকারে একটা দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেল উইমজে। তবু হাঁচড়েপাঁচড়ে কোনওমতে উঠে পড়ল ওপরে, টেনে তুলল মহিলাকে। দেয়ালের ওপাশে নেমেই ঝেড়ে দৌড় দিল আবার। কিন্তু খানিকটা যেতেই একটা পাথরে পা লেগে পড়ে গেল হুড়মুড় করে, মহিলাও পড়ল পাশে। পরক্ষণেই তীব্র আলোয় ঝলমল করে উঠল চারদিক, কানে তালা লেগে গেল বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে।

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল উইমজে। ক্ষীণ একটা গোঙানি শুনে টের পেল, সঙ্গিনীটি এখনও বেঁচেই আছে। হঠাৎ একটা লণ্ঠনের আলো এসে পড়ল তার ওপর।

'আপনারা ঠিকঠাক আছেন তো?' জানতে চাইল একটা উৎফুল্ল স্বর।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল উইমজে। 'শুধু মাথাটা একটু ঘুরছে। মহিলা নিরাপদ? হুঁ–একটা হাত ভেঙে গেছে, আর সব ঠিক। তোমাদের খবর কী?'

'জনা ছয়েক ছাতু হয়ে গেছে বোমার আঘাতে, বাদবাকিদের খাঁচায় পুরেছি। গত দু'বছর কিন্তু আপনি মারা গিয়েছেন ভেবে খুব কষ্ট পেয়েছি আমরা। আমি তো শোক প্রকাশ করার জন্যে কালো এক টুকরো কাপড় কিনেছিলাম। বাণ্টার ছাড়া আর কেউ জানত?'

'আমার মা আর বোন। একটা ব্যাপার নিয়ে খুব চিন্তিত

আছি। আইনজ্ঞদের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে, আমিই পিটার উইমজে। কে ওটা, সাগ নাকি?'

'ইয়েস, মাই লর্ড,' হাসলেন ইন্সপেক্টর সাগ। 'আগেও কাণ্ড করেছেন আপনি, তবে এবার যা দেখালেন–সত্যিই তুলনাহীন। সবাই আপনার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে চায়, স্যর।'

'কিন্তু আমি সবচেয়ে আগে শেভ আর গোসল করতে চাই।'

'প্রেসিডেন্ট নিরাপদ?'

মহিলার গোঙানিতে সচকিত হয়ে উঠল উইমজে।

'আরে আমি তো ভুলেই গেছি!' চিৎকার ছাড়ল সে। 'একটা কার আনো, জলদি! পালের গোদাটা এখন আমার সিন্দুকের ভেতরে বন্দি। দেরি করলে ওকে আর বাঁচানো যাবে না। অবশ্য রেহাই পাবার কোনও সম্ভাবনা তার নেই। মরিসন কেস, হোপ উইলমিংটন কেস, আরও শত শত কেসের মূলে রয়েছে ওই লোক। তবু মহিলাকে কথা দিয়েছি, প্রাণে বাঁচাব তাকে।'

ল্যামবেথের বাড়িটার সামনে যখন কার এসে থামল, পুবাকাশে তখন ফুটেছে ভোরের ধূসর আলো। মহিলাকে গাড়ি থেকে বের করে আনল উইমজে। মুখোশটা সরে গেছে। হাবভাব বেপরোয়া, কিন্তু আতঙ্ক আর যন্ত্রণায় কাগজের মত সাদা হয়ে আছে মুখটা।

'রাশিয়ান?' ফিসফিস করে উঠলেন পার্কার।

'ওরকমই কিছু একটা হবে। সদর দরজা তো বন্ধ। পার্কার, তুমি জানালাটা একটু টপকাবে?'

জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সদর দরজা খুলে দিলেন পার্কার। সবাইকে পথ দেখিয়ে উইমজে নিয়ে এল সিন্দুকের কাছে। বাইরের এবং ভেতরের খোপের প্রথম দরজাটা হাঁ হয়ে আছে, দ্বিতীয় দরজা সবার মুখোমুখি সবুজ একটা দেয়ালের মত।

'বেশি ধাক্কাধাক্কির ফলে মেকানিজমটা গোলমাল না হয়ে গেলেই বাঁচি,' বিড়বিড় করল উইমজে আপন মনে।

বন্ধ দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল সে। 'চিচিং ফাঁক!'

স্যাঁৎ করে সবুজ দরজাটা ঢুকে গেল দেয়ালের গায়ে। এক লাফে ভেতরে ঢুকে প্রেসিডেন্টকে বুকে জড়িয়ে ধরল মহিলা। অজ্ঞান হয়ে গেছে বেচারা। কাপড় ছিঁড়ে ফালাফালা, রক্ত ঝরছে দুই ক্ষতবিক্ষত হাত থেকে।

'ভালই আছেন উনি,' বলল উইমজে। 'ভালই আছেন। আশা করা যায়, দু'-একদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে দাঁড়াতে পারবেন কাঠগড়ায়।'

মূলঃ ডরোথি এল. সেয়ার্স
রূপান্তরঃ খসরু চৌধুরী

ছুরি

পলটনের দ্রুত পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম সিঁড়িতে, পরক্ষণে আমার সহকর্মীর দরজায় শোনা গেল তার কণ্ঠস্বর, 'নীচে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন, স্যর। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। বললেন, খুব জরুরি দরকার। স্যর, ভদ্রলোক মনে হলো অদ্ভুত ভাবে কাঁপছেন।'

আমাদের সহকারি পলটন বিশদ ভাবে ব্যাপারটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় আরও একটা দ্রুততর পদশব্দ কানে এল। একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর থর্নডাইককে উদ্দেশ্য করে বলল, 'একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে, স্যর। আমি এসেছি আপনার সাহায্য চাইতে। আপনি কি এখনই আমার সঙ্গে যেতে পারবেন?'

'তা পারব,' থর্নডাইক বলল। 'লোকটা কি মারা গেছে?'

'একেবারে মৃত। ঠাণ্ডা, শক্ত হয়ে গেছে। পুলিশের ধারণা—'

'আপনি যে আমার কাছে এসেছেন, সেটা কি পুলিশ জানে?'

'হ্যাঁ। আপনি না যাওয়া পর্যন্ত কিছুই করা হবে না।'

'ঠিক আছে। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

'আপনি সিঁড়ির নীচে অপেক্ষা করুন, স্যর; আমি ডাক্তারকে একটু সাহায্য করব তৈরি হতে,' কথাটা বলে পলটন লোকটিকে বাইরের বসার ঘরে নিয়ে গেল, একটু পরে তাকে লুকিয়ে প্রাতরাশের ট্রেটা নিয়ে উঠে এল ওপরে।

থর্নডাইক আর আমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। নামার সময় কয়েকটা দরকারি জিনিস নিতে ভুল হলো না

থর্নডাইকের।

আমরা বসার ঘরে ঢুকতেই আগন্তুক অস্থির পায়চারি থামিয়ে টুপিটা তুলে নিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, 'আপনারা তৈরি তো? আমার গাড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।'

বেশ বড়সড় ব্রুহাম গাড়িটায় তিনজনের জায়গা হয়ে গেল। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করা মাত্র কোচোয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষাল। দুলকি চালে ছুটে চলল গাড়ি।

লোকটা উত্তেজিত স্বরে বলল, 'যেতে যেতে ঘটনাটা আপনাদের জানিয়ে রাখি। আমার নাম কারটিস, হেনরি কারটিস। এই আমার কার্ড,' একটা চারকোনা কাগজ থর্নডাইকের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'আমি যখন লাশটা আবিষ্কার করি, তখন আমার সলিসিটর মিস্টার মার্চমণ্ট আমার সঙ্গে ছিলেন। আপনি না যাওয়া পর্যন্ত যাতে কোনও কিছুতে হাত না দেয়া হয়, সেটা খেয়াল রাখতে তিনি সেখানে রয়ে গেছেন।'

থর্নডাইক বলল, 'তিনি বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছেন। এবার বলুন, ঠিক কী ঘটেছিল।'

'বলছি নিহত লোকটা আমার শ্যালক আলফ্রেড হার্টরিজ। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, মানুষটা সে ভাল ছিল না। একজন মৃত মানুষ সম্পর্কে এভাবে বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু যা সত্য, তা তো বলতেই হবে।'

'নিঃসন্দেহে।'

'তাকে অনেক অপ্রীতিকর চিঠিপত্র লিখতে হয়েছে আমাকে—মার্চমণ্ট আপনাকে সব কথাই বলবেন। গতকালই চিঠি লিখে হার্টরিজকে জানিয়েছিলাম যে, কয়েকটা ব্যাপারে কথাবার্তা পাকা করতে তার সঙ্গে দেখা করব। দুপুরের আগেই যেহেতু আমাকে শহর ছাড়তে হবে, তাই তাকে সময় দিয়েছিলাম—সকাল আটটা। সে-ও চিঠি লিখে জানিয়েছিল, ওই সময় সে দেখা করতে পারবে। মিস্টার মার্চমণ্ট আমার সঙ্গে যেতে রাজি হলেন।

সেইমত আজ সকাল ঠিক আটটায় আমরা দু'জন তার চেম্বারে গিয়ে হাজির হলাম। কয়েকবার ঘণ্টা বাজালাম, সজোরে ধাক্কা দিলাম দরজায়, কিন্তু কোনও সাড়া পেলাম না। অগত্যা নীচে গিয়ে হল-পোর্টারের সঙ্গে কথা বললাম। লোকটি উঠন থেকে লক্ষ করল, হার্টরিজের বসার ঘরের বাতিগুলো জ্বলছে। নাইটগার্ড তাকে বলল যে, সেগুলো নাকি সারা রাতই জ্বলেছে। একটা খারাপ কিছু সন্দেহ করে সে-ও আমাদের সঙ্গে ওপরে উঠে এল, ঘণ্টা বাজাল, দরজা ধাক্কাল। ভেতরে জীবনের কোনও সাড়া না পেয়ে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো সে। কারণ, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। পোর্টার গিয়ে একজন কনস্টেবলকে নিয়ে এল। তার সঙ্গে পরামর্শ করে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকা স্থির হলো। একটা শাবল নিয়ে এল পোর্টার। সমবেত চেষ্টায় ভেঙে ফেলা হলো দরজাটা। আমরা ভেতরে ঢুকে পড়লাম, আর—ঈশ্বর! সেকী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! আমার শ্যালকটি বসার ঘরের মেঝেতে মরে পড়ে আছে! ছুরি মেরে হত্যা করা হয়েছে তাকে। পিঠের ওপর দিয়ে বেরিয়ে আছে ছুরি।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় গাড়িটা ওয়েস্টমিনস্টার ও ভিক্টোরিয়ার মাঝামাঝি একটা নির্জন গলির মধ্যে ঢুকে এক সারি নতুন উঁচু লাল বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

পোর্টার গোছের এক লোক ছুটে এসে খুলে দিল ফটক। সে-ও উত্তেজিত।

মূল ফটকের বিপরীত দিকে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম আমরা।

কারটিস বলল, 'আমার শ্যালকের চেম্বার তিনতলায়।'

পোর্টারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা লিফটে ঢুকলাম এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে উঠে এলাম তেতলায়। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে একটা আধখোলা ভাঙাচোরা দরজা পেলাম। দরজার ওপরে সাদা

হরফে লেখা: মি. হার্টরিজ।

দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল ইন্সপেক্টর বাজারের ধূর্ত মুখ। থর্নডাইককে চিনতে পেরে সে বলে উঠল, 'আপনি এসে পড়ায় খুশি হলাম, স্যর। মিস্টার মার্চমণ্ট শিকারি কুকুরের মত বসে আছেন ভেতরে; আমরা কেউ ঘরে ঢুকলেই ঘেউ-ঘেউ করে দাঁত বের করছেন।'

কথাগুলো নালিশের মত শোনালেও তার হাবভাব দেখে বুঝলাম, ইন্সপেক্টর এর মধ্যেই নিরাপদ সমুদ্রে নৌকো ভাসিয়ে দিয়েছে।

ছোট হলঘরটা পেরিয়ে বসার ঘরে ঢুকলাম আমরা। সেখানে একজন কনস্টেবল ও একজন ইন্সপেক্টরকে নিয়ে পাহারায় বসে ছিলেন মার্চমণ্ট। আমরা ঢুকতেই আস্তে করে উঠে দাঁড়াল তারা, ফিসফিস করে স্বাগত জানাল আমাদের, তারপর ঘরের অন্য প্রান্তে তাকাল।

কয়েক মিনিট আমাদের মুখে কোনও কথা সরল না। শেষ পর্যন্ত নিস্তব্ধতা ভাঙল ইন্সপেক্টর, 'ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়, যদিও কিছুদূর পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার। মৃতদেহটাই সব কথা বলে দিচ্ছে।'

কয়েক পা এগিয়ে আমরা লাশটা ভাল করে দেখলাম। একজন বয়স্ক লোক ফায়ারপ্লেসের সামনে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। দুই হাত সামনের দিকে বাড়ানো। ছুরির সরু বাঁটটা বাঁ কাঁধের নীচে বেশ কিছুটা বেরিয়ে আছে; ঠোঁটে সামান্য রক্তের দাগ ছাড়া মৃত্যুর একমাত্র লক্ষণ এটাই।

মৃতদেহের খানিকটা দূরে কার্পেটের ওপর একটা ঘড়ির চাবি পড়ে আছে। ম্যানটলপিসের ওপর রাখা ঘড়িটার দিকে তাকালাম–সামনের কাচটা খোলা।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ইন্সপেক্টর বলল, 'কি জানেন, ভদ্রলোক অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ঘড়িতে দম দিচ্ছিলেন। খুনি

চুপিচুপি তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ায়, এবং ছুরিটা বসিয়ে দেয়। চাবি ঘোরানোর শব্দে আততায়ীর পায়ের শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছিল। খুনি যে ন্যাটা, ছুরিটা পিঠের বাঁ দিকে গাঁথা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তবে এটা পরিষ্কার নয় যে, সে ভেতরে ঢুকল কেমন করে, আর বেরোলই বা কেমন করে!'

থর্নডাইক বলল, 'লাশটা আশা করি নাড়াচাড়া করা হয়নি।'

'না। পুলিশ সারযন ডক্টর এগারটনকে ডাকা হয়েছিল; তিনিই লোকটিকে মৃত ঘোষণা করেছেন। এখনই আবার আসবেন ভদ্রলোক। আপনার সঙ্গে দেখা করে শব ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করবেন।'

'তা হলে তিনি না আসা পর্যন্ত আমরা লাশটা সরাব না, শুধু মৃতদেহের তাপমাত্রা দেখব, আর ছুরির বাঁটে লেগে থাকা ধুলো পরীক্ষা করব।'

থর্নডাইক থলের ভেতর থেকে একটা লম্বা কেমিক্যাল থারমোমিটার আর একটা ধুলো ঝাড়ার ব্রাশ বের করল। থারমোমিটারটা মৃত লোকটির পোশাকের তলায় পেটের ওপর রাখল, আর ব্রাশের সাহায্যে ছুরির কালো চামড়ার হাতলে লেগে থাকা সূক্ষ্ম হলুদ গুঁড়ো সংগ্রহ করতে লাগল। ইন্সপেক্টর সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করতে লাগল হাতলটা।

থর্নডাইক হতাশ হয়ে বলে উঠল, 'আঙুলের একটা ছাপও নেই। লোকটা নির্ঘাত দস্তানা পরে ছিল।'

কথা বলতে বলতে সে ছুরির ধাতুর তৈরি খাপটা দেখাল। তাতে বিচ্ছিরি হরফে একটি মাত্র শব্দ লেখা–ত্রাদিতোর।

ইন্সপেক্টর বলল, 'ইটালিয়ান শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে–বিশ্বাসঘাতক। পোর্টারের কাছ থেকে আমি এমন কিছু তথ্য পেয়েছি, যা শব্দটার সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছে। লোকটা এল বলে, তার কাছ থেকেই কথাগুলো শুনুন আপনি।'

থর্নডাইক বলল, 'ততক্ষণে আমি দু'-একটা ছবি তুলে নিই,

আর একটা নকশা তৈরি করে ফেলি। আপনি তো বললেন, কোনও কিছুই সরানো হয়নি; জানালাগুলো কে খুলেছে?'

মার্চমণ্ট বললেন, 'জানালাগুলো আমরা খোলাই পেয়েছিলাম। আপনার নিশ্চয়ই খেয়াল আছে, কাল রাতে খুব গরম পড়েছিল।'

থর্নডাইক থলের ভেতর থেকে একটা ছোট ফোল্ডিং ক্যামেরা, একটা টেলিসকোপিক ট্রাইপড, জরিপের ফিতে, কাঠের দাঁড়িপাল্লা ও স্কেচবক্স বের করল। ক্যামেরাটা এক কোণে বসিয়ে মৃতদেহসমেত ঘরের একটা ছবি নিল। আর একটা ছবি নিল দরজার কাছে গিয়ে। আমাকে বলল, 'জারভিস, তুমি ঘড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে দম দেবার ভঙ্গিতে হাত তুলে দাঁড়াও।'

দাঁড়ালাম সেভাবে। থর্নডাইক একটা ছবি নিল, তারপর চক দিয়ে আমার পায়ের জায়গা দুটোতে দাগ টেনে দিল। এরপর ট্রাইপডটা চকের দাগের ওপর বসিয়ে ছবি তুলল দুটো। সবশেষে মৃতদেহের ছবি তুলল আবার।

ছবি তোলার পর্ব শেষ করে খুব দ্রুত স্কেচবইটায় ঘরের মেঝের একটা নকশা এঁকে ফেলল সে। তাতে ১/৪ ইঞ্চি = ১ ফুট মাপে ঘরের সমস্ত জিনিসের অবস্থানই দেখানো হলো। ইন্সপেক্টর কিছুটা অধৈর্য হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সবকিছু। নিজের ঘড়ির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আপনি দেখছি পরিশ্রম বা সময়—কোনওটাই বাঁচিয়ে কাজ করেন না।'

স্কেচটা ফাইল থেকে আলাদা করে নিয়ে থর্নডাইক জবাব দিল, 'না, তা করি না। যতরকম ভাবে সম্ভব, তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করি আমি। শেষ পর্যন্ত সেগুলো কোনও কাজে না-ও লাগতে পারে, আবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে খুবই। আগে থেকে তো কিছু বলা যায় না, তাই আমি সবরকম উপাত্ত সংগ্রহ করে রাখি। ...এই তো, ডাক্তার এগারটন এসে গেছেন।'

কুশল বিনিময়ের পর আমরা মৃতদেহ পরীক্ষার কাজে লেগে গেলাম। থারমোমিটারটা তুলে নিয়ে তাপমাত্রা দেখল থর্নডাইক,

তারপর জিনিসটা এগারটনের দিকে এগিয়ে দিল। সেদিকে একনজর তাকিয়ে ডাক্তার বলল, 'মৃত্যুটা ঘটেছে প্রায় দশ ঘণ্টা আগে। খুনটা পূর্বপরিকল্পিত ও রহস্যময়।'

থর্নডাইক বলল, 'ছুরিটা একবার ছুঁয়ে দেখো, জারভিস।'

আমি হাতলে হাত দিলাম; হাড়ের মত শক্ত মনে হলো। সবিস্ময়ে বললাম, 'এটা তো পাঁজরের ভেতর ঢুকে গেছে!'

'হ্যাঁ, অসাধারণ জোরের সঙ্গে ছুরিটা বসিয়ে দেয়া হয়েছে। দেখে মনে হয়, ভেতরে ঢোকাবার সময় ছুরির ফলাটা ঘোরানো হয়েছিল। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত মনে হচ্ছে।'

এগারটন বলল, 'অদ্ভুত তো বটেই! অবশ্য এই তথ্য আমাদের কতটা সাহায্য করবে, জানি না। লাশটা সরানোর আগে ছুরিটা কি বের করে নেব?'

'অবশ্যই, নইলে মৃতদেহ সরানোর সময় নতুন করে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। একটু অপেক্ষা করুন,' পকেট থেকে এক টুকরো দড়ি বের করল থর্নডাইক। ছুরিটা ইঞ্চি দুই টেনে তুলে ফলার সমান্তরালে ধরে রাখল দড়িটা, তারপর দড়ির এক প্রান্ত আমার হাতে দিয়ে ছুরিটা সম্পূর্ণ টেনে বের করে নিল। ফলাটা বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পোশাকের ভাঁজটা চলে গেল। 'ক্ষতটা কতখানি গভীর, তার মোটামুটি একটা মাপ নিলাম দড়ি দিয়ে। খেয়াল করুন, পোশাকের কাটাটা এখন আর ক্ষতটার সাথে মিলছে না।'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত,' বলল এগারটন। 'যদিও এ থেকে আমরা কোনওরকম সাহায্য পাব কি না, সন্দেহ।'

'দেখা যাক। আপাতত আমার কাজ হচ্ছে সূত্র জোগাড় করা।'

ঈষৎ লাল হয়ে গেল ডাক্তারের মুখ। 'আমরা যদি লাশটা শোবার ঘরে নিয়ে পরীক্ষা করি, তা হলে বোধহয় ভাল হয়।'

তা-ই করা হলো। নতুন কিছু পাওয়া গেল না। একটা চাদর

দিয়ে লাশটা ঢেকে আবার বসার ঘরে নিয়ে আসা হলো।

ইন্সপেক্টর বলল, 'আপনারা লাশটা পরীক্ষা করেছেন, নানান মাপজোক করেছেন, ছবি তুলেছেন, নকশা এঁকেছেন, কিন্তু বেশিদূর এগোতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। এখানে একটা মানুষ তাঁর নিজের ঘরে খুন হয়েছেন। ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজা মাত্র একটি, আর খুনের সময় সেটি ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। জানালাগুলো মাটি থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচুতে। পানি নিষ্কাশনের একটা পাইপও জানালার কাছাকাছি নয়। সেগুলো দেয়ালের সঙ্গে এমনভাবে আটকানো যে, একটা মাছিরও পা রাখার মত জায়গা নেই। ঝাঁঝরিগুলো সবই আধুনিক, কাজেই একটা বড় মাপের বেড়ালের পক্ষেও চিমনি বেয়ে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। অতএব প্রশ্ন হলো, খুনি কেমন করে ভেতরে ঢুকল, এবং বেরিয়ে গেল।'

'অথচ,' কথার খেই ধরলেন মার্চমণ্ট। 'ঘটনা এটাই, সে এখানে ঢুকেছিল, কিন্তু এখন নেই; বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে যাওয়াটা যেহেতু তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে, কেমন করে বেরিয়ে গেল, সেটা আবিষ্কার করাও নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।'

ইন্সপেক্টর একটু হাসল, কিছু বলল না।

থর্নডাইক বলল, 'ঘটনা মোটামুটি এরকম মনে হচ্ছে: মৃত ব্যক্তি একা ছিলেন; ঘরে দ্বিতীয় কোনও প্রাণী থাকার কোনও চিহ্ন নেই। চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে লোকটার নজরে পড়েছিল যে, ঘড়িটা বারোটা বাজার দশ মিনিট আগে বন্ধ হয়ে গেছে। বই রেখে ঘড়িতে চাবি দিতে দিতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। সেই অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।'

'একজন ন্যাটা মানুষ পেছন থেকে পা টিপে টিপে এসে তাঁকে ছুরি মারে,' যোগ করল ইন্সপেক্টর।

থর্নডাইক মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'সেরকমই তো মনে হচ্ছে। এবার পোর্টারকে ডাকা হোক। তার বক্তব্যটা একবার

শোনা যাক।'

খানিকটা ভয় নিয়ে ঘরে ঢুকল পোর্টার। থর্নডাইক তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে ফ্ল্যাটগুলোয় কে-কে এসেছিল, তুমি জানো?'

'অনেকেই তো যাওয়া-আসা করেছেন, তবে তাঁদের মধ্যে কেউ এই ফ্ল্যাটে এসেছিলেন কি না, বলতে পারব না। ন'টা নাগাদ আমি মিস কারটিসকে ঢুকতে দেখেছিলাম।'

কারটিস চমকে উঠল। 'আমার মেয়ে! আমি তো জানতাম না!'

'তিনি সাড়ে ন'টায় বেরিয়ে যান,' যোগ করল পোর্টার।

ইন্সপেক্টর কারটিসকে প্রশ্ন করল, 'আপনার মেয়ে কেন এখানে এসেছিলেন, অনুমান করতে পারেন?'

'পারি।'

'তা হলে বলবেন না,' বাধা দিলেন মার্চমণ্ট। 'কোনও প্রশ্নেরই জবাব দেবেন না।'

ইন্সপেক্টর বলল, 'আপনি যা ভাবছেন, তা নয়, মিস্টার মার্চমণ্ট। ওঁর মেয়েকে আমি সন্দেহ করছি না। তিনি ন্যাটা কি না, সে ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই।' কথাটা বলার সময় অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কারটিসের দিকে তাকাল সে। দেখলাম, আমাদের মক্কেলের মুখ হঠাৎ মরা মানুষের মত সাদা হয়ে গেল। দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে নিল ইন্সপেক্টর, যেন পরিবর্তনটা তার চোখেই পড়েনি। পোর্টারের দিকে ফিরে সে বলল, 'ওই ইটালিয়ানদের কথা আরেকবার বলো। তাদের মধ্যে কে প্রথম এখানে এসেছিল?'

'সেটা প্রায় এক হপ্তা আগের কথা,' জবাব দিল পোর্টার। 'সাধারণ চেহারার এক লোক আমার কাছে এসেছিল একটা চিঠি নিয়ে। নোংরা খামের ওপর লেখা ছিল: মিস্টার হার্টরিজ, এসকয়্যার, ব্র্যাকেনহার্স্ট ম্যানশনস। হাতের লেখাটা জঘন্য। চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে সেটা মিস্টার হার্টরিজকে দিতে বলল

সে, তারপর চলে গেল। আমি ওটা মিস্টার হার্টরিজের চিঠির বাক্সে ফেলে দিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'ঠিক তার পরের দিন এক কুৎসিত ইটালিয়ান বুড়ি—ওই যে...খাঁচাভর্তি পাখি নিয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে ভবিষ্যদ্বাণী করে বেড়ায়, তাদেরই মত এক বুড়ি মূল ফটকের বাইরে এসে আস্তানা গাড়ল। আমি তাকে পত্রপাঠ সেখান থেকে ভাগিয়ে দিলাম, কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে আবার ফিরে এল সে খাঁচা আর পাখি নিয়ে। আবার তাড়িয়ে দিলাম তাকে। যতবার তাকে তাড়াই, ততবারই সে ফিরে আসে। বুঝুন অবস্থা!

'পরদিন এল এক আইসক্রিমওয়ালা। যেসব ছেলে চিঠিপত্তর নিয়ে আসে, তারা তার খদ্দের বনে যায়। সে-ও ঘাঁটি গেড়ে বসল। তাকে উঠে যেতে বলাতে সে জানিয়ে দিল, তার ব্যবসায় বাধা দেয়া চলবে না। শুনে রাগে গা জ্বলে গেল আমার!

'তার পরদিন এসে হাজির হলো এক সঙ, সঙ্গে একটা বাঁদর। হাসি, গান আর বাজনা মিলিয়ে সে এক হৈ-হুল্লোড় কাণ্ড! যেই তাকে তাড়াতে গেলাম, অমনি বাঁদরটা ছুটে এল আমার দিকে; তা দেখে লোকটা তার হেঁড়ে গলার গান এক ধাপ চড়িয়ে দিল।'

ইন্সপেক্টর হাসল। 'সে-ই তো শেষ, তা-ই না? আচ্ছা, ইটালিয়ান লোকটা তোমাকে যে-চিঠিটা দিয়েছিল, সেটা দেখলে চিনতে পারবে?'

'পারার তো কথা।'

ইন্সপেক্টর দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এক মিনিট পরেই একটা চিঠির খাপ হাতে ঘরে ঢুকল সে। মোটা খাপটা টেবিলের ওপর রেখে একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, 'এটা ভিকটিমের বুকপকেটে ছিল। এর মধ্যে তিনটে চিঠি একসঙ্গে বাঁধা আছে,' খাপের বাঁধন খুলে একটা ময়লা খাম বের করল সে, তার ওপর আঁকাবাঁকা হরফে লেখা: মি. হার্টরিজ, এসকয়্যার।

'এই চিঠিটাই কি লোকটা তোমাকে দিয়েছিল?'

ভাল করে দেখে পোর্টার বলল, 'হ্যাঁ, এটাই।'

খামের ভেতর থেকে চিঠিটা বের করতেই ইন্সপেক্টরের দুই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। চিঠিটা থর্নডাইকের হাতে দিয়ে বলল, 'দেখুন তো, ডাক্তার, পড়তে পারেন কি না?'

থর্নডাইক গভীর মনোযোগে বেশ কিছুক্ষণ চিঠিটার দিকে তাকিয়ে রইল নিঃশব্দে, তারপর জানালার কাছে চলে গেল। পকেট থেকে লেন্স বের করে কাগজটা চোখের কাছে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল—প্রথমে একটা কম পাওয়ারের লেন্স দিয়ে, তারপর একটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কডিংটন লেন্সের সাহায্যে।

ইন্সপেক্টর বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, আপনি ওটা খালি চোখে দেখতে পাবেন—নকশাটা।'

থর্নডাইক সলিসিটরের হাতে চিঠিটা তুলে দিল।

মার্চমণ্ট চিঠিটা ভাল করে দেখলেন। আমিও। অতি সাধারণ কাগজে ঠিকানাটার মতই বাজে হস্তাক্ষরে লাল কালিতে লেখা: কাজটা করার জন্য আপনাকে ছয় দিন সময় দেয়া হলো। ওপরের চিহ্নটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কথামত কাজ না করলে কপালে কী আছে আপনার।

আনাড়ি হাতে একটা মাথার খুলি ও দুটো হাড় আঁকা কাগজের মাথায়। হাড় দুটো গুণচিহ্নের মত পরস্পরকে ছেদ করেছে।

কারটিসের হাতে চিঠিটা দিয়ে মার্চমণ্ট বললেন, 'গতকাল লেখা হার্টরিজের চিঠিটার ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ,' বলল কারটিস। পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে পড়তে লাগল সে: 'খুবই অসময় হলেও ইচ্ছে হলে তুমি এসো। তোমার ভয় দেখানো চিঠিগুলো আমার অনেক হাসির খোরাক জুগিয়েছে।'

'মিস্টার হার্টরিজ কি কোনওকালে ইটালিতে ছিলেন?' ইন্সপেক্টর শুধাল।

'হ্যাঁ,' কারটিস জবাব দিল। 'গত বছরের প্রায় পুরোটা সময় তিনি ক্যাপরিতে কাটিয়েছেন।'

'তা হলে তো সূত্রটা পেয়েই গেলাম। এই দেখুন...এখানে আরও দুটো চিঠি আছে, দুটোতেই ই.সি. পোস্ট অফিসের ছাপ মারা। ই.সি. মানে হচ্ছে স্যাফ্রন হিল। আর এখানে দেখুন,' আরেকটা চিঠি মেলে ধরল ইন্সপেক্টর। দুটো মাত্র বাক্য: সাবধান! ক্যাপরির কথা মনে থাকে যেন! ইন্সপেক্টর ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'ডাক্তার, আমি তা হলে এখন বিদায় নিচ্ছি। ওই চার ইটালিয়ানকে খুঁজে বের করা বিশেষ শক্ত হবে বলে মনে হয় না। তাদের শনাক্ত করার জন্য পোর্টার তো রয়েছেই।'

থর্নডাইক বলল, 'আপনি যাবার আগে দুটো ব্যাপার ফয়সালা করে নিতে চাই। এক হলো—ছোরা। সেটা বোধ হয় আপনার পকেটে আছে। একবার দেখতে পারি কি?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছোরাটা বের করে থর্নডাইকের হাতে দিল ইন্সপেক্টর।

বেশ চিন্তিত মুখে ছোরাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে থর্নডাইক বলল, 'অস্ত্রটা খুবই অদ্ভুত–আকার এবং উপাদান–দুই বিচারেই। অ্যালুমিনিয়ামের হাতল আমি এর আগে কখনও দেখিনি। হাতলের মরক্কো চামড়াটাও ঠিক সাধারণ নয়।'

ইন্সপেক্টর ব্যাখ্যা করল, 'অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে হালকা করার জন্য, আর ছোরাটা সরু করে বানানো হয়েছে আস্তিনের ভেতর লুকিয়ে রাখার জন্য।'

'হয়তো তা-ই।'

ছোরাটা পরীক্ষা করতে করতে সে তার পকেট-লেন্সটা বের করল। তা দেখে রসিক ইন্সপেক্টর বলে উঠল, 'এরপর উনি ওটা মাপতে শুরু করবেন।'

ইন্সপেক্টর ঠিকই ধরেছেন। অস্ত্রটার একটা খসড়া স্কেচ এঁকে থর্নডাইক তার থলে থেকে বের করল একটা ভাঁজ করা স্কেল এবং স্লাইড ক্যালিপার্স। যন্ত্র দুটোর সাহায্যে ছোরাটার নানা অংশের মাপ নিল সে, স্কেচের ওপর যথাস্থানে তথ্যগুলো লিখে সংক্ষিপ্ত বিবরণও লিপিবদ্ধ করল। শেষে অস্ত্রটা ইন্সপেক্টরের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'দুই নম্বর হচ্ছে বিপরীত দিকের ওই বাড়িগুলো।'

সে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। যে-বাড়িটায় আমরা রয়েছি, সেরকম এক সারি উঁচু বাড়ির পেছন দিকটা দেখতে লাগল। বাড়িগুলো প্রায় তিরিশ গজ দূরে। মাঝখানে শুধু একটা মাঠ, তাতে প্রচুর ঝোপঝাড়, আর সমস্ত মাঠজুড়ে কতগুলো কাঁকর বিছানো পথ।

থর্নডাইক বলতে লাগল, 'কাল রাতে ওসব ফ্ল্যাটের কোনও একটাতে যদি কোনও লোক থাকত, তা হলে আমরা হয়তো এই অপরাধের একজন প্রত্যক্ষদর্শী পেতাম। এই ঘরে তখন আলো জ্বলছিল, সবগুলো খড়খড়ি তোলা ছিল। কাজেই দূরের জানালাগুলোর যে-কোনও একটাতে দাঁড়ালে যে কেউ ঘরের ভেতরটা সরাসরি এবং বেশ স্পষ্টভাবে দেখতে পেত।'

ইন্সপেক্টর বলল, 'কথাটা ঠিকই, তবে আমি আশাবাদী, সাক্ষী যদি কেউ থেকে থাকে, তা হলে খবরের কাগজে মৃত্যুসংবাদটা পড়ামাত্র সে আমাদের সব কথা জানাবে। কিন্তু এবার আমাকে যেতে হবে। ঘরে তালা লাগিয়ে দেব।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মার্চমন্ট বললেন, সন্ধ্যায় সে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। 'অবশ্য এখনই যদি আপনারা আমার কাছে কোনও তথ্য জানতে না চান।'

'আমি জানতে চাই,' থর্নডাইক বলল। 'এই মৃত্যুর সঙ্গে কার স্বার্থ জড়িত, সেটা আমার জানা দরকার।'

'ঠিক আছে। চলুন, মাঠে গিয়ে বসা যাক। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি,' কারটিসকেও ইশারায় ডাকলেন তিনি।

সারযনকে নিয়ে ইন্সপেক্টর চলে যাওয়ার পর পোর্টারকে বলে আমরা মাঠে প্রবেশ করলাম। এই মাঠটাই আমরা জানালা দিয়ে দেখেছিলাম।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে বিপরীত দিকের উঁচু বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে মার্চমণ্ট বলতে শুরু করলেন, 'এই মুহূর্তে আলফ্রেড হার্টরিজের মৃত্যুর সঙ্গে যে-মানুষটির স্বার্থ জড়িত, সে হচ্ছে মৃত ব্যক্তির অছি লিওনার্ড উলফ। মৃত ব্যক্তির কোনও আত্মীয় নয় সে, তার একজন বন্ধু মাত্র, কিন্তু প্রায় বিশ হাজার পাউণ্ড সম্পত্তির সে-ই একমাত্র উত্তরাধিকারী। দুই ভাইয়ের মধ্যে আলফ্রেড ছিলেন বড়। ছোট ভাই চার্লস স্ত্রী ও তিনটি সন্তান রেখে তাদের পিতা বেঁচে থাকতেই মারা যান। পনেরো বছর আগে মৃত্যুর সময় বুড়ো তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আলফ্রেডকে দিয়ে যান এই শর্তে যে, তিনি তাঁর ভাইয়ের পরিবারের প্রতিপালন করবেন, সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান করবেন ভাইপোদের।'

'কোনও উইল ছিল কি?' থর্নডাইক জিজ্ঞেস করল।

'বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর বিধবা পুত্রবধূর বন্ধুদের চাপে মৃত্যুর কিছুদিন আগে একটা উইল করেছিলেন, কিন্তু আলফ্রেড সেই উইলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মামলা খারিজ হয়ে যায়। সেই থেকে ভাইয়ের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য একটা পেনিও তিনি কোনওদিন খরচ করেননি। আমার মক্কেল মিস্টার কারটিস না থাকলে পরিবারটিকে হয়তো অনাহারেই থাকতে হত। হতভাগ্য মহিলা ও তার সন্তানদের দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন।

'সাম্প্রতিক কালে দুটো কারণে ব্যাপারটা খুবই গুরুতর রূপ ধারণ করে। প্রথম কারণ, চার্লসের বড় ছেলে এডমাণ্ডের বয়স হয়েছে। মিস্টার কারটিস তাকে একজন সলিসিটরের কাছে পাঠিয়েছিলেন কাজ শিখতে। সেই কাজে এখন সে যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে উঠেছে। অংশীদার হবার একটা লাভজনক প্রস্তাবও

এসেছে তার কাছে। আমরা আলফ্রেডকে চাপ দিয়েছিলাম, এডমাণ্ডের দাদার ইচ্ছেনুযায়ী তিনিই যেন প্রয়োজনীয় মূলধন ছেলেটিকে দিয়ে দেন। রাজি হননি ভদ্রলোক। সেই ব্যাপার নিয়ে কথা বলতেই আজ সকালে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

'দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে লিওনার্ড উলফ। মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। লোকটি দুশ্চরিত্র। হেস্টার গ্রিন নামে এক মহিলারও কিছু দাবিদাওয়া ছিল আলফ্রেডের ওপর। লিওনার্ড ও আলফ্রেডের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল। চুক্তিটা এরকম: লিওনার্ড মিস গ্রিনকে বিয়ে করবে, সেই সুবাদে আলফ্রেড তাঁর সমস্ত সম্পত্তি নিঃশর্ত ভাবে লিখে দেবেন বন্ধুকে। চুক্তির দ্বিতীয় শর্ত ছিল: সম্পত্তিটা হস্তান্তর হবে আলফ্রেডের মৃত্যুর পর।'

'চুক্তিটা কি কার্যকর করা হয়েছে?' থর্নডাইক প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যের কথা, সেটা হয়ে গেছে। আলফ্রেড বেঁচে থাকতে আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম, বিধবা ও তার সন্তানদের জন্য কিছু করা যায় কি না। এবং আমি নিশ্চিত, ওই একই উদ্দেশ্যে আমার মক্কেলের কন্যা মিস কারটিস গত রাতে আলফ্রেডের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। খুবই অবিবেচকের মত কাজ করেছে সে। কারণ, তার আগেই গোটা ব্যাপারটা প্রায় গুছিয়ে এনেছিলাম আমরা। আমি নিশ্চিত, দু'জনের সাক্ষাৎকারটা সুখপ্রদ হয়নি। জানেন তো, মেয়েটি এডমাণ্ডের বাগ্‌দত্তা!'

থর্নডাইক কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাঁকর বিছানো পথের দিকে চোখ রেখে পায়চারি করল। তাকে দেখে মনে হলো, সে যেন কিছু খুঁজছে। তারপর সে জানতে চাইল, 'এই লিওনার্ড উলফ লোকটা কী ধরনের?'

কারটিস বলল, 'আগে সে ছিল এঞ্জিনিয়ার। এখন কী করছে, জানি না। জীবনের অনেকটা সময় আর অর্থ সে উড়িয়ে দিয়েছে জুয়া আর ব্যভিচারের পেছনে। আমার ধারণা, ইদানীং সে

অর্থকষ্টে পড়েছে।'

'সে দেখতে কেমন?'

'মাত্র একবারই আমি তাকে দেখেছি। যদ্দূর মনে পড়ে...লোকটা বেঁটে, ফরসা, শুকনো। পরিষ্কার কামানো গাল। তার বাঁ হাতের মাঝের আঙুলটা নেই।'

'থাকে কোথায়?'

জবাব দিলেন মার্চমণ্ট, 'এলথামে। মরটন গ্রাঞ্জ, এলথাম। জায়গাটা কেন্টের মধ্যে,' একটু থেমে আবার বললেন, 'তা হলে আপনি তো প্রয়োজনীয় সব তথ্যই পেয়ে গেলেন। এবার যে আমাদের যেতে হয়!'

আমাদের সঙ্গে করমর্দন সেরে দু'জনে দ্রুত পায়ে চলে গেল।

থর্নডাইক চিন্তিত মুখে অযত্নে লালিত ফুলের কেয়ারিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। ঝুঁকে পড়ে একটা লরেল ঝোপের নীচের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'জারভিস, কেসটা যেমন অদ্ভুত, তেমনি আকর্ষণীয়। ...পোর্টার আসছে—বোধ হয় আমাদের চলে যেতে বলবে, অথচ—' স্মিত হেসে পোর্টারকে বলল, 'ওই বাড়িগুলোর মুখ কোন্ দিকে, বলো তো!'

'কটম্যান স্ট্রিটের দিকে, স্যর,' পোর্টার জবাব দিল। 'ওগুলোর বেশির ভাগই অফিস।'

'ক'টা দালান আছে ওখানে? তিনতলার যে-ঘরটার জানালা খোলা, ওই ফ্ল্যাটে ক'টা ঘর আছে, বলতে পারবে?'

'দালান আছে ছয়টা। আর মিস্টার হার্টরিজের ফ্ল্যাটটায় আটটা ঘর।'

'ধন্যবাদ,' পা বাড়িয়েও থর্নডাইক হঠাৎ পোর্টারের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভাল কথা, কিছুক্ষণ আগে ওই জানালা দিয়ে একটা জিনিস পড়ে গেছে আমার হাত থেকে—একটা ছোট ধাতুর চাকতি,' নিজের ভিযিটিং কার্ডের ওপর ষড়ভুজাকার একটা চাকতি এঁকে সেটা পোর্টারের হাতে দিল। 'কোথায় পড়েছে, ঠিক বলতে

পারব না। তুমি যদি মালিকে একটু বলে দাও, ভাল হয়। সে যদি চাকতিটা আমার চেম্বারে পৌঁছে দেয়, তা হলে তাকে এক সভারিন বকশিশ দেব।'

পোর্টার টুপিতে হাত রাখল। ফটক দিয়ে বের হওয়ার সময় পেছন ফিরে দেখি, সে ঝোপগুলো চষে বেড়াচ্ছে।

থর্নডাইককে কিছু ফেলে দিতে দেখিনি আমি। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে যাব, এই সময় মোড় ঘুরে কটম্যান স্ট্রিটে পড়লাম আমরা। থর্নডাইক ছয় নম্বর দরজার কাছে গিয়ে ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের নামগুলো পড়তে শুরু করল। জোরে জোরে বলল, 'চারতলা, মিস্টার টমাস বারলো, কমিশন-এজেন্ট। হুম! মিস্টার বারলোর সঙ্গে একবার দেখা করা যাক।'

সে খুব দ্রুত পাথরের সিঁড়িতে পা ফেলতে লাগল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম, হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এলাম চারতলায়।

কমিশন এজেন্টের ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। থর্নডাইক আস্তে করে দরজাটা খুলে ভেতরে তাকাল। মিনিটখানেক সেই অবস্থায় থেকে হাসিমুখে ফিরল আমার দিকে, তারপর নিঃশব্দে দরজাটা খুলে দিল হাট করে।

ভেতরে চোদ্দ বছরের এক ঢ্যাঙা কিশোর কী একটা যন্ত্র নিয়ে কী যেন করছিল। নিজের কাজে সে এতই মগ্ন ছিল, আমাদের উপস্থিতি টের পায়নি। হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখে কেমন থতমত খেয়ে গেল।

থর্নডাইক বলল, 'মিস্টার বারলো আছেন?'

বিব্রত হওয়ার দরুন ঘামে ভিজে উঠেছে ছেলেটার মুখ। বলল, 'না, তিনি তো নেই। আমি আসার আগেই তিনি চলে গেছেন। আজ আর ফিরবেন না।'

'আচ্ছা। তা, তুমি কী করে জানলে যে, তিনি আজ ফিরবেন না?'

'তিনি একটা চিঠি রেখে গেছেন। এই যে...' সে চিরকুটটা

দেখাল।

লাল কালিতে পরিষ্কার করে লেখা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেটা দেখে থর্নডাইক প্রশ্ন করল, 'গতকাল কি তুমি কালির দোয়াতটা ভেঙেছিলে?'

ছেলেটা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। 'হ্যাঁ। আপনি কী করে জানলেন?'

'জানতাম না। চিঠিটা তিনি স্টাইলো দিয়ে লিখেছেন দেখে অনুমান করেছি।'

ছেলেটা সন্দেহের চোখে থর্নডাইকের দিকে তাকাল।

থর্নডাইক বলতে লাগল, 'আসলে আমি দেখতে এসেছি, তোমাদের মিস্টার বারলো সেই লোক কি না, যাকে আমি চিনি। আশা করি, তুমি সেটা বলতে পারবে। আমার বন্ধুটি লম্বা, শুকনো, রং ময়লা, পরিষ্কার কামানো মুখ।'

'তা হলে তিনি সে-মানুষ নন। তিনিও শুকনো, তবে লম্বা নন, গায়ের রংও ময়লা নয়। মুখে স্কটদের মত দাড়ি, চোখে চশমা, মাথায় পরচুলা।'

'আমার বন্ধুর বাঁ হাতটা পঙ্গু,' থর্নডাইক যোগ করল

'সেসব জানি না। তবে মিস্টার বারলো প্রায় সবসময়ই বাঁ হাতে দস্তানা পরে থাকেন।'

'তা হলে তো ঠিকই আছে। এক টুকরো কাগজ দেবে? একটা চিরকুট লিখে রেখে যাব। কালি আছে তো?'

'বোতলে এখনও কিছুটা আছে। কাজ চলে যাবে।'

ছেলেটা কাবার্ডে রাখা একটা খোলা প্যাকেট থেকে সস্তা দামের চিঠির কাগজ আর খাম বের করল। কলমটা বোতলের একেবারে তলা পর্যন্ত ডুবিয়ে থর্নডাইকের হাতে দিল। থর্নডাইক চেয়ারে বসে দ্রুত হাতে চিরকুট লিখল একটা। কাগজটা ভাঁজ করে খামের ওপর ঠিকানা লিখতে গিয়ে কী মনে করে আর লিখল না। চিঠিটা নিজের পকেটে ফেলে বলল, 'এটা রেখে যাওয়া ঠিক

হবে না। তাকে বোলো, মিস্টার হোরেস বাজ এসেছিল। দু'এক দিনের মধ্যেই আবার আসব আমি।'

ছেলেটা হতভম্ব। পিছু-পিছু সিঁড়ির চাতাল পর্যন্ত এসে সেখান থেকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। থর্নডাইক আচমকা ফিরে তাকাতেই মাথাটা সরে গেল।

সত্যি বলতে কী, থর্নডাইকের কাজকর্ম দেখে আমিও ছোকরাটার মত হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। এইসব ছেলেমানুষির কোনও অর্থই আমার মাথায় আসছিল না।

থর্নডাইক সিঁড়ি-সংলগ্ন একটা জানালার কাছে থেমে চিরকুটটা বের করল, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে সেটা ভাল করে দেখল, তারপর আলোর সামনে কাগজটা মেলে ধরে হেসে উঠল সজোরে। মন্তব্য করল, 'বন্ধু, আমরা এক অসাধারণ সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছি।'

হলঘরে পৌঁছে সে পোর্টারের খুপরির কাছে থামল, ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে বলল, 'আমরা মিস্টার বারলোর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি নাকি খুব সকালেই বেরিয়ে গেছেন!'

'হ্যাঁ, স্যর,' পোর্টার জবাব দিল, 'সাড়ে আটটা নাগাদ বেরিয়ে গেছেন তিনি।'

'এত সকালে! তা হলে তো আরও আগে এখানে এসেছিলেন তিনি!'

ঠোঁট বেঁকিয়ে মাথা নাড়ল পোর্টার। 'তা-ই তো মনে হয়। আমি যখন এলাম, তখনই তিনি বেরিয়ে গেলেন।'

'তার সঙ্গে কি কোনও মালপত্র ছিল?'

'হ্যাঁ, স্যর। দুটো বাক্স ছিল। একটা চৌকো, আর একটা সরু–প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা। বাক্স দুটো গাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিতে আমি তাঁকে সাহায্য করেছিলাম।'

'গাড়িটা নিশ্চয়ই চার চাকার ছিল?'

'জী, স্যর।'

'মিস্টার বারলো কি এখানে অনেক দিন ধরে আছেন?'

'না। তিনি এখানে এসেছেন প্রায় ছয় হপ্তা আগে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি আরেক দিন আসব। সুপ্রভাত।'

থর্নডাইক বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাশের রাস্তায় গাড়ির জটলার কাছে চলে গেল। মিনিট দুয়েক দরদাম করে চার চাকার এক গাড়ি ভাড়া করল সে। নিউ অক্সফোর্ড স্ট্রিটের এক দোকানের সামনে আমাদের নিয়ে এল চালক।

আধ স্বর্ণমুদ্রায় ভাড়া চুকিয়ে থর্নডাইক দোকানে ঢুকে পড়ল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে ডিসপ্লেতে সাজিয়ে রাখা লেদ, ড্রিল ও লোহালক্কড় দেখতে লাগলাম।

একটু পরেই থর্নডাইক বেরিয়ে এল ছোট একটা পুঁটলি হাতে। আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে বলল, 'পলটনের জন্য। কয়েকটা ধাতুর টুকরো।'

তারপর সে যে-জিনিস কিনল, সেটা পাগলামির চূড়ান্ত। হলবোর্ন স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তার চোখ পড়ল আসবাবপত্রের এক দোকানের জানালায়। সেখানে সাজানো ছিল ছোটখাটো অপ্রচলিত ফরাসি অস্ত্রের একটা সংগ্রহ। ১৮৭০ সালের শোচনীয় ঘটনার এই স্মারকগুলো এখন বিক্রি হয় ঘর সাজাবার উপকরণ হিসেবে। কিছুক্ষণ সেগুলো দেখে সে দোকানে ঢুকল। খানিক পরে একটা লম্বা সঙ্গিন বসানো বন্দুক এবং পুরানো এক চেযপট রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল বন্ধুটি।

ফেটার লেন দিয়ে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই সমরায়োজনের মানে কী?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল, 'বাড়ির সুরক্ষা। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে, এক দফা গুলি চালিয়ে সঙ্গিন নিয়ে তাড়া করলে অতি বড় সাহসী চোরও পালাবার পথ পাবে না।'

চোর বিতাড়ণ-পর্বের অবাস্তব ছবিটি কল্পনা করে আমি হেসে উঠলাম। বুঝতে পারলাম যে, এই পাগলাটে কাজকর্মের একটা

নিহিতার্থ অবশ্যই আছে।

বিলম্বিত মধ্যাহ্নভোজনের পর কয়েকটা জরুরি কাজ সারবার জন্যে আমি বেরিয়ে পড়লাম। থর্নডাইক বাড়িতেই থেকে গেল। ড্রইং বোর্ড, স্কয়্যার, স্কেল ও কম্পাস নিয়ে মশগুল রইল স্কেচ তৈরির কাজে।

সন্ধ্যায় যখন মিটার কোর্টের পথ ধরে বাড়ি ফিরছিলাম, পথে পেয়ে গেলাম মার্চমন্টকে। তিনিও আমাদের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। দু'জন একসঙ্গে হাঁটতে লাগলাম।

মার্চমন্ট বললেন, 'থর্নডাইকের একটা চিঠি পেয়েছি। তিনি একটা হস্তলিপির নমুনা চেয়ে পাঠিয়েছেন, তাই ভাবলাম, সেটা নিজেই দিয়ে আসি; সাথে কোনও খবর থাকলে সেটাও জেনে আসা হবে।'

চেম্বারে ঢুকে দেখি, থর্নডাইক পলটনের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। যে ছোরা দিয়ে খুনটা করা হয়েছে, সেটা ওদের সামনেই টেবিলের ওপর পড়ে আছে দেখে চোখ কপালে উঠল।

মার্চমন্ট বললেন, 'হাতের লেখার যে নমুনাটা আপনি চেয়েছিলেন, সেটা নিয়ে এসেছি। আনতে পারব কি না, নিশ্চিত ছিলাম না, কিন্তু ভাগ্য ভাল, একটা চিঠি কারটিস রেখে দিয়েছিল,' ঝুলির ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে থর্নডাইকের হাতে দিলেন তিনি। ছোরাটা হাতে নিয়ে বললেন, 'আরে, আমি তো ভেবেছিলাম, ইন্সপেক্টর এটা নিয়ে গেছেন।'

'তিনি আসলটা নিয়ে গেছেন,' থর্নডাইক জবাব দিল। 'এটা নকল, পলটনের তৈরি। আমার আঁকা স্কেচ দেখে বানিয়েছে।'

'সত্যি!' মার্চমন্ট প্রশংসার দৃষ্টিতে পলটনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নকল হলেও একদম আসলের মতই হয়েছে দেখতে।'

ঠিক তখনই বাইরে এসে দাঁড়াল একটা দুই চাকার ভাড়াটে গাড়ি। মুহূর্ত পরে সিঁড়িতে একটা দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। প্রচণ্ড ধাক্কা পড়ল দরজায়। পলটন দরজাটা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে

ঘরে ঢুকে পড়ল কারটিস। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ভয়ঙ্কর কাণ্ড, মার্চমণ্ট! এডিথ—আমার মেয়ে—খুনের দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছে! ইন্সপেক্টর তাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেছে! হা, ঈশ্বর! আমি যে পাগল হয়ে যাব!'

উত্তেজিত লোকটির কাঁধে হাত রেখে থর্নডাইক বলল, 'এতটা ভেঙে পড়বেন না, মিস্টার কারটিস। আমি বলছি, সেরকম কিছু ঘটেনি। আচ্ছা, আপনার মেয়েটি কি ন্যাটা?'

'হ্যাঁ। কাকতালীয় ব্যাপার আর কাকে বলে! এখন আমি কী করি? ইন্সপেক্টর মেয়েটাকে হাজতে ঢুকিয়ে দিয়েছে—ভাবতে পারেন, ডক্টর থর্নডাইক, একেবারে হাজতে? বেচারি এডিথ!'

'তাকে আমরা অচিরেই খালাস করে আনব,' কান খাড়া করল থর্নডাইক। 'কে যেন এসেছে!'

আমি দরজাটা খুলে দিতে ইন্সপেক্টর বাজারের মুখোমুখি হলাম। ইন্সপেক্টর ও কারটিস পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। বিতিকিচ্ছি পরিস্থিতি! বুঝতে পারছি, এক ঘরে থাকতে চাইছে না দু'জনে। কারটিসকে দেখে ফিরে যাওয়ার উপক্রম করছে ইন্সপেক্টর, ওদিকে ইন্সপেক্টর এসেছে বলে বেরিয়ে যেতে চাইছে কারটিস।

থর্নডাইক বলে উঠল, 'আপনি চলে যাবেন না, ইন্সপেক্টর, আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

কারটিস ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবে বলে সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে চলে যাবার পর থর্নডাইক ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে বলল, 'মনে হচ্ছে, আপনি খুব ব্যস্ত ছিলেন!'

'হ্যাঁ,' বাজার জবাব দিল। 'অকারণে সময় নষ্ট করা পছন্দ করি না আমি। ইতোমধ্যেই মিস কারটিসের বিরুদ্ধে জোরাল তথ্য-প্রমাণ পেয়ে গেছি। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তাকেই সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল। ভদ্রলোকের ওপর মেয়েটির যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। তা ছাড়া সে ন্যাটা। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, খুনি বাঁ-হাতি।'

'আর কোনও প্রমাণ?'

'হ্যাঁ, আরও আছে। ইটালিয়ানদের গোটা ব্যাপারটাই সাজানো–বানোয়াট। বিধবার পোশাক পরা এক মহিলা তাদের পাঠিয়েছিল বাড়িটার সামনে গিয়ে নাটক করতে, পোর্টারের হাতে দেয়ার জন্য একটা চিঠিও তাদের দিয়েছিল। ঘোমটায় মুখ ঢাকা ছিল বলে তার চেহারা ভাল করে ঠাহর করতে পারেনি কেউ, তারপরও যেটুকু বর্ণনা দিয়েছে, তাতে তাকে মিস কারটিস বলেই মনে হয়েছে।'

'দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ রেখে খুনি বেরিয়ে গেল কেমন করে?'

'এটাই একমাত্র রহস্য! এর কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হতে পারে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে পরিষ্কার। লাশের দিকে তাকানোমাত্রই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। অকুস্থল থেকে বেরোনোর কোনও পথ আপাতদৃষ্টিতে ছিল না, আর আমরা যখন সেখানে ঢুকলাম, তখন ঘরে কাউকে দেখিনি। অতএব, একটা ব্যাপার পরিষ্কার, খুনি কখনওই সেখানে ছিল না।'

'আপনার কথা কিছুই বুঝলাম না।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি। একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চয়ই একমত যে, আঘাতটা যখন করা হয়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে হতভাগ্য ব্যক্তিটি অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ঘড়িতে দম দিচ্ছিল। ছোরাটা ঢুকেছে বাঁ দিক থেকে তেরছা ভাবে, হাতলটা ছিল সোজা খোলা জানালা বরাবর।'

'আর জানালাটা মাটি থেকে চল্লিশ ফুট ওপরে।'

'ঠিক। এবার আমরা দেখব, যে অস্ত্র দিয়ে খুনটা করা হয়েছে, সেটার অদ্ভুত কিছু বৈশিষ্ট্য।'

এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়ল আবার। লাফিয়ে উঠে খুলে

দিলাম। ঘরে ঢুকল ব্র্যাকেনহার্স্ট চেম্বারের পোর্টার। পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে থর্নডাইকের দিকে এগিয়ে গেল। বলল, 'আপনি যে-জিনিসটা খুঁজছিলেন, স্যর, সেটা পেয়েছি। সেজন্য খুব খাটতেও হয়েছে। জিনিসটা ঝোপের মধ্যে আটকে ছিল।'

থর্নডাইক প্যাকেট খুলে ভেতরটা দেখে নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল। পোর্টারের দিকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। ইন্সপেক্টর তোমার নাম জানেন, আশা করি।'

'তা জানেন, স্যর,' বলে পারিশ্রমিকটা পকেটে পুরে সহাস্য বদনে চলে গেল লোকটি।

থর্নডাইক আবার বলতে লাগল, 'যা বলছিলাম...আগেই বলেছি, ছোরাটা অদ্ভুত। এটা দেখলেই বুঝতে পারবেন, আসলটার হুবহু নকল,' বিস্মিত পুলিশ অফিসারকে পলটনের হাতের কাজ দেখাল সে। 'দেখতেই পাচ্ছেন, অস্ত্রটা খুবই সরু, কোথাও কোনওরকম খাঁজ নেই। যে মালমশলা দিয়ে এটা তৈরি করা হয়েছে, তা বিরলপ্রাপ্য। সাধারণ ছোরা-কারিগরের তৈরি নয় এটা। অস্ত্রের গায়ে ইতালীয় হরফ খোদাই করা থাকলেও আগাগোড়া ব্রিটিশ কারিগরের ছাপ সুস্পষ্ট। ফলাটা তৈরি করা হয়েছে ইস্পাত দিয়ে, অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে বানানো হয়েছে হাতল। অস্ত্রটার গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি কোথাও। এর মানে হলো, লেদ মেশিনের সাহায্যে তৈরি হয়নি এটা। হাতলের মাপটা অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে সেকেলে চেযপট রাইফেলের নলের সঙ্গে, যেগুলোর হুবহু নকল এখন লণ্ডনের অনেক দোকানে বিক্রি হচ্ছে। যেমন এটা,' ঘরের কোণে দাঁড় করানো সম্প্রতি কেনা রাইফেলটা তুলে নিয়ে নলের মুখে ছোরার হাতলটা বসিয়ে দিল থর্নডাইক। ছোরাটা অনায়াসে বসে গেল নলের মধ্যে।

'হা, ঈশ্বর!' সবিস্ময়ে বলে উঠলেন মার্চমণ্ট। 'আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না যে, বন্দুকের সাহায্যে ছোরাটা গুলির মত ছোঁড়া হয়েছে?'

'ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইছি আমি। অ্যালুমিনিয়ামের হাতল কেন ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা তো আপনিই বললেন! ছোরাটা এমনিতে বেশ ভারী, সেটাকে কিছুটা হালকা করার জন্য।'

ইন্সপেক্টর বলল, 'আপনি যা বলছেন, তা একান্তই অসম্ভব।'

'তা হলে তো ব্যাপারটা হাতে-কলমে করে দেখাতে হবে। মৃত ব্যক্তির পরনের জামা আর ক্ষতস্থান দেখলেই বোঝা যায়, শরীরের মধ্যে প্রবেশ করার সময় ছোরাটা পাক খেয়েছিল। আর অস্ত্রটা পাক খাওয়াতে হলে সেটা একটা রাইফেল থেকে ছুঁড়তে হবে। ছোরাটা নলের মুখে ঠিকমত বসানোর জন্য দরকার ষড়ভুজ আকৃতির ধাতুর চাকতি। এই দেখুন, চাকতিটা। আসল নয়, এটাও পলটনের বানানো।' টেবিলের ওপর চাকতিটা রাখল থর্নডাইক।

ইন্সপেক্টর বলল, 'তারপরও আমি বলব, এটা অসম্ভব, এবং অবাস্তব।'

মার্চমণ্টও একমত হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে।'

থর্নডাইক বলল, 'দেখাই যাক। এটা পলটনের নিজের তৈরি একটা কার্তুজ। এর মধ্যে আছে ২০-বোর বন্দুকে ব্যবহারযোগ্য আটবার গুলি ছোঁড়ার মত ধোঁয়াবিহীন পাউডার,' ছোরার হাতলের মাথায় চাকতিটা বসাল সে, তারপর হাতলটা রাইফেলের নলের মুখে বসিয়ে ঠেলে দিল ভেতরে, রাইফেলে কার্তুজ ভরল। অফিসের দরজাটা খুলে দেয়ালে লাগানো একটা খড়ের বোর্ডকে চাঁদমারি হিসেবে নির্বাচন করল থর্নডাইক। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জারভিস, জানালাগুলো বন্ধ করে দেবে?'

ওর অনুরোধমত কাজ করলাম।

রাইফেলটা চাঁদমারির দিকে তাক করল সে।

ক্ষীণ একটা শব্দ হলো—যতটা আশা করেছিলাম, তার

চাইতেও ক্ষীণতর। চাঁদমারির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ছোরাটা হাতল পর্যন্ত বিদ্ধ হয়ে আছে বুল'স আই-এর এক প্রান্তে।

রাইফেলটা নামিয়ে রেখে থর্নডাইক বলল, 'দেখলেন তো, কাজটা বাস্তবে করা সম্ভব। এবার ঘটনার আলামতগুলো বলছি। এক, আসল ছোরার গায়ে এমন কতগুলো দাগ আছে, যা রাইফেলের খাঁজের সঙ্গে মিলে যায়। দ্বিতীয় হচ্ছে, ছোরাটা বাম দিক থেকে ডান দিকে পাক খেয়ে লক্ষ্যস্থলের ভেতর ঢুকেছিল। আর এই জিনিসটা দেখুন, এটা মাঠের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে পোর্টার,' সে প্যাকেটটা খুলল। ভেতর থেকে বেরোল একটা ষড়ভুজ আকৃতির ধাতুর চাকতি। অন্য চাকতিটার পাশে সেটা রাখার পর দেখা গেল, দুটো চাকতিই হুবহু এক।

ইন্সপেক্টর অনেকক্ষণ নীরবে চাকতি দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর চোখ তুলে বলল, 'এবার আমি হার মানছি। আপনার কথাই নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু কেমন করে এই চিন্তাটা আপনার মাথায় এল, কিছুতেই বুঝতে পারছি না। এখন একটাই মাত্র প্রশ্ন: গুলিটা কে ছুঁড়েছিল, আর কেনই বা গুলির শব্দ শুনতে পেল না কেউ?'

'দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর: লোকটা হয়তো রাইফেলের সঙ্গে কমপ্রেসড এয়ার যন্ত্র জুড়ে নিয়েছিল। তাতে যে কেবল ক্ষীণ শব্দ হয়েছে, তা নয়, ছোরার গায়ে বিস্ফোরণের কোনও দাগই লাগেনি। খুনির নামটাও আমি বলে দিতে পারি। আপনার হয়তো মনে আছে, জারভিস যখন ঘড়িতে দম দেবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল, তখন ওর দাঁড়াবার জায়গায় চক দিয়ে চিহ্ন দিয়েছিলাম আমি। সেখানটায় দাঁড়িয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে বিপরীত দিকের একটা বাড়িতে দুটো জানালা দেখতে পেলাম—ছয় নম্বর কটম্যান স্ট্রিটের তিনতলা ও চারতলার জানালা। তেতলায় স্থপতিদের একটা প্রতিষ্ঠানের অফিস, চারতলায় থাকেন টমাস বারলো নামে একজন কমিশন-এজেন্ট।

আমি মিস্টার বারলোর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, ভয় দেখিয়ে লেখা চিঠি তিনটে কি আপনার সঙ্গে আছে?'

'হ্যাঁ,' ইন্সপেক্টর বুকপকেট থেকে একটা থলি বের করল।

'প্রথম চিঠির কথাই ধরা যাক। চিঠির কাগজ আর খাম–দুই-ই অতি সাধারণ। হাতের লেখা দেখে মনে হয়, চিঠিটা যে লিখেছে, সে তেমন পড়ালেখা জানে না। কিন্তু কালিটা এই ধারণার সঙ্গে মিলছে না। অল্প শিক্ষিত লোকেরা সাধারণত এক পেনি দামের কালিই কিনে থাকে, কিন্তু খামের ওপরের ঠিকানাটা যে কালি দিয়ে লেখা হয়েছে, সেরকম উজ্জ্বল কালি কাপড় ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করে। আর চিঠিটা লেখা হয়েছে লাল স্টাইলোগ্রাফিক কলম দিয়ে। এই কলম ব্যবহার করে দলিল লেখকরা। তবে কাগজের মাথায় আঁকা নকশাটা চিঠির সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়। শিল্পগত বিচারে লোকটা আঁকতে জানে না। খুলির চেহারাটা হয়েছে একেবারেই হাস্যকর, অথচ আঁকাটা বেশ পরিচ্ছন্ন; যন্ত্রের সাহায্যে আঁকার লক্ষণ সুস্পষ্ট। এমনকী ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ভেতর দিয়ে দেখলে পেনসিলের কেন্দ্র, রেখা এবং আড়াআড়ি টানের চিহ্নও চোখে পড়ে। আরও দেখা যাবে নরম, লাল রবারের গুঁড়ো। এ-ও দলিল লেখকদের জিনিস। সব মিলিয়ে এই ধারণাটাই জোরদার হয় যে, যান্ত্রিক আঁকাআঁকিতে অভ্যস্ত কোনও লোক নকশাটি এঁকেছে, থর্নডাইক এক সেকেণ্ড বিরতি নিল। 'এবার আসা যাক মিস্টার বারলোর কথায়। আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন তিনি বাইরে ছিলেন। অফিসের চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম এক ফুট লম্বা একটা কাঠের রুল, যা সাধারণত এঞ্জিনিয়াররা ব্যবহার করে থাকে। আরও পেলাম একটা লাল ইরেযার এবং দামি কালি ভরা পাথরের বোতল। কায়দা করে অফিসের চিঠি লেখার কাগজ ও কালির নমুনা জোগাড় করে ফেললাম। জানতে পারলাম, মিস্টার বারলো নতুন ভাড়াটে, কিছুটা বেঁটে, পরচুলা ও চশমা পরেন,

আর সবসময়ই বাঁ হাতে দস্তানা পরে থাকেন। আজ সকাল সাড়ে আটটায় তিনি অফিস থেকে চলে যান। কেউ তাঁকে ফিরে আসতে দেখেনি। তাঁর সঙ্গে ছিল দুটো বাক্স—একটা চৌকো, একটা সরু—প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা। একটা গাড়ি নিয়ে তিনি ভিকটোরিয়া চলে যান, এলথাম যাবার ট্রেন ধরেন।'

'আচ্ছা!' ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে উঠল।

থর্নডাইক বলতে লাগল, 'এখন এই চিঠি তিনটে ভাল করে দেখুন। দেখতেই পাচ্ছেন, একই ধরনের কাগজে লেখা হয়েছে চিঠিগুলো, তাতে একই জলছাপ, কিন্তু কথা সেটা নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে—দেখুন, প্রত্যেকটা চিঠির তলায় বাঁ দিকের কোণের কাছাকাছি দুটো করে ছোট ফুটো আছে। বোঝা যাচ্ছে, চিঠির কাগজের প্যাকেটটার ওপর কেউ কম্পাস বা ড্রইং পিন ব্যবহার করেছে, ফলে কাগজের ওপর ফুটো হয়েছে। তিনটে চিঠিতেই ফুটো থাকাটা কী প্রমাণ করে? প্রমাণ করে যে, কাগজগুলো একই প্যাকেট থেকে এসেছে, এবং সেগুলো একটার নীচে আরেকটা ছিল। আমরা জানি, ওপরের কাগজে চাপ পড়লে তার নীচের কিছু কাগজেও সেই ফুটো বা চাপের দাগ পড়ে। এখন মিস্টার বারলোর অফিসের কাগজে লেখা আমার এই চিরকুটটা দেখুন। এটাতে ফুটো নেই, কিন্তু ঠিক একই জায়গায় রয়েছে চাপের দাগ—কিছুটা অস্পষ্ট হলেও চোখে পড়ে। এর মানে বুঝতে পারছেন?'

ইন্সপেক্টর চমকে চেয়ার থেকে উঠে থর্নডাইকের মুখোমুখি দাঁড়াল। 'কে এই বারলো?'

'সেটা তো বের করবেন আপনি, তবে আপনাকে আমি একটা দরকারি সূত্র দিতে পারি। আলফ্রেড হার্টরিজের মৃত্যুতে উপকৃত হয়েছে একটি মাত্র লোক—লিওনার্ড উলফ। মিস্টার মার্চমণ্টের কাছ থেকে জেনেছি, তার চরিত্র ভাল নয়। জুয়াড়ি, উড়নচণ্ডী। লোকটা দক্ষ যন্ত্রবিদ, একসময় এঞ্জিনিয়ার ছিল। বেঁটে, শুকনো।

পরিষ্কার কামানো মুখ। গায়ের রং উজ্জ্বল, আর বাঁ হাতের মধ্যমাটা কাটা। মিস্টার বারলোও বেঁটে, শুকনো, ফরসা। মুখে দাড়ি আছে, তবে সেটা সম্ভবত নকল। চোখে চশমা, মাথায় পরচুলা পরেন—পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, চেহারা বদলানোর জন্য। সবচেয়ে বড় পয়েন্টটা হলো, এই বারলো বাঁ হাতে সবসময় দস্তানা পরে থাকেন। দু'জনের হাতের লেখাই আমি দেখেছি, তাই জোর দিয়ে বলছি, লেখার পার্থক্য ধরা খুবই শক্ত।'

সেই রাতেই এলথামে নিজের বাড়ির বাগানে একটা কমপ্রেসড এয়ার-রাইফেল মাটিতে পোঁতার সময় লিওনার্ড উলফকে গ্রেপ্তার করা হলো। অবশ্য তার বিচার করা গেল না। কারণ, তার পকেটে একটা ডেরিনযার পিস্তল ছিল। সেটার সাহায্যে নিজের দুশ্চরিত্র জীবনের অবসান নিজেই ঘটাল সে।

মূল: রিচার্ড অস্টিন ফ্রিম্যান
রূপান্তর: ডিউক জন